প্রাণীর ক্রমবিকাশ ও অভিযোজন

ডঃ সুমন্ত মুখোপাধ্যায় ও রমেন মুখোপাধ্যায়



পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ

প্রাণীর
ক্রমবিকাশ ও অভিযোজন

COMPLIMENTARY

ডঃ সুমন্ত মুখোপাধ্যায়, এম্. এস্. সি., পি. এইচ. ডি.
অধ্যাপক, প্রাণিবিদ্যা বিভাগ, স্কটিশ চার্চ কলেজ, কলিকাতা।

ও

রমেন মুখোপাধ্যায়, এম্. এস্. সি.
বিভাগীয় প্রধান, প্রাণিবিদ্যা বিভাগ, স্কটিশ চার্চ কলেজ, কলিকাতা।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ

PRANEER KRAMABIKAS O ABHIJOJAN
[Evolution and Adaptation of Animals]
Dr. Sumanta Mukhopadhyaya &
Ramen Mukhopadhyaya

প্রকাশকাল :
সেপ্টেম্বর, ১৯৮৪

প্রকাশক :
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ
(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটি সংস্থা)
আর্য ম্যান্সন্, (নবম তল)
৬-এ রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার
কলিকাতা ৭০০ ০১৩

মুদ্রক :
অরুণকুমার চট্টোপাধ্যায়
জ্ঞানোদয় প্রেস
৫৫বি কবি সুকান্ত সরণি
কলিকাতা ৭০০ ০৮৫

চিত্র ও প্রচ্ছদ :
শ্রীকমল শেঠ

মূল্য : চব্বিশ টাকা

Published by Prof. Dibyendu Hota, Chief Executive Officer, West Bengal State Book Board, under the Centrally Sponsored Scheme of Production of Books and Literature in Regional Languages at the University level launched by the Government of India in the Ministry of Education and Social Welfare (Department of Culture), New Delhi.

প্রস্তাবনা

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ হইতে বাংলাভাষায় স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর পর্যায়ের বহু পাঠ্যপুস্তক প্রকাশিত হইতেছে, এই গ্রন্থখানি তাহাতে একটি ক্ষুদ্র সংযোজন। প্রাণীর ক্রমবিকাশ ও অভিযোজন একটি চিত্তাকর্ষক অথচ যথেষ্ট দুরূহ বিষয়। প্রাণিবিদ্যার স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর পর্যায়ে ইহা বিশেষভাবে পঠিত হইলেও সাধারণ পাঠকেরও এই বিষয়ে কৌতূহলের অন্ত নাই। সেইজন্য যথেষ্ট কঠিন এবং বিশাল বিষয়টিকেও যথাসম্ভব স্বল্প পরিসরে প্রাঞ্জলভাবে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছি। কতদূর সফল হইয়াছি তাহা পাঠকগণের বিচার্য। বিজ্ঞান বিষয়ে বাংলা গ্রন্থ রচনার প্রধান অসুবিধা পরিভাষার অভাব। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আমরা 'চলন্তিকা' এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিভাষা ব্যবহার করিয়াছি। তবে যে সকল ক্ষেত্রে পরিভাষা লইয়া মতান্তর আছে বা পরিভাষা নাই, সেই সকল ক্ষেত্রে ইংরাজী বা বৈজ্ঞানিক শব্দটিকেই বাংলায় ব্যবহার করা হইয়াছে যথা—প্রোটোপ্লাজম, জিন, ভাইরাস, ব্যাকটিরিয়া, প্রোটোজোয়া, পরিফেরা প্রভৃতি।

গ্রন্থটি রচনার ক্ষেত্রে বিভিন্ন অধ্যাপক তথা বিজ্ঞানীদের নিকট হইতে যথেষ্ট সাহায্য লাভ করিয়াছি। ইহাদের মধ্যে প্রথমেই উল্লেখযোগ্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণিবিদ্যার অধ্যাপক ডঃ শচীপ্রসাদ রায়চৌধুরী। তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পাণ্ডুলিপি দেখিয়া তাহা সংশোধন ও পরিমার্জনা করেন। কৃতজ্ঞচিত্তে তাঁহার সাহায্য আমরা স্মরণ করিতেছি। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং বিজ্ঞান সাধক ডঃ অমলেশ চৌধুরী তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ সুচিন্তিত অভিমত ও উৎসাহ দিয়া আমাদের উৎসাহিত করিয়াছেন। স্কটিশ চার্চ কলেজের প্রাণিবিদ্যার অধ্যাপক প্রণব কুমার ঘোষ, বিদ্যাসাগর কলেজের ডঃ অসীমকুমার ভাদুড়ী এবং গুরুদাস কলেজের অধ্যাপক কাজলকুমার চক্রবর্তী এই পুস্তকটি রচনায় নানাভাবে সাহায্য করিয়া কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। শ্রীমতী রীতা মুখোপাধ্যায় প্রুফ সংশোধন এবং শব্দসূচী প্রণয়নে সর্বতোভাবে সাহায্য করিয়াছেন। চিত্রশিল্পী শ্রীকমলকুমার শেঠ এবং জ্ঞানোদয় প্রেসের কর্ণধার শ্রীঅরুণকুমার চট্টোপাধ্যায় যথাযথভাবে এবং

দ্রুততার সহিত কার্যসম্পন্ন করিয়া পুস্তকটির দ্রুত প্রকাশে সাহায্য করিয়াছেন। পুস্তকটি প্রকাশনার জন্য বিভিন্নভাবে সাহায্য করায় আমরা পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যপুস্তক পর্ষদের আধিকারিক শ্রীদিব্যেন্দু হোতা এবং নিরলস কর্মী শ্রীঅশোক অ্যানটনি বিশ্বাস মহাশয়ের নিকট কৃতজ্ঞ।

প্রাণীর ক্রমবিকাশের ন্যায় সুবিশাল এবং বৈচিত্র্যপূর্ণ একটি বিষয়কে এইরূপ স্বল্পপরিসরে প্রকাশ করা যথেষ্ট আয়াসসাধ্য। সেইজন্য যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করা সত্ত্বেও পুস্তকটিতে কিছু কিছু ত্রুটি বা অভাব থাকিতে পারে। এবিষয়ে ছাত্র-ছাত্রী এবং সাধারণ পাঠক পাঠিকাদের মতামত সাদরে গৃহীত হইবে। পরিশেষে জানাই যাহাদের জন্য এই পুস্তকটি রচিত হইয়াছে, তাহাদের নিকট ইহা আদৃত হইলে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত হইব।

প্রাণিবিদ্যা বিভাগ
স্কটিশ চার্চ কলেজ
১২ই সেপ্টেম্বর, ১৯৮৪

বিনীত
ডঃ সুমন্ত মুখোপাধ্যায়
রমেন মুখোপাধ্যায়

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়

জীবের ক্রমবিকাশের সূচনা (Introduction to Organic Evolution)

এই পৃথিবীতে অসংখ্য উদ্ভিদ ও প্রাণী দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদের চারিদিকে যে সকল উদ্ভিদ ও প্রাণী দেখা যায় তাহারা সংখ্যায় যেমন অগণিত, বৈচিত্র্যেও তেমনি সীমাহীন। একদিকে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জীবাণু ও শৈবাল হইতে বিশাল বৃক্ষ ; অন্যদিকে এককোষী প্রাণী হইতে বৃহদাকার বহু প্রাণী এই পৃথিবীতে বাস করে। স্বভাবতঃই আমাদের মনে প্রশ্ন আসে—'এই সকল উদ্ভিদ ও প্রাণীর সৃষ্টি কিভাবে হইয়াছে? অতি প্রাচীনকাল হইতেই দেশ-বিদেশের বহু দার্শনিক ও বিজ্ঞানী এই বিষয়টি লইয়া চিন্তা করিয়াছেন এবং তাঁহাদের মতামত প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু জীবন সৃষ্টির প্রকৃত রহস্য এখনও সম্পূর্ণভাবে উদ্‌ঘাটিত হয় নাই।

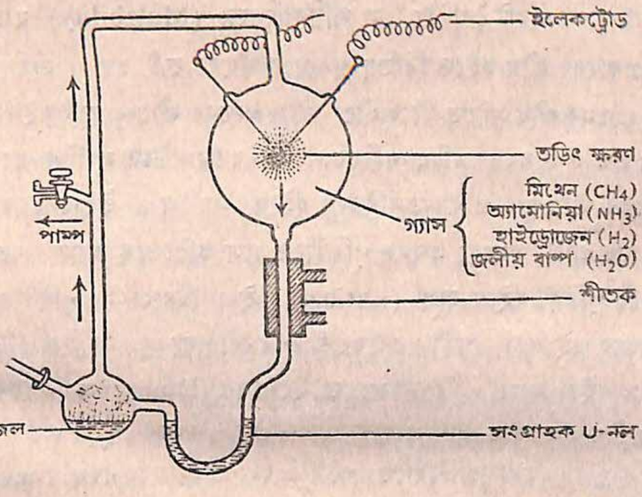
বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে যে সকল বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার ভিত্তিতে অধিকাংশ বিজ্ঞানীগণ অনুমান করেন যে এখন হইতে প্রায় পাঁচশত কোটি বৎসর পূর্বে এই পৃথিবীর সৃষ্টি হয় এবং প্রায় তিনশত কোটি বৎসর পূর্বে এই পৃথিবীতে প্রথম জীব সৃষ্টি হয় অর্থাৎ জীবনের আবির্ভাব হয়। বিজ্ঞানীদের অনুমান ঐ সময় যে আদি-জীবের সৃষ্টি হয়, তাহা অত্যন্ত সরল গঠনের ছিল। পরবর্তী কয়েকশত কোটি বৎসরে এই সরল জীব হইতে ক্রমশঃ বিভিন্ন প্রকারের জটিল জীবের সৃষ্টি হয়। এইভাবে পৃথিবীর বুকে বিভিন্ন প্রকারের উদ্ভিদ ও প্রাণীর আবির্ভাব হয়। যুগ যুগ ধরিয়া সরল জীব হইতে ধীরে ধীরে জটিল জীবের সৃষ্টি হইবার পদ্ধতিকে **জীবের ক্রমবিকাশ** বা **জীবের বিবর্তন** বা **জৈব অভিব্যক্তি** (Organic Evolution) বলে। প্রকৃতপক্ষে 'ইভল্যুশন' শব্দটির অর্থ 'বিকশিত হওয়া' (*Evolution = unroll*)। জীবের ক্রমবিকাশ বা জৈব অভিব্যক্তি অত্যন্ত ধীর-গতিতে সম্পন্ন হয়। মানুষের জীবনকাল তথা আমাদের সভ্যতার বিকাশকাল সেই তুলনায় অল্প বলিয়া জৈব অভিব্যক্তির গতি সহজে বুঝিতে পারা যায় না।

এখন প্রায় সকল জীববিজ্ঞানী জীবের ক্রমবিকাশকে স্বীকার করেন কারণ ইহার অসংখ্য সাক্ষ্য বা প্রমাণ প্রকৃতির অঙ্গনে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত। কিন্তু মাত্র কয়েক শতাব্দী পূর্বেও অধিকাংশ ব্যক্তি পৌরাণিক কাহিনী বা **বিশেষ সৃষ্টি** (Special Creation) মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। এই মতবাদ অনুসারে বর্তমানে যে সকল উদ্ভিদ এবং প্রাণী যে ভাবে অবস্থিত, ঠিক সেই ভাবেই ইহারা প্রথম আবির্ভূত হয়। বাইবেলে আছে মাত্র ছয়দিনে ঈশ্বর এই পৃথিবী, আলোক, জীবজগত প্রভৃতি সৃষ্টি করিয়াছিলেন। পরবর্তীকালেও অনেক তথাকথিত পণ্ডিত ব্যক্তি বিভিন্ন ভ্রান্ত ধারণার প্রচার করেন। ডঃ লাইটফুট নামে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের এক উপাচার্য প্রচার করেন যে খৃষ্টপূর্ব 4004 সালের 23 অক্টোবর সকাল নয়টার সময় এই পৃথিবীর সৃষ্টি হয়। এই সকল ভ্রান্ত ধারণার জন্য পরবর্তীকালে লুই পাস্তুর, লামার্ক, ডারউইন, ওয়ালেশ, ডিভ্রিস, হাক্সলে, প্রমুখ বিজ্ঞানীদের ক্রমবিকাশবাদ প্রতিষ্ঠিত করিতে কঠোর সংগ্রাম করিতে হয়।

কিছুদিন পূর্বেও অনেকে বিশ্বাস করিতেন যে জড়বস্তু হইতে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে জীবের সৃষ্টি হইতে পারে, ইহাকে **স্বতঃস্ফূর্ত সৃষ্টি** (Spontaneous generation) বলে। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীতে স্প্যালানজনি, রেডি, লুই পাস্তুর প্রমুখ বিজ্ঞানী বিভিন্ন পরীক্ষার দ্বারা এই মত ভ্রান্ত বলিয়া প্রমাণ করেন। বর্তমান বিজ্ঞানীদের মতে কেবল পূর্ববর্তী জীব হইতেই জীবের উৎপত্তি হয়। এই ধারণা এখনও আমাদের বদ্ধমূল কারণ এখনও পর্যন্ত গবেষণাগারে কৃত্রিম জীবন সৃষ্টি করা সম্ভব হয় নাই, যদিও বহুক্ষেত্রে জীবদেহের বিভিন্ন উপাদান (যথা—হরমোন, এনজাইম, নিউক্লিক অ্যাসিড প্রভৃতি) কৃত্রিমভাবে গবেষণাগারে সংশ্লেষিত করা হইয়াছে।

কিভাবে পৃথিবীতে জীবনের আবির্ভাব হইল বা প্রথম জীবের সৃষ্টি হইল তাহা লইয়া বিজ্ঞানীদের গবেষণার অন্ত নাই। ওপারিন, হলডেন, মিলার প্রভৃতি বিজ্ঞানীগণ এ বিষয়ে তাঁহাদের যে মতামত ব্যক্ত করেন তাহা যথেষ্ট যুক্তিগ্রাহ্য এবং অধিকাংশ বিজ্ঞানী কর্তৃক স্বীকৃত। বর্তমানকালে জ্যোতির্বিজ্ঞানী, ভূতাত্ত্বিক এবং জৈব-রসায়নবিদগণ অনুমান করেন পৃথিবীতে প্রথমে চার প্রকারের সরল গ্যাস ছিল, যথা **মিথেন** (Methane, CH_4), **অ্যামোনিয়া** (Ammonia, NH_3), **হাইড্রোজেন** (Hydrogen, H_2) এবং

জলীয়বাষ্প (Water vapour, H_2O)। জীবন সৃষ্টির প্রথম ধাপে এই সকল গ্যাস পরস্পরের সহিত রাসায়নিক বিক্রিয়া করিয়া জটিল জৈব অণু (Organic molecule) গঠন করে। সেই সময়কার প্রাকৃতিক ঘটনাবলী যথা বজ্রবিদ্যুৎপাত, অতি বেগুনী রশ্মি, গামা রশ্মি প্রভৃতির বিকীরণ এইরূপ পারস্পরিক ক্রিয়া-বিক্রিয়ায় সাহায্য করে।



চিত্র 1 : মিলারের পরীক্ষা

1953 খ্রীষ্টাব্দে শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানী **স্ট্যানলি মিলার** (Stanley Miller) একটি যুগান্তকারী পরীক্ষায় **মিথেন, অ্যামোনিয়া, হাইড্রোজেন** ও **জলীয়বাষ্পের** মিশ্রণের মধ্যে বিদ্যুৎ প্রবাহিত করেন এবং উপরোক্ত গ্যাসগুলির মিশ্রণ হইতে অ্যামাইনো অ্যাসিড সহ বিভিন্ন জৈব যোগ সৃষ্টি করেন। এই অ্যামাইনো অ্যাসিড হইতেই জটিল প্রোটিন অণু গঠিত হয়। বিজ্ঞানীদের অনুমান এইরূপ প্রোটিন অণু হইতেই প্রথম জীবের সৃষ্টি হয়। বিজ্ঞানী **মেলভিন কেলভিন** (Melvin Calvin) অপর একটি পরীক্ষায় গামারশ্মি ব্যবহার করিয়া উপরোক্ত পদার্থগুলি হইতে অ্যামাইনো অ্যাসিড, 6-কার্বনযুক্ত শর্করা এবং পিউরিন ও পিরিমিডিন সৃষ্টি করেন। এই পিউরিন ও পিরিমিডিন বংশগতির ধারক ও বাহক DNA অণু বা **জিন** (Gene)-এর প্রধান উপাদান। ইহা হইতে বিজ্ঞানীদের ধারণা জটিল জৈব অণুর সংশ্লেষের ফলে প্রথম জীবের সৃষ্টি হয়।

তবে প্রথম জীবের সৃষ্টি যে ভাবেই হইক না কেন, উহার গঠন অপেক্ষাকৃত সরল ছিল। বিজ্ঞানীদের অনুমান, এই আদি জীবের দুইটি প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল—প্রথমত ইহা শক্তি সংগ্রহ ও **শক্তি উৎপাদন** করিতে পারিত, দ্বিতীয়ত ইহা **আত্মোৎপাদনে** সক্ষম ছিল।

ইহার ফলে এই জীবনের ধারা পৃথিবীতে অব্যাহত থাকে। এই আদি জীবের অপর একটি বৈশিষ্ট্য ছিল **পরিব্যক্তিতা** (Mutability) যাহার ফলে এক প্রকারের জীব হইতে বিভিন্ন প্রকারের জীবের সৃষ্টি হয়। ক্রমশ এইরূপ সরল গঠনের জীব হইতে ধীরে ধীরে জটিল গঠনের জীবের সৃষ্টি হইল। এই-ভাবে লক্ষ লক্ষ বৎসর ধরিয়া পরিবেশের পরিবর্তন ঘটিতে লাগিল এবং বিভিন্ন প্রকারের উদ্ভিদ ও প্রাণীর ক্রমবিকাশ হইতে লাগিল। ইহাদের মধ্যে বহু উদ্ভিদ ও প্রাণীর বংশধর এখনও পৃথিবীতে বাস করিতেছে আবার বহু উদ্ভিদ ও প্রাণী পৃথিবী হইতে **লুপ্ত** (Extinct) হইয়া গিয়াছে। পৃথিবীর বিভিন্ন শিলাস্তরে এই সকল প্রাচীন জীবের নিদর্শন **জীবাশ্ম** বা **ফসিল** (Fossil)-রূপে ছড়াইয়া আছে। বিশালকায় **ডাইনোসর** (Dinosaurs) এইরূপ অধুনা-লুপ্ত সরীসৃপ জাতীয় প্রাণী যাহারা কয়েক কোটি বৎসর পূর্বে এই পৃথিবীতে বাস করিত। বিভিন্ন জীবাশ্মের গঠন এবং তাহাদের বয়স নির্ণয় করিয়া জীব বিজ্ঞানীগণ পৃথিবীতে জীবের ক্রমবিকাশের সুনির্দিষ্ট ধারাটি লক্ষ্য করেন। কেবল জীবাশ্মই নহে, জীবের **অঙ্গসংস্থান** (Mrophology), **ভ্রূণবিদ্যা** (Embryology), **ভৌগোলিক বিস্তার** (Geographical distribution), **শ্রেণীবিন্যাস** (Taxonomy) প্রভৃতির সাহায্যে জৈব অভিব্যক্তিকে প্রমাণ করা যায়, সেইজন্য ইহাদের অভিব্যক্তি বা ক্রমবিকাশের **সাক্ষ্যপ্রমাণ** (Evidences of evolution) রূপে গণ্য করা হয়। জীবের ক্রমবিকাশের ধারা সম্পর্কে বিজ্ঞানীগণ সুনিশ্চিত থাকিলেও জীবের ক্রমবিকাশের পদ্ধতি সম্পর্কে বিভিন্ন মতবাদ প্রচলিত আছে। এই সকল মতবাদের মধ্যে **লামার্ক, ডারউইন**, এবং **ডি ভ্রিস**-এর মতবাদ উল্লেখযোগ্য। বর্তমানে এই সকল বিজ্ঞানীর মতবাদ এবং সাম্প্রতিক কোষতত্ত্ব ও জিনতত্ত্বের ভিত্তিতে **আধুনিক সংশ্লেষবাদ** গঠিত হইয়াছে।

বিভিন্ন জীব বিভিন্ন পরিবেশে বাস করে ; কেহ জলে, কেহ স্থলে, কেহ বৃক্ষে আবার কেহ গর্তের মধ্যে। একটি নির্দিষ্ট পরিবেশে বাস করিবার জন্য

জীবদেহে বিশেষ পরিবর্তন দেখা যায়। পরিবেশের সহিত জীবের এই সামঞ্জস্য বিধানকে **অভিযোজন** (Adaptation) বলা হয়।

পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে জীবনের আবির্ভাব, জীবের ক্রমবিকাশের ইতিহাস ও তাহার ধারা এবং প্রাণীর অভিযোজন প্রভৃতি বিষয় বিশদভাবে আলোচনা করা হইল।

সারাংশ

আমাদের চারিদিকে যে নানা প্রকারের উদ্ভিদ ও প্রাণী দেখা যায় তাহাদের উৎপত্তি কিভাবে হইল—ইহা লইয়া প্রাচীনকাল হইতেই বহু দার্শনিক ও বিজ্ঞানী চিন্তাভাবনা করিতেছেন, কিন্তু জীবন সৃষ্টির প্রকৃত রহস্য এখনও অনুদ্ঘাটিত। আধুনিক বিজ্ঞানীদের ধারণা কয়েক শত কোটি বৎসরপূর্বে এই পৃথিবীতে নানা প্রকার ক্রিয়া-বিক্রিয়ার ফলে প্রথম অজৈব অণু হইতে জৈব অণু এবং তাহা হইতে অকস্মাৎ আদিজীব বা জীবনের আবির্ভাব হয়। পরবর্তী লক্ষ লক্ষ বৎসর ধরিয়া ঐ সরল আদিজীব হইতেই বর্তমান কালের বিভিন্ন জটিল গঠনের উদ্ভিদ ও প্রাণীর সৃষ্টি হইয়াছে। সরল জীব হইতে ক্রমশ জটিল জীবের ক্রমবিকাশের এই পদ্ধতিকেই জৈব অভিব্যক্তি বা জীবের বিবর্তন বলা হয়। পৃথিবীর বিভিন্ন শিলাস্তরে অবস্থিত প্রাচীনকালের উদ্ভিদ ও প্রাণীর জীবাশ্ম এই মতবাদকে সমর্থন করে। কিছুকাল পূর্বেও অধিকাংশ ব্যক্তি ধর্মপুস্তক বর্ণিত বিশেষ সৃষ্টিবাদ; স্বতঃস্ফূর্ত সৃষ্টি প্রভৃতি মতবাদ বিশ্বাস করিলেও বর্তমানে প্রায় সকল বিজ্ঞানী জীবের ক্রমবিকাশে বিশ্বাস করেন। তবে পৃথিবীতে জীবনের আবির্ভাব এবং জীবের ক্রমবিকাশের পদ্ধতি সম্বন্ধে বিজ্ঞানীদের মধ্যে মতভেদ দেখা যায়। বিজ্ঞানী ওপারিন, হলডেন, মিলার প্রভৃতি বিজ্ঞানীগণ পৃথিবীতে জীবনের আবির্ভাব সম্পর্কে গবেষণা করেন। অপরদিকে লামার্ক, ডারউইন, ডি ভ্রিস প্রমুখ বিজ্ঞানীগণ জীবের ক্রমবিকাশের পদ্ধতি সম্পর্কে বিভিন্ন মতবাদ প্রকাশ করেন। বর্তমানে জীববিদ্যার বিভিন্ন শাখার দ্রুত উন্নতির সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া আধুনিক সংশ্লেষবাদ গঠিত হইয়াছে।

অনুশীলনী

(সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও)

1. জৈব অভিব্যক্তি বা জীবের ক্রমবিকাশ কাহাকে বলে ?
2. বিশেষ সৃষ্টিবাদ ও স্বতঃস্ফূর্ত সৃষ্টিবাদ বলিতে কি বোঝায় ?
3. জীবনের প্রথম আবির্ভাব কখন এবং কিভাবে হয় ?
4. জীবনের আবির্ভাব সম্পর্কে মিলার কি পরীক্ষা করেন ?
5. পৃথিবীতে জীবের ক্রমবিকাশের ধারাটি কিভাবে বুঝিতে পারা যায় ?
6. জীবাশ্ম কাহাকে বলে ?
7. জীবের ক্রমবিকাশের সমর্থনে কি কি প্রমাণ পাওয়া যায় ?
8. আধুনিক সংশ্লেষবাদ কি ?

গ্রন্থপঞ্জী ও নির্দেশিকা (Reference)

1. Moody P.A. : Introduction to Evolution, 1964, Harper & Row, N. Y.
2. Simpson G.G. : The Meaning of Evolution, 1949, Yale University Press.
3. Mukherjee D. : Text Book of Zoology, 1972, New Book Stall, Calcutta.

দ্বিতীয় অধ্যায়

জীবনের উৎপত্তি
(Origin of Life)

জীবন কি ? কিভাবে জীবনের উৎপত্তি হইয়াছে ? কেবল পৃথিবীতেই কি জীবন আছে ? জীবন কি কৃত্রিম উপায়ে সৃষ্টি করা যায় ?—এই প্রশ্নগুলি কেবল আমাদের মনেই উদিত হয় নাই, কয়েকশত বৎসর ধরিয়া বিভিন্ন দার্শনিক ও বিজ্ঞানীগণ এই প্রশ্নগুলির উত্তর দিবার চেষ্টা করিতেছেন। জীবন বা প্রাণ (Life) শব্দটির সহিত আমরা সকলেই বিশেষভাবে পরিচিত, কিন্তু আশ্চর্যের কথা এই যে এখনও জীবনের একটি সঠিক সংজ্ঞা নির্ধারণ করা সম্ভব হয় নাই। তবে জীববিজ্ঞানীরা কতকগুলি বৈশিষ্ট্যকে একত্রে প্রাণ বা জীবন নামে অভিহিত করেন। সজীব বস্তুর এই বৈশিষ্ট্যগুলিকেই **জীবনের বৈশিষ্ট্য** বলা হয়, যথা—**পুষ্টি** (Nutrition), **শ্বসন** (Respiration), **বৃদ্ধি** (Growth), **চলন ও গমন** (Movement and Locomotion), **উত্তেজিতা** (Irritability), **জনন** (Reproduction), **পরিব্যক্তি** (Mutation) প্রভৃতি। এই বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে জনন জীবের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য যাহার ফলে কেবল পূর্ববর্তী জীব হইতেই পরবর্তী জীবের সৃষ্টি হয়। আবার পরিব্যক্তি বা মিউটশেনের ফলে নূতন ধরনের জীব সৃষ্টি হয়। এইভাবে পৃথিবীতে জীবনের ধারা বা প্রবাহ বহিয়া চলে।

কিন্তু পৃথিবীতে জীবনের উৎপত্তি কিভাবে হইল ? প্রকৃতপক্ষে এখনও পর্যন্ত জীবন-সৃষ্টির রহস্য সঠিকভাবে জানা যায় নাই তবে বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন দেশের মানুষ নানাভাবে এই প্রশ্নটির উত্তর দিতে চেষ্টা করিয়াছে এবং ইহার ফলে জীবনের উৎপত্তি সম্পর্কে নানা মতবাদের সৃষ্টি হইয়াছে।

এখানে জীবনের উৎপত্তি সম্পর্কে কয়েকটি প্রধান মতবাদের উল্লেখ করা হইল :

(ক) **বিশেষ সৃষ্টিবাদ বা বিশ্বসৃষ্টিবাদ** (Theory of Special Creation) : পৃথিবীর অধিকাংশ ধর্মপুস্তকে লেখা আছে যে ঈশ্বর তাঁহার বিশেষ ইচ্ছানুসারে এই পৃথিবী ও তাহার মধ্যে বিভিন্ন জীব (উদ্ভিদ ও প্রাণী) সৃষ্টি করেন। সম্ভবতঃ প্রাচীনযুগে মানুষ তাহার নিজের সৃষ্টি (যথা-গৃহ, উদ্যান,

নৌকা, মূর্তি প্রভৃতি) লক্ষ্য করিয়াই এইরূপ মতবাদ প্রকাশ করে। কারণ বিভিন্ন দেশে নানাজাতির মধ্যে এখনও এই বিস্মৃষ্টিবাদ কোনো না কোনোভাবে প্রচলিত আছে। এক সময় অধিকাংশ মানুষ এই মতবাদে বিশ্বাসী ছিল কিন্তু মানুষের জ্ঞান ও বিজ্ঞানের পরিধি বাড়িতে থাকায় ধীরে ধীরে অন্যান্য মতবাদগুলিও প্রতিষ্ঠিত হয়।

(খ) **স্বতঃস্ফূর্ত উদ্ভব** (Spontaneous Origin) : প্রাচীনকালের মানুষ বিশ্বাস করিত যে পচনশীল বস্তু হইতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে জীবনের সৃষ্টি হয়। সম্ভবতঃ বর্ষাকালে মাটির ভিতর হইতে ব্যাঙের ছাতা বা কেঁচোর উদ্ভব, আবর্জনার মধ্যে মাছি ও অন্যান্য কীটপতঙ্গের উদ্ভব তাহাদের এইরূপ ধারণা করিতে সাহায্য করিয়াছিল। অনেকের ধারণা ছিল বৃহদাকারের উদ্ভিদ ও প্রাণীর উৎপত্তি পূর্ববর্তী উদ্ভিদ ও প্রাণী হইতেই হয়, কিন্তু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবের উৎপত্তি অজৈব বস্তু হইতে হওয়া সম্ভব।

পরবর্তীকালে **ফ্রানকোইস রেডি** (Francois Redi), **স্পালানজনি** (Spallanzoni) এবং **লুই পাস্তুর** (Louis Pasteur) এই মতবাদের বিরোধিতা করেন ও পরীক্ষার সাহায্যে এই মতবাদের অসারতা প্রমাণ করেন। রেডি দুটি মাংসের টুকরা দুটি কাঁচের জারে রাখেন। তিনি একটি জারের মুখ কাপড় দিয়া ঢাকিয়া দেন এবং অন্যটি খোলা রাখেন। যে পাত্রটির মুখ খোলা ছিল, তাহার মধ্যে মাছি ডিম পাড়ে ও সেখানে মাছি জন্মায় কিন্তু ঢাকা পাত্রটির মধ্যে মাছি ডিম পাড়িতে পারে না ফলে সেখানে মাছি জন্মায় না। ইহার দ্বারা তিনি প্রমাণ করেন যে কেবল মাছির ডিম হইতে মাছি জন্মায়। স্পালানজনি খাদ্য বস্তুকে ফুটাইয়া তাহাকে জীবাণুর আক্রমণ হইতে রক্ষা করেন।

লুই পাস্তুর কয়েকটি কাঁচের ফ্লাস্কে গরুর মাংসের নির্যাস (Beef broth) লইয়া গরম করেন। পরে কয়েকটি ফ্লাস্কের মুখ গলাইয়া বন্ধ করিয়া দেন এবং অন্য ফ্লাস্কের মুখ খোলা রাখেন। কিছুদিন পরে দেখা গেল যে কেবল মুখ খোলা ফ্লাস্কের মধ্যে জীবাণু জন্মাইয়াছে। ইহার সাহায্যে তিনি প্রমাণ করেন যে বায়ুর মধ্যে যে জীবাণু আছে তাহাই খোলা মুখ ফ্লাস্কে প্রবেশ করে এবং মাংসের নির্যাসের মধ্যে বৃদ্ধি পাইয়া তাহাকে পচনে সাহায্য করে। কিন্তু স্বতঃস্ফূর্ত উদ্ভবের সমর্থকগণ এই পরীক্ষায় সন্তুষ্ট হন নাই। তাঁহাদের মতে

জল ফুটাইবার ফলে ফ্লাস্কের ভিতরকার প্রাণবায়ু নষ্ট হইয়া যাওয়ায় তাহার মধ্যে জীবনের সৃষ্টি হয় না।

পরবর্তীকালে পাস্তুর একপ্রকার বিশেষ ধরণের ফ্লাস্ক ব্যবহার করিলেন। এই সকল ফ্লাস্কে মাংসের নির্যাস ফুটাইবার পর তাহার মুখটি বন্ধ না করিয়া S-নলের মত টানিয়া দেওয়া হইল। বাহিরের বায়ু ও জীবাণু এই S-নলের মধ্যে আটকাইয়া গেল কিন্তু ফ্লাস্কের ভিতরে প্রবেশ করিতে পারিল না ইহার ফলে মাংসের ঝোলে জীবাণু বৃদ্ধি পাইল না। কিন্তু পাস্তুর ফ্লাস্কটি সামান্য বাঁকাইয়া মাংসের নির্যাসকে ঐ বায়ুর সংস্পর্শে আনিলেন, তাহার ফলে বায়ু এবং জীবাণু মাংসের ঝোলে প্রবেশ করিল এবং মাংসের ঝোলে পচন ধরিল।

এই ভাবে রেডি এবং পাস্তুরের পরীক্ষা স্বতঃস্ফূর্ত জন্মের মতবাদকে অবৈজ্ঞানিক প্রমাণ করিল।

(গ) **প্রাকৃতিক বিপর্যয়বাদ** (Theory of Catastrophism) : ফরাসী বৈজ্ঞানিক **ক্যুভিয়ের (Cuvier)** এই মতবাদের প্রবক্তা ছিলেন। তিনি পৃথিবীর বিভিন্ন শিলাস্তরে অধুনালুপ্ত বহু উদ্ভিদ ও প্রাণীর জীবাশ্ম বা ফসিল পর্যবেক্ষণ করিয়া সিদ্ধান্ত করেন যে পৃথিবীতে একবার জীবের সৃষ্টি হয় এবং মহাপ্রলয়ের ফলে সেগুলি ধ্বংস হইয়া যায়। এইভাবে তিনি পৃথিবীতে জীবাশ্মের উপস্থিতি ব্যাখ্যা করেন কিন্তু তাঁহার মতবাদে জীবনের উৎপত্তি সম্বন্ধে কোনো ব্যাখ্যা ছিল না।

(ঘ) **গ্রহান্তর হইতে জীবের আবির্ভাব** (Cosmic Origin) : কোনো কোনো বিজ্ঞানীর মতে পৃথিবীর বাহিরে অন্য কোনো গ্রহে জীবন আছে। উল্কাপাতের[1] সহিত অন্যগ্রহ হইতে জীবকণা বা জীব-রেণু (Life-Spore) পৃথিবীতে আসে এবং তাহা অনুকূল পরিবেশে ধীরে ধীরে সংখ্যায় বৃদ্ধি পায়। এখনও পর্যন্ত বিভিন্ন মহাকাশযান পৃথিবীতে যে সকল সংবাদ পাঠাইয়াছে তাহার সাহায্যে পৃথিবীর বাহিরে কোথাও জীবন আছে এইরূপ প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। অবশ্য বিশাল এই মহাবিশ্বে আমাদের সৌরজগৎ ব্যতীত অন্যান্য বহু সৌরজগৎ ও তাহাদের গ্রহ-উপগ্রহ আছে। এইরূপ কোনো গ্রহে

1. 1936 খ্রীষ্টাব্দে তানজানিয়ায় একটি উল্কাপিণ্ড পাওয়া গিয়াছে যাহার ভিতর একটি উদ্ভিদ বা স্পঞ্জসদৃশ প্রাণীর ছাপ আছে।

জীবনের অস্তিত্ব থাকিতে পারে কিন্তু তাহা প্রমাণ সাপেক্ষ।[2] সর্বোপরি এই ধরণের মতবাদ জীবনের উৎপত্তি কীভাবে হইয়াছে—তাহার উত্তর দিতে সক্ষম নয়[3]।

জীবনের উৎপত্তি সম্পর্কে আধুনিক ধারণা (Modern concepts on the origin of life)ঃ রাশিয়ার জীববিজ্ঞানী **এ. আই ওপারিন (A. I. Oparin)** তাঁহার **'জীবনের উৎপত্তি'** (Origin of Life-1936) নামক গ্রন্থে জীবনের উৎপত্তি সম্পর্কে বিশদভাবে আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার মতে পৃথিবীতে অকস্মাৎ জীবন বা জীব সৃষ্টি হয় নাই বরং পৃথিবী সৃষ্টির পর ধীরে ধীরে কয়েকটি সুনির্দিষ্ট পর্যায়ে বিভিন্ন অজৈব ও জৈব যৌগের মিলনে পৃথিবীতে জীবনের উৎপত্তি হয়। পরবর্তীকালে ব্রিটিশ বিজ্ঞানী **জে. বি. এস হলডেন** (J. B. S. Haldane) এই মতবাদ সমর্থন করেন। ইহাকে রাসায়নিক ক্রমবিকাশ (Chemical Evolution) বলা হয়।

রাসায়নিক ক্রমবিকাশ (Chemical Evolution)ঃ কয়েক শত কোটি বৎসর পূর্বে অপর একটি তারার প্রভাবে বা কোনো মহাজাগতিক বিস্ফোরণের ফলে সূর্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহ-উপগ্রহের সৃষ্টি হয়।* সেই সময় পৃথিবী একটি জ্বলন্ত অগ্নিপিণ্ডের মত ছিল যাহা ক্রমশ তাপ বিকিরণ করিয়া শীতল হইতে থাকে। সেই সময় পৃথিবীর আবহাওয়া কিরূপ ছিল তাহা প্রত্যক্ষভাবে জানিতে পারা যায় না তবে সূর্যের আবহাওয়া ও দূরবর্তী গ্রহগুলির আবহমণ্ডল পর্যবেক্ষণ করিয়া বিজ্ঞানীরা ধারণা করেন যে সেই সময় বিভিন্ন অজৈব অনুর অস্তিত্ব ছিল। সম্ভবতঃ পৃথিবী সৃষ্টির প্রথম দিকে **নাইট্রোজেন, হাইড্রোজেন** এবং **অক্সিজেন** মুক্তভাবে ছিল কিন্তু অত্যধিক তাপের প্রভাবে উহার অধিকাংশই বাহিরের মহাকাশে বিলীন হইয়া যায়

---

2. জ্যোতির্বিজ্ঞানী শ্যাপলে (H. Shapley, 1958) অনুমান করেন এই মহাবিশ্বে প্রায় দশ কোটি গ্রহে জীবন থাকা সম্ভব এবং উহাদের মধ্যে প্রায় একলক্ষ গ্রহের জীব এই পৃথিবীর জীব হইতে উন্নত পর্যায়ের হইতে পারে।

3. বৃটিশ জ্যোতির্বিজ্ঞানী স্যার ফ্রেডারিক হয়েল (Sir Fredrick Hoyle, 1977)—এর মতে মহাশূন্য জীবনের প্রতিকূল পরিবেশ নয়। মহাশূন্যে জীবনের উৎপত্তির সপক্ষে রাসায়নিক ও থার্মোডায়নামিক যুক্তি আছে।

* স্ট্যানলি মিলার (Stanley Miller, 1962)-এর মতে সূর্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পৃথিবীর উৎপত্তি হয় নাই বরং অতি শীতল তাপমাত্রায় একপ্রকার মহাজাগতিক কণা (Cosmic dust) পরস্পরের সহিত মিলিত হইয়া সূর্য ও অসংখ্য গ্রহ সৃষ্টি করিয়াছে।

কেবল তাহাদের কয়েকটি যৌগ পৃথিবীর আবহমণ্ডল রচনা করে। এইসময় **হাইড্রোজেন** (H_2) এবং **অক্সিজেন** (O_2) মিলিত হইয়া জল (H_2O) গঠন করে। অত্যধিক তাপের জন্য এই জল জলীয়বাষ্পরূপে পৃথিবী হইতে দূরে সরিয়া যায় এবং শীতল হইয়া বৃষ্টিধারা রূপে পুনরায় পৃথিবীর বুকে ঝরিয়া পড়ে। এইভাবে ক্রমাগত বৃষ্টিপাতের ফলে পৃথিবী শীতল হইতে শীতলতর হইতে থাকে। অতঃপর সমস্ত পৃথিবী একটি বিশাল পাত্রের আকার ধারণ করে যাহার মধ্যে ধীরে ধীরে বিভিন্ন প্রকারের রাসায়নিক ক্রিয়াবিক্রিয়া সংঘটিত হইতে থাকে।

জৈব যৌগ সৃষ্টি (Origin of Orgamic Compounds) : পৃথিবীর এইরূপ অবস্থায় **কার্বন** (C), **নাইট্রোজেন** (N), **অক্সিজেন** (O) এবং **হাইড্রোজেন** (H) পরস্পরের সহিত মিলিত হইয়া বিভিন্ন যৌগ সৃষ্টি করে যাহা হইতে ক্রমশঃ জৈব যৌগের সৃষ্টি হয়। দূরবর্তী শীতলতারার আবহমণ্ডলে সরলতম জৈব যৌগ **মিথেন** (Methane, CH_4) এবং বিভিন্ন উল্কাপিণ্ডে জটিল হাইড্রোকার্বনের উপস্থিতি এই ধারণাকে সমর্থন করে। ইহা ব্যতীত **অ্যামোনিয়া** (Ammonia, NH_3), **সায়ানোজেন** (Cyanogen, CN) এই **ডাই সায়ানোজেন** (Dicyanogen, NC-CN) প্রভৃতি যৌগগুলিও এই সময়ে সৃষ্টি হয়।

রাসায়নিক ক্রিয়া-বিক্রিয়ার এই পর্যায়ে বিদ্যুৎপাত এবং অতি বেগুনী রশ্মির প্রভাবে ক্রমশ জটিল যৌগ অনুর সৃষ্টি হয়। ফর্মিক অ্যাসিডের উপর **অতি বেগুনী রশ্মির** (Ultra violet rays) প্রভাবে জটিল জৈব যৌগ উৎপন্ন হয়, মহাজাগতিক রশ্মির (Cosmic rays) প্রভাবে কার্বনডাইঅক্সাইড ও জলীয় বাষ্প হইতে জৈব অম্ল (Organic acid) উৎপন্ন হয় এবং মিথেন, হাইড্রোজেন, অ্যামোনিয়া ও জলীয় বাষ্পের উপর বিদ্যুৎপাতের ফলে অ্যামাইনো অ্যাসিড সহ বিভিন্ন জৈব যৌগের সৃষ্টি হয়। পরবর্তীকালে বিজ্ঞানী **স্ট্যানলী মিলার** (Stanley Miller, 1953) গবেষনাগারে একটি বন্ধ ফ্লাস্কে **মিথেন, হাইড্রোজেন, অ্যামোনিয়া** ও **জলীয়বাষ্পের** মিশ্রণের মধ্যে বিদ্যুৎ প্রবাহিত করিয়া **অ্যামাইনো অ্যাসিড** সহ বিভিন্ন জটিল জৈব যৌগ সৃষ্টি করেন।

সাধারণতঃ হাইড্রোকার্বন বিশেষ ক্রিয়াশীল নয় কিন্তু উহার একটি হাইড্রোজেন পরমাণুকে ক্লোরিন বা ব্রোমিন-এর সাহায্যে বিচ্যুত করিলে তাহা

ক্রিয়াশীল হইয়া **অ্যালকোহল** (Alcohol), **অ্যালডিহাইড** (Aldehyde), **কিটোন** (Ketone) প্রভৃতি গঠন করে। ফরম্যালডিহাইড (CH_2O) যুক্ত হইয়া শর্করা ($C_6H_{12}O_6$) গঠন করে। অ্যালকোহলের সহিত অ্যামোনিয়ার বিক্রিয়া হইয়া **অ্যামাইন** (Amine) গঠন করে যাহা হইতে সরল অ্যামাইনো অ্যাসিড বা **গ্লাইসিন** (Glycine, CH_2-NH_2-COOH) গঠিত হয়। বিভিন্ন অ্যামাইনো অ্যাসিড পরস্পর যুক্ত হইয়া বিশালাকারের প্রোটিন অণু গঠন করে। দীর্ঘ শৃঙ্খলযুক্ত হাইড্রোকার্বন হইতে প্রথমে **গ্লিসারিন** (Glycerine, CH_2OH-CHOH-CH_2OH) এবং পরে ফ্যাট অণু গঠিত হয়। সরলশর্করা হইতে ক্রমশ জটিল শর্করা (যথা স্টার্চ, গ্লাইকোজেন, সেলুলোজ প্রভৃতি) গঠিত হয়। এইভাবে বিভিন্ন রাসায়নিক ক্রিয়া-বিক্রিয়ার ফলে জীবদেহের প্রয়োজনীয় উপাদানগুলি সৃষ্টি হইয়াছে বলিয়া অনুমান করা হয়। বিজ্ঞানী **হলডেন** (Haldane) এই সকল জৈব যৌগের দ্রবণকে উষ্ণতরল রস (Hot dilute soup) বলেন।

কোলয়েড এবং কোয়াসারভেট (Colloids and Coacervates)

ধীরে ধীরে পৃথিবী যতই শীতল হইতেছিল তাহার ভিতর বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থের ক্রিয়া-বিক্রিয়া ততই অধিক পরিমাণে সংঘটিত হইতে-ছিল। এই সময়কার পৃথিবীকে একটি বিরাট গবেষণাগারের সহিত তুলনা করা যায়। সমগ্র পৃথিবী এই সময়ে জলরাশিতে পরিপূর্ণ ছিল এবং তাহার মধ্যে বিভিন্ন প্রকার জৈব অনু সৃষ্টি হইতে ছিল। এইভাবে বিভিন্ন জৈব যৌগ জলের সহিত মিলিত হইয়া কোলয়েড দ্রবণ গঠন করে। এইসময় কোলয়েড কণাগুলি বিপরীত বৈদ্যুতিক আধানযুক্ত কোলয়েড কণার সহিত বিক্রিয়া করিয়া একপ্রকারের জটিল মিশ্রণ কণা গঠন করে যাহাকে **কোয়াসারভেট** (Coa-cervate) বলা হয়। এই সকল কোয়াসারভেটের গাত্রে জল সংযোজিত হইয়া একপ্রকারের পর্দার সৃষ্টি করিল এবং উহাই সম্ভবতঃ আদি জীবনের সূত্রপাত।

আদি জীবন বা মুক্তজিন (Early life or naked genes) সৃষ্টির এই পর্যায়ে এইসকল বৃহদাকার জটিল কোলয়েড কণা বাকোয়াসার ভেটগুলি পরস্পরের সহিত ক্রিয়া বিক্রিয়া করিয়া হয় পরস্পরের সহিত যুক্ত হইত অথবা পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া :পড়িত। সম্ভবতঃ এই-সময় **অনুঘটক** (Catalyst) এর সৃষ্টি হয় যাহা এইসকল রাসায়নিক ক্রিয়া বিক্রিয়াগুলিকে ত্বরান্বিত করিতে পারিত। উদাহরণস্বরূপ লাইপেজ ফ্যাট

অনুকে গ্লিসেরল ও ফ্যাটি অ্যাসিডে বিশ্লিষ্ট করিতে পারিত। আবার কোনো কোনো অনুঘটক বা ক্যাটালিষ্ট পরিবেশের সাহায্যে নিজের মত অপর একটি অনুঘটক গঠন করিতে সক্ষম ছিল। সেইজন্য ইহাদের **স্ব-অনুঘটক** বা **অটোক্যাটালাইটিক** (Auto catalytic) বলা হয়। সম্ভবতঃ এইভাবেই সর্বপ্রথম জীবের আত্মোৎপাদন (Self reproduction) ক্ষমতার সৃষ্টি হয়। বিজ্ঞানী **মূলার** (Muller) এই ধরনের আত্মোৎপাদনকারী এনজাইমকে **মুক্তজিন** (Free Gene) নামে অভিহিত করেন। এইসকল মুক্ত জিনের **পরিব্যক্তি** বা **মিউটেশন** (Mutation)-এর ক্ষমতা ছিল এবং সেই হিসাবে ইহাদের বর্তমানকালে **স্বাধীন ভাইরাস** (Free living Virus)-এর সহিত তুলনা করা যায়। ভাইরাসের মতই ইহাদের দেহ **নিউক্লিও প্রোটিন** Nucleo protein) দ্বারা গঠিত ছিল। এইসকল নিউক্লিও প্রোটিন ক্রমাগত পরিবেশ হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়া অধিক পরিমাণে নিউক্লিও প্রোটিন গঠন করিতে লাগিল। সম্ভবত এইভাবেই জীবদেহে প্রথম জনন প্রক্রিয়ার উদ্ভব হয়। অবশ্য বিজ্ঞানী **কেলভিন** (Calvin)-এর মতে এই সকল ক্রিয়া বিক্রিয়াতেও প্রাকৃতিক নির্বাচন তাহার ভূমিকা যথাযথ পালন করিতেছিল।

নিউক্লিক অ্যাসিড (Nucleic Acid) :

বর্তমানে নিউক্লিক অ্যাসিডকে জীবদেহের অন্যতম প্রধান উপাদানরূপে চিহ্নিত করা হয়। উন্নত জীবকোষে দুই প্রকারের নিউক্লিক অ্যাসিড পাওয়া যায় যথা—**রাইবোনিউক্লিক অ্যাসিড** (Ribo Nucleic Acid or RNA) এবং **ডিঅক্সিরাইবো নিউক্লিক অ্যাসিড** (Deoxyribo Nucleic Acid or DNA)। ইহাদের মধ্যে DNA কেই বংশগতির ধারক ও বাহক বা জিন নামে অভিহিত করা হয়। তবে কোনো কোনো ভাইরাসের দেহে কেবলমাত্র RNA থাকে।

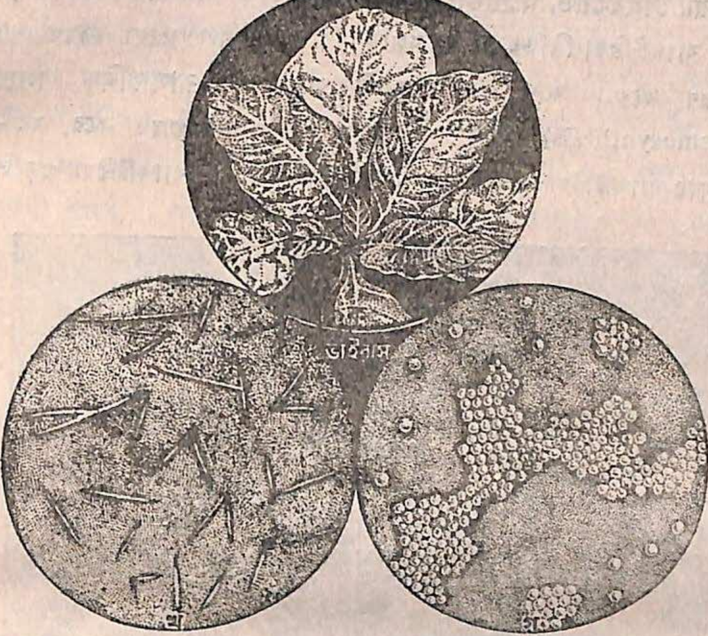
DNA সম্পর্কে নানা গবেষণার পর জানা গিয়াছে যে বহুসংখ্যক ডিঅক্সি-রাইবোজ শর্করা ও ফসফেট পরস্পর যুক্ত হইয়া একটি সুবৃহৎ শৃঙ্খল গঠন করে—ইহাই DNA এর প্রধান অক্ষ। ইহার প্রতিটি শর্করা অংশের সহিত যুক্ত থাকে একটি করিয়া বেস (Base)। এইরূপ প্রতিটি এককে নিউক্লিওটাইড (Nucleotide) বলে। DNA-এর বেসগুলি প্রধানতঃ চার প্রকারে—ইহাদের মধ্যে দুইটি **পিউরিন** জাতীয় যথা—**অ্যাডেনিন** (Adenine) ও **গুয়ানিন**

(Guanine) এবং অপর দুটি **পিরিমিডিন** জাতীয়, যথা—**সাইটোসিন** (Cytosine) ও **থাইমিন** (Thymine), তবে DNA এর সুবৃহৎ শৃঙ্খলে এই বেসগুলি বিভিন্নভাবে সজ্জিত থাকার জন্যই বিভিন্ন DNA অণুর মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়।

ওয়াটসন ও ক্রিক (Watson and Crick, 1953)-এর গবেষণার ফলে DNA অণুর জটিল গঠন সম্বন্ধে নানা তথ্য জানা গিয়াছে। প্রতিটি DNA অণুতে দুটি নিউক্লিওটাইড শৃঙ্খল পরস্পরকে ঘোরানো সিঁড়ির মত প্যাঁচাইয়া আছে (Double helix), এই সিঁড়ির প্রতিটি ধাপে দুটি বেস পরস্পরের সহিত হাইড্রোজেন বণ্ড (Hydrogen bond) দ্বারা যুক্ত। সেইজন্য একদিকের বেস অপরদিকের বেস-এর পরিপূরক হয় অর্থাৎ একদিকে অ্যাডেনিন থাকিলে অপরদিকে থাইমিন এবং একদিকে গুয়ানিন থাকিলে অপরদিকে সাইটোসিন থাকে। অনুকূল পরিবেশে একটি DNA অণু পরিবেশ হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়া নিজের মতই দুইটি অণু গঠন করিতে পারে অর্থাৎ DNA অণুর সাহায্যেই জীব বংশবিস্তার করিতে পারে।

আদিকোষী বা প্রোক্যারিয়ট (Prokaryote) : **ভাইরাস** (Virus), **ব্যাকটিরিয়া** (Bacteria), **নীল-সবুজ শৈবাল** (Blue green algae) প্রভৃতি জীবকে আদিকোষী বা প্রোক্যারিয়ট বলা হয় কারণ ইহাদের কোষে সুনির্দিষ্ট নিউক্লিয়াস থাকে না।

ভাইরাস (Virus) : ভাইরাসের দেহ অতি-আনুবীক্ষণিক (Ultra-microscopic) এবং ইহার দেহ গঠন অত্যন্ত সরল। **নিউক্লিক অ্যাসিড** (DNA বা RNA)-এর উপর কেবল একটি **প্রোটিন-আবরণী** থাকে। ভাইরাস পূর্ণ পরজীবী ও রোগ সংক্রামক। মুক্ত অবস্থায় ভাইরাস জড়ের মত আচরণ করে এবং ইহাকে স্ফটিকে রূপান্তরিত করা যায়। সেইজন্য ভাইরাসকে জড় ও জীবের মধ্যবর্তী বলা হয়। অবশ্য অনেকের মতে ভাইরাসের দেহ গঠনে এই আপাত সরলতা তাহার পরজীবী অভিযোজনের নিদর্শন। ভাইরাস ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ ব্যতীত দেখা যায় না এবং ইহা পোর্সিলিন ফিল্টারের মধ্য দিয়া পরিশ্রুত হয়। ইহারা উদ্ভিদ, প্রাণী এবং ব্যাকটিরিয়া সকল জীবকেই আক্রমণ করে এবং পোষকের দেহে বংশবৃদ্ধি করে। যে সকল ভাইরাস ব্যাকটিরিয়াকে আক্রমণ করে তাহাদের ফাজ ভাইরাস বলে।



চিত্র 2 : ভাইরাস

ব্যাকটিরিয়া (Bacteria) : ব্যাকটিরিয়া আকারে ভ ইরাস হইতে বড় এবং ইহারা পোর্সিলিন ফিল্টারের মধ্য দিয়া পরিশ্রুত হয় না। অধিকাংশ ব্যাকটিরিয়াই স্বয়ংসম্পূর্ণ কোষ তবে ইহাদের কোষে সুগঠিত নিউক্লিয়াস থাকে না। ব্যাকটিরিয়ার গঠন, আকার ও আয়তন বিভিন্ন প্রকারের হয় (0.1 μ হইতে 50 μ পর্যন্ত)। সরল হইতে জটিল নানা ধরনের ব্যাকটিরিয়া দেখা যায়। আকৃতি অনুসারে ব্যাকটিরিয়া চার প্রকারের যথা—**গোলাকার** বা **কক্কাস** (Coccus), **দণ্ডাকার** বা **ব্যাসিলাস** (Bacillus), **সর্পিলাকার** বা **স্পাইরিলাম** (Spirillum) ও **কমাকৃতি** (Comma like)। চলনের জন্য ব্যাকটিরিয়ার দেহে নানা প্রকারের সিলিয়া বা ফ্লাজেলা দেখা যায়। অধিকাংশ ব্যাকটিরিয়া সবাত শ্বসন করে আবার কোনো কোনো ব্যাকটিরিয়া অবাত শ্বসন করে। পুষ্টি অনুযায়ী ব্যাকটিরিয়া বিভিন্ন প্রকারের যথা—**পরজীবী**, **মৃতজীবী** অথবা **স্বভোজী**। পরজীবী ব্যাকটিরিয়া বিভিন্ন উদ্ভিদ ও প্রাণীর দেহে বাস করিয়া রোগ সৃষ্টি করে। মানুষের দেহে ইহারা **যক্ষা**,

ধীবে দ্বিস্তরযুক্ত (Diploblastic) একনালীদেহী প্রাণী বা **নিডারিয়ার** (Cnidaria) সৃষ্টি হয় যাহার উদাহরণ **হাইড্রা** (Hydra), **জেলিফিস** (Jelly-fish) সাগর কুসুম বা **সী-অ্যানিমোন** (Sea-anemone), প্রবাল (Coral) প্রভৃতি। এক বিশেষ প্রকারের দ্বিস্তর কোষযুক্ত চিরুনীধারী প্রাণী সমুদ্রে পাওয়া যায়, ইহারা **টিনোফোরা** (Ctenophora) পর্বের অন্তর্গত। পূর্বে ইহাদের নিডারিয়ার সহিত যুক্তভাবে একনালীদেহী পর্বের অন্তর্ভূক্ত করা হইত। সম্ভবতঃ একনালী দেহী বা **সিলেনটেরাটা** (Coelenterata))-স্টক বা উৎপত্তিস্থান হইতেই পরবর্তী **চ্যাপ্টাকৃমি** বা **প্লাটিহেলমিনথেস** (Platyhel-minthes) এবং **গোলকৃমি** বা **নিমাটহেলমিনথেস** (Nemathelminthes) প্রাণীর উৎপত্তি হয়। পরবর্তীকালে একদিকে **অঙ্গুরীমাল** বা **অ্যানিলিডা** (Annelida), **সন্ধিপদী** বা **আরথ্রোপোডা** (Arthropoda) এবং **কম্বোজ** বা **মোলাস্কা** (Mollusca) প্রাণীর উদ্ভব হয়, অন্যদিকে **কণ্টকত্বক** বা **একাইনোডারমাটা** (Echinodermata) ও **কর্ডাটা** (Chordata) প্রাণীর উদ্ভব হয়। পৃথিবীর বিভিন্ন শিলাস্তরে এই সকল প্রাণীর প্রচুর জীবাশ্ম দেখিতে পাওয়া যায়। বিভিন্ন উপায়ে জীবাশ্ম ও শিলাস্তরের বয়স নির্ধারণ করিয়া জীববিজ্ঞানীগণ প্রাণীর ক্রমবিকাশের রূপরেখা বা প্রধান পথটি নির্ধারণ করিয়াছেন। সপ্তম অধ্যায়ে (ভূতাত্ত্বিক বিস্তার) এ সম্পর্কে বিশদভাবে আলোচনা করা হইয়াছে।

মেরুদণ্ডীদের ক্রমবিকাশ (Evolution of Vertebrates) ঃ

মেরুদণ্ডী প্রাণীদের মধ্যে **মৎস্য জাতীয়** প্রাণী বা **পিসিজ** (Fishes)-এর আবির্ভাব হয় প্রায় 45 কোটি বৎসর পূর্বে। ইহার পরবর্তীকালে ভূপৃষ্ঠে স্থলভাগের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় এবং প্রায় 35 কোটি বৎসর পূর্বে **উভচর প্রাণী** বা **অ্যাম্ফিবিয়ার** (Amphibia) সৃষ্টি হয়। প্রায় 28 কোটি বৎসর পূর্বে **সরীসৃপ** বা **রেপ্‌টাইলস** (Reptiles)-এর আবির্ভাব হয় l এই সরীসৃপ জাতীয় প্রাণীর মধ্যে কয়েকটি বিশালাকারের সরীসৃপ একদা পৃথিবীতে রাজত্ব করিত এবং প্রায় 7 কোটি বৎসর ইহাদের প্রাধান্য ছিল, পরে ইহারা সম্পূর্ণ রূপে লুপ্ত (Extinct) হইয়া যায়। এই সকল বিশাল সরীসৃপ বা **ডাইনোসর** (Dinosaurs)-এর জীবাশ্ম এখনও আমাদের মনে বিস্ময় সঞ্চার করে। প্রায় 15 কোটি বৎসর পূর্বে সরীসৃপ জাতীয় পূর্বপুরুষ হইতে একদিকে **পক্ষী** বা **অ্যাভিস** (Aves) এবং অপরদিকে **স্তন্যপায়ী** (Mammal) প্রাণীর উদ্ভব

হয়। আনুমানিক এককোটি বৎসর পূর্বে পৃথিবীতে মানুষের পূর্বপুরুষের আবির্ভাব হয় কিন্তু আধুনিক মানুষ **'হোমো স্যাপিয়েনস'** (*Homo sapiens*)-এর আবির্ভাব হয় মাত্র 40,000 বৎসর পূর্বে।

সারাংশ (Summary)

জীবন বা প্রাণ শব্দটির সহিত আমরা সকলেই পরিচিত কিন্তু জীবনের সঠিক সংজ্ঞা এখনও আমাদের জানা নাই। সাধারণভাবে সজীব বস্তুর (উদ্ভিদ ও প্রাণীর) বৈশিষ্ট্যগুলিকেই জীবনের বৈশিষ্ট্য বলে।

পৃথিবীতে জীবনের উৎপত্তি কিভাবে হইল—ইহার সম্বন্ধে প্রাচীনকাল হইতে আধুনিককাল পর্যন্ত বিভিন্ন মতবাদ প্রচলিত আছে, যথা—

(ক) **বিশ্বসৃষ্টিবাদ**—অর্থাৎ ঈশ্বর কর্তৃক পৃথিবী এবং পৃথিবীতে বসবাসকারী সকল উদ্ভিদ ও প্রাণী এই অবস্থাতেই সৃষ্টি হইয়াছিল।

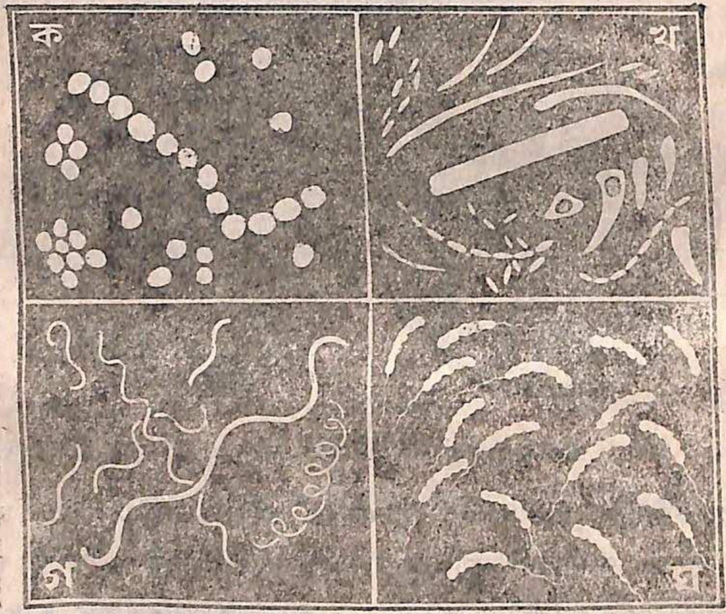
(খ) **স্বতঃস্ফূর্ত উদ্ভব**—অর্থাৎ পচনশীল বস্তু হইতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ক্ষুদ্রাকার জীব বা জীবাণুর সৃষ্টি হয়। বিজ্ঞানী রেডি, স্পালানজনি এবং লুই পাস্তুর বিভিন্ন পরীক্ষার দ্বারা এই তত্ত্বটি ভ্রান্ত বলিয়া প্রমাণ করেন।

(গ) **প্রাকৃতিক বিপর্যয়বাদ**—ক্যুভিয়ের এর মতে মহাপ্রলয়ের ফলে পৃথিবীর জীবকুল ধ্বংস হয়।

(ঘ) **গ্রহান্তর হইতে জীবের আবির্ভাব**—আমাদের সৌরজগতে অন্য কোনো গ্রহের মধ্যে জীবন-এর সন্ধান পাওয়া না গেলেও মহাকাশের কোনোও গ্রহে জীব থাকা সম্ভব এবং তথা হইতে পৃথিবীতে জীব আসা সম্ভব। তবে এই তত্ত্বটি জীবনের আবির্ভাব সম্বন্ধীয় সমস্যার সমাধান করে না।

(ঙ) **রাসায়নিক ক্রমবিকাশ**—সোভিয়েট বিজ্ঞানী **ওপারিন,** আমেরিকার বিজ্ঞানী **মিলার** ও অন্যান্য আধুনিক বিজ্ঞানীদের মতে প্রায় 500 কোটি বৎসর পূর্বে এক মহাজাগতিক বিস্ফোরণে আমাদের পৃথিবীর সৃষ্টি হয়। প্রথমদশায় পৃথিবী জলন্ত অগ্নিপিণ্ডের মত ছিল কিন্তু ধীরে ধীরে উহা শীতল হইয়া আসে। এই সময় উহার মধ্যে নানা রাসায়নিক বিক্রিয়ায় বিভিন্ন অজৈব পদার্থ (যথা-কার্বন, নাইট্রোজেন, হাইড্রোজেন, অক্সাইড প্রভৃতি) হইতে সরল জৈব পদার্থ এবং উহা হইতে ক্রমশ জটিল জৈব যৌগের সৃষ্টি হয়।

কলেরা, টাইফয়েড, ধনুষ্টঙ্কার, সিফিলিস প্রভৃতি রোগ সৃষ্টি করে। মৃতজীবী ব্যাকটিরিয়া বিভিন্ন জৈব বস্তুকে বিশ্লিষ্ট করিয়া তাহা হইতে শক্তি আহরণ করে। অপরদিকে স্বভোজী ব্যাকটিরিয়া **রাসায়নিক সংশ্লেষ** (Chemosynthesis) প্রক্রিয়ার সাহায্যে তাহার খাদ্য প্রস্তুত করে, যথা—সালফার ব্যাকটিরিয়া, নাইট্রিফাইং ব্যাকটিরিয়া, আয়রন ব্যাকটিরিয়া প্রভৃতি।



চিত্র 3 : ব্যাকটিরিয়া।

(ক) কক্কাস (খ) ব্যাসিলাস (গ) স্পাইরিলাম (ঘ) কমাকৃতি ব্যাকটিরিয়া।

কোনো কোনো ব্যাকটিরিয়ার দেহে ব্যাকটিরিও ক্লোরোফিল থাকায় উহারা সবুজ উদ্ভিদের মত সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় খাদ্য প্রস্তুত করিতে পারে।

ওপারিন-এর মতে সম্ভবতঃ পরভোজী ব্যাকটিরিয়া প্রথম সৃষ্টি হইয়াছিল যাহা আদি পৃথিবীর জৈব বস্তু বিশ্লিষ্ট করিয়া শক্তি আহরণ করিত। পরবর্তী কালে পরিবেশে এইসকল জৈব যৌগের অভাব ঘটায় সবুজ কণা বা ক্লোরোফিল-এর উদ্ভব হয় যাহার সাহায্যে সবুজ উদ্ভিদ সৌরশক্তিকে রাসায়নিক শক্তিতে রূপান্তরিত করিতে সক্ষম হয়।

নীল সবুজ শৈবাল (Blue Green Algae) : ইহারা সবুজ উদ্ভিদের মধ্যে নিঃসন্দেহে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। ইহারা সর্বদাই এককোষী হয় কিন্তু বহুক্ষেত্রে ইহারা একত্রিত হইয়া কলোনি (Colony) গঠন করে। নীল সবুজ শৈবালের কোষগুলি ব্যাকটিরিয়ার কোষ হইতে উন্নত কিন্তু ইহাদের কোষেও সুগঠিত নিউক্লিয়াস দেখা যায় না। অন্যান্য সবুজ উদ্ভিদ কোষের মত ইহাদের ক্লোরোফিল প্লাসটিডের মধ্যে একত্রিত থাকে না বরং কোষের বাহিরের দিকে ছড়াইয়া থাকে। অন্যান্য শৈবালের মত ইহাদের কোনো ফ্লাজেলা থাকে না যাহার ফলে ইহারা সচল নহে। ইহাদের দেহে যৌন জনন দেখা যায় না, সাধারণতঃ খণ্ডীকরণ অথবা দ্বিভাজন প্রক্রিয়ায় ইহারা জনন সম্পন্ন করে।

উপরের বিবরণ হইতে দেখা যায় নীল-সবুজ শৈবালই পৃথিবীর আদি-উদ্ভিদ। এই উদ্ভিদ হইতেই সম্ভবতঃ বিভিন্ন প্রকার শৈবাল, ছত্রাক, মসজাতীয় উদ্ভিদ, ফার্নজাতীয় উদ্ভিদ, ব্যক্তবীজী, গুপ্তবীজী প্রভৃতি উদ্ভিদের উৎপত্তি হইয়াছে। অপরদিকে সম্ভবতঃ এককোষী প্রাণী **ইউগ্লিনা** (*Euglena*) বা তাহার সমগোত্রীয় কোনো ফ্লাজেলেট হইতে বিভিন্ন প্রাণী ক্রমবিকাশ লাভ করে।

উদ্ভিদের ক্রমবিকাশ (Evolution of Plants) **:** পৃথিবীর শিলাস্তরে বিভিন্ন উদ্ভিদের জীবাশ্ম ও বর্তমান উদ্ভিদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য পর্যবেক্ষণ করিয়া জীববিজ্ঞানীগণ উদ্ভিদের ক্রমবিকাশ সম্পর্কে ধারণা করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে পৃথিবীর আদিমতম জীবটি বর্তমানকালের ভাইরাস হইতেও সরল গঠনের ছিল। আদিজীব শক্তির জন্য পরিবেশের অজৈব যৌগের উপর নির্ভর করিত। এখনও কোনো কোনো জীবাণু এই পদ্ধতিতে শক্তি সংগ্রহ করে। পরবর্তীকালে পরিবেশে ঐরূপ অজৈব যৌগের অভাব ঘটিলে এই সরল জীবে ক্লোরোফিল গঠিত হয় যাহার সাহায্যে ইহা নিজের খাদ্য প্রস্তুত করিতে সক্ষম হয়। প্রথমদিকে ক্লোরোফিল জীবদেহের সাইটোপ্লাজমে বিক্ষিপ্ত ভাবে থাকে (**নীল-সবুজ শৈবাল**), কিন্তু পরবর্তীকালে বিশেষ গঠনের ক্লোরোপ্লাস্ট গঠিত হয় (**ক্ল্যামাইডোমোনাস**)। ক্লোরোফিল থাকার জন্য ইহাদের বর্ণ সবুজ। অপরদিকে ক্লোরোফিল না থাকায় কয়েকটি অসবুজ উদ্ভিদ গঠিত হয়, ইহাদের **ছত্রাক** (Fungi) বলে। ইহারা সাধারণতঃ মৃত-জীবী অথবা পরজীবী হইয়া থাকে। জৈব অভিব্যক্তির ফলে ক্রমশ এককোষী হইতে বহুকোষী এবং জটিল হইতে জটিলতর উদ্ভিদের সৃষ্টি হইতে থাকে।

বিজ্ঞানী হলডেন-এর মতে এইসময় সমগ্র পৃথিবী উষ্ণ ও তরল রসে পূর্ণ ছিল। ধীরে ধীরে পৃথিবী শীতল হইতে লাগিল এবং এই জৈব যৌগ হইতে প্রথমে কোলয়েড ও পরে জটিল মিশ্রণ কণা বা কোয়াসারভেট গঠিত হইল। এই কোয়াসারভেট হইতেই আদি জীবনের সূত্রপাত। এই জটিল অণুগুলি স্ব-অনুঘটক রূপে রাসায়নিক ক্রিয়া বিক্রিয়া ত্বরান্বিত করিতে পারিত এবং আত্মোৎপাদনে সক্ষম ছিল। সেইজন্য বিজ্ঞানী মূলার ইহাদের 'মুক্তজিন' নামে অভিহিত করেন, এই মুক্তজিনের পরিব্যাক্তির ক্ষমতা ছিল যাহার ফলে পরিবেশের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ইহা হইতে ক্রমশ সরল ও জটিল গঠনের জীবের উদ্ভব হয়। অনুমান করা হয় নীল সবুজ শৈবাল হইতে বিভিন্ন উদ্ভিদের উদ্ভব হয় এবং ফ্লাজেলেট জাতীয় এককোষী প্রাণী হইতেই উচ্চতর প্রাণীর ক্রমবিকাশ হয়।

অনুশীলনী

(সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও)

1. জীবন কি? জীবনের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখ কর।
2. পৃথিবীতে জীবনের উৎপত্তি সম্পর্কে বিভিন্ন মতবাদগুলি উল্লেখ কর। বিশ্বসৃষ্টিবাদ কাহাকে বলে?
3. স্বতঃস্ফূর্ত উদ্ভব কি? কোন্ কোন্ বিজ্ঞানী এই মতবাদের বিরোধিতা করেন?
4. স্বতঃস্ফূর্ত উদ্ভব মতবাদের বিরুদ্ধে একটি পরীক্ষার উল্লেখ কর।
5. রাসায়নিক ক্রমবিকাশ কাহাকে বলে? ইহার প্রধান পর্যায়গুলি কি কি?
6. কিভাবে পৃথিবীর সৃষ্টি হয়?
7. পৃথিবীতে জৈব যৌগের সৃষ্টি কিভাবে হয়?
8. কোলয়েড এবং কোয়াসারভেট কি?
9 মুক্ত জিন কাহাকে বলে? কে এই নামকরণ করেন?
10. নিউক্লিক অ্যাসিড কি? সংক্ষেপে ইহার গঠন লেখ।
11. আদিকোষী বা প্রোক্যারিয়ট কাহাকে বলে?
12. ভাইরাস, ব্যাকটিরিয়া ও নীল সবুজ শৈবালের গঠন কিরূপ?
13. পৃথিবীতে উদ্ভিদের ক্রমবিকাশ কিভাবে হয়?
14. পৃথিবীতে প্রাণীর ক্রমবিকাশের ধারাটি সংক্ষেপে লেখ।
15. পৃথিবীতে জীবনের উৎপত্তি কিভাবে হয় তাহা সংক্ষেপে লেখ।

গ্রন্থপঞ্জী ও নির্দেশিকা (References)

1. Oparin, A. I. 1957, The Origin of Life, 3rd. ed Academic Press, New York.
2. Urey, H. C. 1952, The Planets, New Haven, Yale University Press.
3. Shapley, H., 1958, Of Men and Stars Boston, Mass : Beacon Press.
4. Miller S. L. 1962, The Origin of Life : An essay Published in 'This is life', edited by Johnson and Steere Holt, Rine hart and Winston.
5. Roberts M.B.V. 1976, Biology, A Functional Approach. 2nd ed. (Chapter 36, Some Major Steps in Evolution) The English Language Book Society & Nelson.
6. Dodson E.O. 1968, Evolution, Process and Product Reinhold/East West Press.
7. মুখোপাধ্যায়, মেদ্দা, মেদ্দা ও মুখোপাধ্যায় 1980, জীববিজ্ঞান, নিউ বুকস্টল, কলিকাতা।
৪. গুহ, মৃত্যুঞ্জয় প্রসাদ 1980, জীবের ক্রমবিকাশ, শ্রীভূমি পাবলিশিং কোম্পানি, কলিকাতা।
9. তারাপদ চট্টোপাধ্যায় ও সুমন্ত মুখোপাধ্যায়, 1980, প্রাণিবিদ্যা (প্রথম খণ্ড) নিউ বুক স্টল, কলিকাতা।



চিত্র 38 : পৃথিবীতে জীবনের ক্রমবিকাশের চিত্ররূপ।

[পৃথিবীতে জীবের ক্রমবিকাশকে এক বৎসরের মধ্যে দেখানো হইয়াছে। ক্যালেণ্ডারের একটি দিন প্রায় এক কোটি বৎসরের সমান। এই ক্যালেণ্ডার অনুসারে মানুষের উৎপত্তি হয় বৎসরের শেষ দিনটিতে অর্থাৎ 31 ডিসেম্বরের কোনো এক সময়ে]।

এই সময় ভূপৃষ্ঠে ক্রমাগত আন্দোলনের ফলে স্থলভাগের সৃষ্টি হয় এবং উহা জলের উপর উঠিয়া আসে। প্রায় 35 কোটি বৎসর পূর্বে এইসকল স্থলভাগে রেণুউৎপাদনকারী মস-জাতীয় উদ্ভিদ বা **ব্রায়োফাইটা** (Bryophyta) এবং ফার্নজাতীয় উদ্ভিদ বা **টেরিডোফাইটা** (Pteridophyta) সৃষ্টি হয়। এই সময়কার ফার্ন উদ্ভিদগুলি যথেষ্ট উচ্চতা বিশিষ্ট (প্রায় 100 ফুট দীর্ঘ) ছিল। প্রায় 20 কোটি বৎসর পূর্বে এই সকল উদ্ভিদের অধিকাংশই প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ধ্বংস হইয়া যায়। ক্রমে নূতন পরিবেশে ধীরে ধীরে সপুষ্পক উদ্ভিদের সৃষ্টি হয়। সপুষ্পক উদ্ভিদের মধ্যে **ব্যক্তবীজী** বা **জিমনোস্পার্ম** (Gymnosperm)-এর উৎপত্তি হয় প্রায় 15 কোটি বৎসর পূর্বে এবং **গুপ্তবীজী** বা **অ্যানজিওস্পার্ম** (Angiosperm)-এর উৎপত্তি হয় প্রায় 10 কোটি বৎসর পূর্বে। পৃথিবীর বিভিন্ন শিলাস্তরে প্রাপ্ত **জীবাশ্ম** বা **ফসিল** উদ্ভিদের এইরূপ ক্রমবিকাশকে সমর্থন করে।

প্রাণীর ক্রমবিকাশ (Evolution of animals): পৃথিবীতে জীবনের আবির্ভাবের পরই একদিকে যেমন অভিব্যক্তির ফলে সরল হইতে জটিল উদ্ভিদের সৃষ্টি হয়, অন্যদিকে একইভাবে ক্রমশঃ জটিল প্রাণীরও সৃষ্টি হইতে থাকে। অনুমান করা হয় উদ্ভিদের ক্রমবিকাশের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই প্রাণীর ক্রমবিকাশ শুরু হয়।

প্রাণীজগতে এককোষী প্রাণী বা **প্রোটোজোয়ার** (Protozoa) উৎপত্তি সর্বপ্রথম হয়। পৃথিবীর বিভিন্ন শিলাস্তরে এমনকি প্রিক্যামব্রিয়ান যুগেও খোলকযুক্ত এককোষী প্রাণীর (Shelled Protozoa) জীবাশ্ম পাওয়া যায়। অবশ্য প্রোটোজোয়া একটি বিশাল পর্ব এবং ইহার অন্তর্গত প্রাণীগুলি আকৃতি ও প্রকৃতিতে বৈচিত্র্যময়। পূর্বে অনুমান করা হইত অ্যামিবা গোত্রীয় এককোষী প্রাণী হইতেই পরবর্তী প্রাণীর সৃষ্টি হইয়াছে কিন্তু বর্তমানে বিজ্ঞানীদের ধারণা **ইউগ্লিনা** (*Euglena*) বা তাহার সমগোত্রীয় ফ্লাজেলেট হইতেই পরবর্তী জটিল গঠনের প্রাণীর উদ্ভব হইয়াছে।

প্রাণীবিজ্ঞানীদের ধারণা কতকগুলি প্রোটোজোয়া মিলিত হইয়া এক প্রকারের কলোনি (Colony) গঠন করে, যাহা হইতে স্পঞ্জ বা **ছিদ্রাল প্রাণী** (Porifera) সৃষ্ট হয়। **প্রোটেরোস্পঞ্জিয়া** নামক প্রোটোজোয়া এইরূপ কলোনি গঠন করে। অবশ্য এই প্রাণীগুলি প্রাণীর ক্রমবিকাশের প্রধান রেখায় না আসায় ইহারা অনুন্নত পর্যায়ে থাকিয়া যায়। অপরদিকে ধীরে

তৃতীয় অধ্যায়

জৈব অভিব্যক্তির প্রমাণসমূহ (Evidences of organic evolution)

জৈব অভিব্যক্তি এখন আর অনুমানমাত্র নয়, ইহার অনুকূলে একাধিক **সাক্ষ্যপ্রমাণ** (Evidences) আছে। এইসকল প্রমাণ পৃথিবীর মধ্যে নানা-ভাবে বিস্তৃত হইয়া আছে। **চার্লস ডারউইন** (Charles Darwin), **ভন বেয়ার** (Von Baer), **হেকেল** (Haeckel), প্রমূখ জীববিজ্ঞানী এইসকল ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত প্রমাণগুলিকে প্রকৃতি হইতে সংগ্রহ করেন এবং ইহাদের জৈব-অভিব্যক্তির প্রমাণরূপে উল্লেখ করেন। বর্তমানে জৈব অভিব্যক্তির অনুকূলে এত প্রমাণ সংগ্রহ করা হইয়াছে যে জৈব অভিব্যক্তিকে কোনোভাবেই অস্বীকার করা যায় না। পৃথকভাবে এই সকল প্রমাণের একটি বা দুটি হয়তো জৈব অভিব্যক্তির প্রমাণ হিসাবে যথেষ্ট নয়, কিন্তু সামগ্রিকভাবে এই প্রমাণ-গুলি জৈব অভিব্যক্তিকে সমর্থন করে ও তাহার সত্যতাকে প্রতিষ্ঠিত করে। নীচে জৈব অভিব্যক্তির প্রধান প্রমাণগুলি উল্লেখ করা হইল।

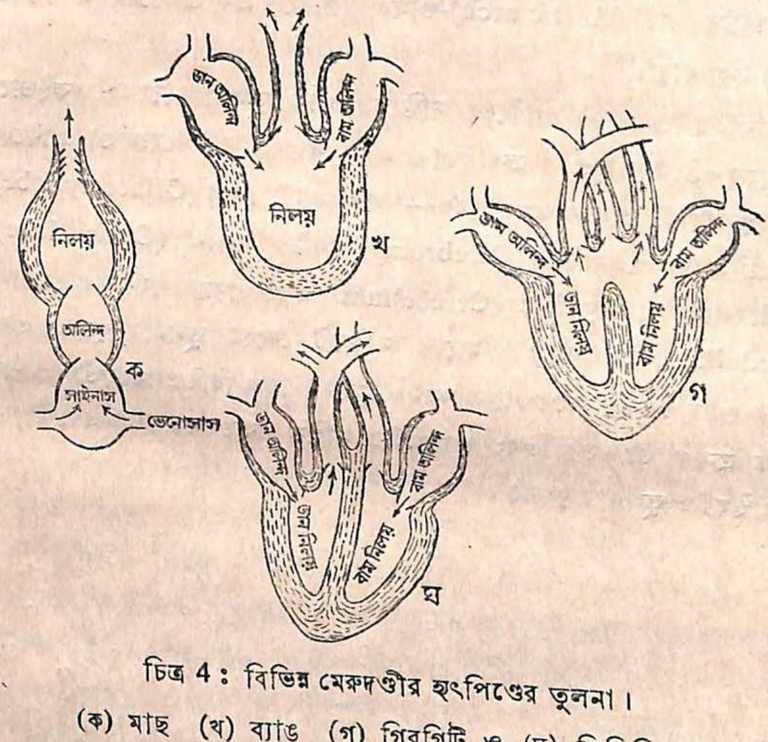
জৈব অভিব্যক্তির প্রমাণসমূহ

- অঙ্গসংস্থানগত
  - তুলনামূলক অঙ্গসংস্থান
  - সমসংস্থ অঙ্গ
  - নিষ্ক্রিয় অঙ্গ
  - সংযোগকারী জীব
- ভৌগোলিক বিস্তার
- ভ্রূণতত্ত্বীয়
- জীবাশ্মঘটিত
- শ্রেণীবিন্যাস
- শারীরবৃত্তীয়

1. অঙ্গ-সংস্থান গত প্রমাণ (Morphological evidences)

উদ্ভিদ ও প্রাণীর বাহ্যিক এবং আভ্যন্তরীন গঠন পর্যালোচনা করিবার বিষয়টিকে অঙ্গসংস্থান (Morphology) বলা হয়। বিভিন্ন উদ্ভিদ ও প্রাণীর অঙ্গগুলির বাহ্যগঠন ও অন্তর্গঠন অথবা সামগ্রিকভাবে জীবকে লক্ষ্য করিলে তাহাদের মধ্যে জৈব অভিব্যক্তির ধারা সহজেই লক্ষ্য করা যায়। অঙ্গ-সংস্থানগত প্রমাণটিকে কয়েকটি বিভাগে বিভক্ত করা যায়।

(ক) তুলনামূলক অঙ্গসংস্থান (Comparative Anatomy) ঃ বিভিন্ন মেরুদণ্ডী প্রাণীর আভ্যন্তরীন অঙ্গ পরীক্ষা করিয়া দেখিলে উহাদের গঠনে বিশেষ সাদৃশ্য এবং অভিব্যক্তির ধারা দেখা যায়। উদাহরণস্বরূপ যদি মাছ, ব্যাঙ, গিরগিটি, পায়রা এবং গিনিপিগের হৃৎপিণ্ডের গঠন পরীক্ষা করা যায় তাহা



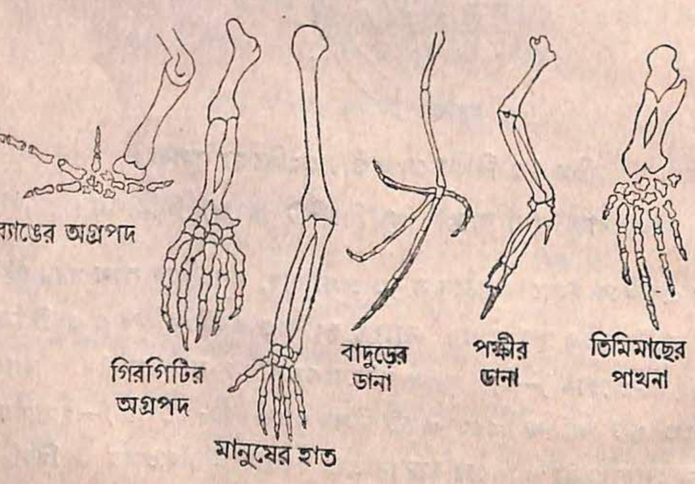
চিত্র 4 ঃ বিভিন্ন মেরুদণ্ডীর হৃৎপিণ্ডের তুলনা।
(ক) মাছ (খ) ব্যাঙ (গ) গিরগিটি ও (ঘ) গিনিপিগ।

হইলে একদিকে ইহাদের গঠনে সাদৃশ্য দেখা যায়, অপরদিকে সরল গঠন হইতে ক্রমশ জটিল গঠন দেখা যায়। মাছের হৃৎপিণ্ডে একটি অলিন্দ ও একটি নিলয় থাকে (দ্বি-প্রকোষ্ঠ)—ইহা জলজ পরিবেশের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ। ব্যাঙের হৃৎপিণ্ডে দুটি অলিন্দ এবং একটি নিলয় থাকে (ত্রি-প্রকোষ্ঠ)—ইহার ফলে ব্যাঙের দেহে ধমনী ও শিরার রক্ত মিশ্রিত অবস্থায় প্রবাহিত হয়। গিরগিটির হৃৎপিণ্ডের দুইটি অলিন্দ এবং একটি নিলয় থাকে তবে নিলয়টি আংশিকভাবে প্রাচীর দ্বারা বিভাজিত। পায়রা ও গিনিপিগের হৃৎপিণ্ডে দুইটি অলিন্দ ও দুইটি নিলয় দেখা যায় (চারি-প্রকোষ্ঠ)। এইরূপ হৃৎপিণ্ডে ধমনী ও শিরার রক্ত মিশ্রিত হইতে পারে না। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, মেরুদণ্ডী প্রাণীর

হৃৎপিণ্ডের মৌলিক গঠনটি একই প্রকার তবে বিভিন্ন পরিবেশে থাকিবার জন্য ইহাদের গঠন পরিবর্তিত হয়। ইহা হইতে অনুমান করা যায় যে একই পূর্ব-পুরুষ হইতে বিভিন্ন মেরুদণ্ডী প্রাণীর উদ্ভব হইয়াছে।

অনুরূপভাবে মৎস্য, উভচর, সরীসৃপ এবং স্তন্যপায়ীর মহাধমনী বা অ্যাওর্টিক আর্চ (Aortic arch)-গুলির বিন্যাসেও এক প্রকারের ক্রমবিবর্তন লক্ষ্য করা যায়।

বিভিন্ন মেরুদণ্ডী প্রাণীদের মস্তিষ্কের গঠন তুলনা করিলেও একইভাবে মস্তিষ্কের গঠনে সাদৃশ্য ও ক্রমবিকাশ লক্ষ্য করা যায়। মেরুদণ্ডী প্রাণীদের মস্তিষ্কে পাঁচটি প্রধান অংশ থাকে—অলফ্যাকটরী লোব (Olfactory lobe), সেরিব্রাম বা গুরুমস্তিষ্ক (Cerebrum), অপটিক লোব (Optic lobe), সেরিবেলাম বা লঘুমস্তিষ্ক (Cerebellum) এবং সুষুম্না শীর্ষক বা মেডালা (Medulla oblangata)। মাছের মস্তিষ্কটি দেহের তুলনায় ক্ষুদ্রতর এবং উহার গুরুমস্তিষ্কটিও অপেক্ষাকৃত অনেক ক্ষুদ্র। কিন্তু বিভিন্ন মেরুদণ্ডী প্রাণীর মস্তিষ্ক ক্রমশ উন্নততর এবং স্তন্যপায়ীর মস্তিষ্ক সর্বাপেক্ষা উন্নত এবং উহার গুরুমস্তিষ্কটিও তুলনায় বৃহত্তর।



চিত্র 5 : সমসংস্থ অঙ্গ (বিভিন্ন মেরুদণ্ডী প্রাণীর অগ্রপদের তুলনা)।

(খ) সমসংস্থ অঙ্গ (Homologous organs) : যে সকল অঙ্গের উৎপত্তি বা পরিস্ফুরণ পদ্ধতি (Development) একই প্রকার তাহাদের সমসংস্থ অঙ্গ

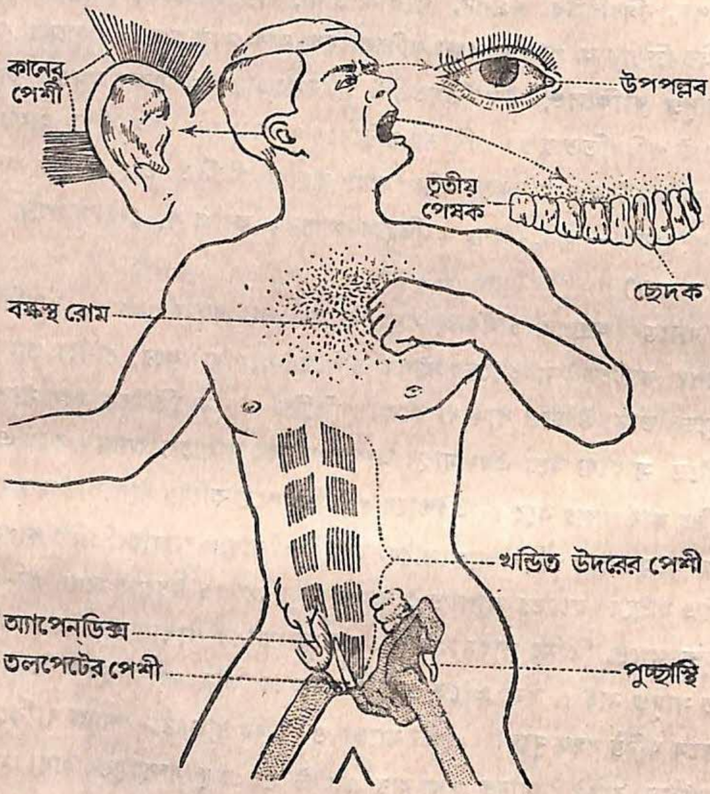
বলে। সমসংস্থ অঙ্গের কাজ একই প্রকার নাও হইতে পারে। ইহার ফলে সমসংস্থ অঙ্গের বাহ্যগঠনে বৈসাদৃশ্য দেখা যায়। উদাহরণস্বরূপ ব্যাঙের অগ্রপদ, গিরগিটির অগ্রপদ, পাখীর ডানা, বাদুড়ের ডানা, মানুষের হাত ও তিমির ফ্লিপার বা পাখ্‌না লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে বাহ্যগঠনে ইহাদের মধ্যে বৈসাদৃশ্য থাকিলেও, উৎপত্তিগত ও গঠনগতভাবে এই সকল অঙ্গগুলি অগ্রপদেরই পরিবর্তিত রূপ। বিভিন্ন পরিবেশে থাকার জন্য অঙ্গগুলির বাহ্যরূপে পরিবর্তন ঘটিলেও যে সকল অস্থি দ্বারা ইহারা নির্মিত তাহা মূলত একই থাকে (যথা—হিউমেরাস, রেডিয়াস-আলনা, কারপাল, মেটাকারপাল ও ফ্যালেঞ্জেস)।

ব্যাঙের অগ্রপদ চলিবার সময় দেহের ভার বজায় রাখে। গিরগিটির অগ্রপদ মাটিতে বা গাছের উপর চলিতে সাহায্য করে, পাখীর ডানা ও বাদুড়ের ডানা উড়িতে সাহায্য করে। তিমির পাখ্‌না তিমিকে জলে সাঁতার কাটিতে সাহায্য করে এবং মানুষ তাহার হাতের সাহায্যে আহার করে এবং বিভিন্ন কার্য সম্পন্ন করে। এইভাবে প্রতিটি ক্ষেত্রে কার্যের পার্থক্যের জন্য সমসংস্থ অঙ্গের বাহ্য গঠনে আপাত বৈসাদৃশ্য দেখা যায়। আবার তিমির পাখনার সহিত মানুষের হাতের আপাত বৈসাদৃশ্য দেখা গেলেও উভয়ের মধ্যে গঠনগত সাদৃশ্য আছে, তিমির পাখনার সহিত কোনো মাছের পাখনার সেইরূপ গঠনগত সাদৃশ্য নাই। ইহা হইতে প্রমাণিত হয় যে তিমি এবং মানুষ অভিব্যক্তির নিয়মে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ যুক্ত। একটি মাছের ও তিমির বাহ্যগঠনে সাদৃশ্য থাকিলেও অন্তর্গঠনে যথেষ্ট বৈসাদৃশ্য দেখা যায় এবং উভয়ে যে দূরসম্পর্কযুক্ত তাহা লক্ষ্য করা যায়। উপরের পর্যবেক্ষণগুলি অভিব্যক্তিকে সমর্থন করে।

কোনো কোনো ক্ষেত্রে দেখা যায় যে অঙ্গের উৎপত্তি ও গঠন প্রণালী এক না হইলেও দুইটি অঙ্গের কাজ একই প্রকার হইলে তাহাদের মধ্যে সাদৃশ্য দেখা যায়। এইরূপ আপাত সাদৃশ্যযুক্ত অঙ্গকে **সমবৃত্তীয় অঙ্গ** (Analogous organs) বলে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় প্রজাপতির ডানা এবং পাখীর ডানার মধ্যে গঠনগত ও উৎপত্তিগত কোনো সাদৃশ্য নাই। কেবলমাত্র একই কার্যের জন্য উভয়ের মধ্যে আপাত-সাদৃশ্য দেখা যায়।

(গ) নিষ্ক্রিয় অঙ্গ (Vestigeal organs) : কোনো কোনো উদ্ভিদ ও প্রাণীতে কিছু ক্ষুদ্রাকার অপরিণত ও নিষ্ক্রিয় অঙ্গ দেখা যায়। ঐ উদ্ভিদে বা প্রাণীতে এই সকল অঙ্গ অত্যন্ত অপরিণত অবস্থায় থাকে এবং কার্যকরী হয়

না। সেইজন্য ইহাদের লুপ্তপ্রায় বা নিষ্ক্রিয় অঙ্গ বলা হয়। অন্যান্য প্রজাতির উদ্ভিদ বা প্রাণীর দেহে এই সকল অঙ্গ পরিণত ও কার্যকরী অবস্থায় থাকে।



চিত্র 6 : মানুষের নিষ্ক্রিয় অঙ্গসমূহ।

মানুষের দেহে প্রায় একশতটি এইরূপ নিষ্ক্রিয় অঙ্গের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। মানুষের দেহে অবস্থিত কয়েকটি নিষ্ক্রিয় অঙ্গের পরিচয় নীচে সংক্ষেপে দেওয়া হইল।

(i) **কানের পেশী**—মানুষের কানের পেশীগুলি অপরিণত কারণ শব্দতরঙ্গ সংগ্রহ করিবার জন্য মানুষকে কান নাড়াইতে হয় না। কিন্তু গরু, ছাগল, খরগোশ প্রভৃতি অন্যান্য স্তন্যপায়ী প্রাণীর কানের পেশী সুগঠিত এবং শব্দ সংগ্রহের জন্য ব্যবহৃত হয়।

(ii) **অ্যাপেনডিক্স**—মানবদেহের বৃহদন্ত্রের সহিত যুক্ত সিকামের

অ্যাপেনডিক্স (Vermiform appendix) নামক যে ক্ষুদ্র অংশটি আছে তাহা লুপ্তপ্রায় এবং কার্যকরী নয়, কিন্তু গিনিপিগে এই অঙ্গটি সুগঠিত এবং কার্যকরী। শাকাহারী প্রাণীর সিকামে অবস্থিত জীবাণুগুলি সেলুলোজ পাচনে সাহায্য করে।

(iii) **নিকৃটিটেটিং মেমব্রেন** (Nictitating membrane) : মানবচক্ষুর ভিতরের কোনে একটি ক্ষুদ্রাকার পর্দা বা প্লাইকা সেমিলিউনারিস আছে। এই অঙ্গটি মানবদেহে নিষ্ক্রিয় থাকিলেও ব্যাঙ, পাখী প্রভৃতি স্থলচর মেরুদণ্ডী প্রাণীর তৃতীয় অক্ষিপল্লবরূপে সুগঠিত ও কার্যকরী থাকে। ইহাকে উপপল্লবও বলা হয়।

(iv) **পুচ্ছাস্থি** (Coccyx) : মানবদেহে লেজ না থাকিলেও মেরুদণ্ডের শেষপ্রান্তে একটি ক্ষুদ্রাকার ককসিজিয়াল কশেরুকা বা পুচ্ছাস্থি থাকে। ইহাও মানবদেহের একটি নিষ্ক্রিয় অঙ্গ।

(v) মানুষের আক্কেল দাঁত বা পশ্চাদ মোলার অন্যান্য দাঁতের সঙ্গে উৎপন্ন হয় না এবং কার্যকরী না হওয়ার উহা নিষ্ক্রিয় অঙ্গরূপে পরিগণিত।

(vi) পুরুষের দেহে যে স্তনগ্রন্থি দেখা যায় উহা অপরিণত এবং নিষ্ক্রিয় অঙ্গ।

মানবদেহের নিষ্ক্রিয় অঙ্গ ব্যতীত অন্যান্য প্রাণীর দেহেও প্রচুর নিষ্ক্রিয় অঙ্গ দেখা যায়, যথা—

(i) উট পাখী ও কিউই পাখীর ডানাগুলি অপরিণত ও নিষ্ক্রিয় হওয়ায় এই পাখীরা উড়িতে পারে না।

(ii) ময়াল সাপের উদরে পশ্চাদপদ অস্থির কিছু অংশ নিষ্ক্রিয় অবস্থায় থাকে। ইহা হইতে অনুমান করা হয় এই সাপের পূর্বপুরুষদের পদ সুগঠিত ছিল।

(iii) গ্রীনল্যাণ্ডের তিমির দেহে ক্ষুদ্রাকার শ্রোণীচক্র ও পশ্চাদপদের অবলুপ্ত অংশ নিষ্ক্রিয়ভাবে থাকে।

(iv) আধুনিক ঘোড়ার পায়ে যে ক্ষুদ্রাকার স্প্লিণ্ট বোন (Splint bone) পাওয়া যায় উহা প্রকৃতপক্ষে প্রাচীন ঘোড়ার অঙ্গুলির সমগোত্রীয়। সমগ্র জীবজগতে এইভাবে অগণিত নিষ্ক্রিয় অঙ্গের সন্ধান পাওয়া যায়। জীবদেহে প্রতিটি অঙ্গ যখন সুগঠিত এবং কার্যকরী তখন এইরূপ নিষ্ক্রিয় অঙ্গের উপস্থিতি বিস্ময়কর। একমাত্র জৈব অভিব্যক্তিই নিষ্ক্রিয় অঙ্গের উপস্থিতি ব্যাখ্যা

করিতে পারে। অনুমান করা হয় ঐ সকল নিষ্ক্রিয় অঙ্গ যে সকল জীবে পাওয়া যায় তাহাদের পূর্বপুরুষে এই অঙ্গগুলি সুগঠিত ও কার্যকরী ছিল। ব্যবহৃত না হওয়ায় কালক্রমে ইহারা ক্ষুদ্রাকার ও লুপ্তপ্রায় হইয়া পড়িয়াছে। অতএব নিষ্ক্রিয় অঙ্গের উপস্থিতিও জৈব অভিব্যক্তিকে সমর্থন করে।

(ঘ) **সংযোগকারী জীব (Connecting link) ঃ** জীবজগতে এমন কয়েকটি বিশেষ ধরণের উদ্ভিদ ও প্রাণী পাওয়া যায় যাহাদের কোনো বিশেষ পর্বে অন্তর্ভুক্ত করা চলে না—ইহারা দুইটি বিভিন্ন উদ্ভিদ বা প্রাণী গোষ্ঠীর মধ্যে যোগসূত্র রচনা করে। এই ধরনের জীবকে সংযোগকারী জীব (Connecting link) অথবা মধ্যবর্তী জীব (Intermediate form) বলে। এই অন্তর্বর্তী জীবগুলি অভিব্যক্তিকে সমর্থন করে কারণ একটি সরল গঠনের জীব হইতে যখন একটি জটিল গঠনের জীব উৎপন্ন হয় তখন এই সকল মধ্যবর্তী জীব হইতেই অভিব্যক্তির পথ বুঝিতে পারা যায়।

জীবজগতে অধিকাংশ মধ্যবর্তী জীব পৃথিবীর পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে তবে কয়েকটি কোনো কোনো মধ্যবর্তী প্রাণীর কেবল জীবাশ্ম পাওয়া গিয়াছে। মধ্যবর্তী জীব এখনও দেখা যায়। নীচে কয়েকটি মধ্যবর্তী প্রাণীর বিবরণ সংক্ষেপে দেওয়া হইল।



চিত্র 7 ঃ ফসিল পাখী (আরকিওপটেরিক্স)।

(i) **আরকিওপটেরিক্স (*Archaeopteryx*) ঃ** ইহা একটি অধুনালুপ্ত পাখী যাহার জীবাশ্ম বা ফসিল (Fossil) পাওয়া গিয়াছে। ইহাকে সরীসৃপ ও

পাখীর মধ্যবর্তী প্রাণী বলা হয়, কারণ ইহারা দেখিতে পাখির মত হইলেও ইহাদের মুখের মধ্যে দন্ত এবং ডানায় নখের উপস্থিতি দেখা গিয়াছে। ইহা হইতে অনুমান করা হয় সরীসৃপ হইতে পক্ষী শ্রেণীর উদ্ভব হয়।

(ii) **হংস চঞ্চু বা প্লাটিপাস** (Platypus) : এই স্তন্যপায়ী প্রাণীটি এখনও অস্ট্রেলিয়ায় পাওয়া যায়। অন্যান্য স্তন্যপায়ী প্রাণীর মত ইহাদের দেহ রোমে ঢাকা এবং ইহাদের স্তন্যগ্রন্থি আছে। আবার সরীসৃপের ন্যায় ইহারা ডিম পাড়ে এবং ইহাদের বক্ষে T-এর মত ইণ্টার ক্লাভিকাল (T-shaped Inter-clavicle) নামক অস্থি আছে। হংসের মত চঞ্চু থাকায় ইহাদের হংস চঞ্চু প্লাটিপাস (Duck billed platypus) বলে।

(iii) **লাং ফিশ** (Lung fish) : পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে কয়েকটি বিশেষ ধরনের মাছ দেখা যায়। সাধারণতঃ মাছ ফুলকার সাহায্যে শ্বাসকার্য সম্পন্ন করে। কিন্তু এইসকল মাছের দেহে ফুলকার অতিরিক্ত ফুসফুসের মত গঠন দেখা যায়। যাহার ফলে ইহারা জলের বাহিরে স্থলেও কিছু সময় অতিবাহিত করিতে পারে। অনুমান করা হয় ইহারা মৎস্য ও উভচর শ্রেণীর মধ্যবর্তী প্রাণী। উদাহরণ : অস্ট্রেলিয়ার **নিওসেরাটোডাস** (*Neoceratodus*), আফ্রিকার **প্রোটোপটেরাস্** (*Protopterus*) ও দক্ষিণ আমেরিকার **লেপিডো সাইরেন** (*Lepidosiren*)।

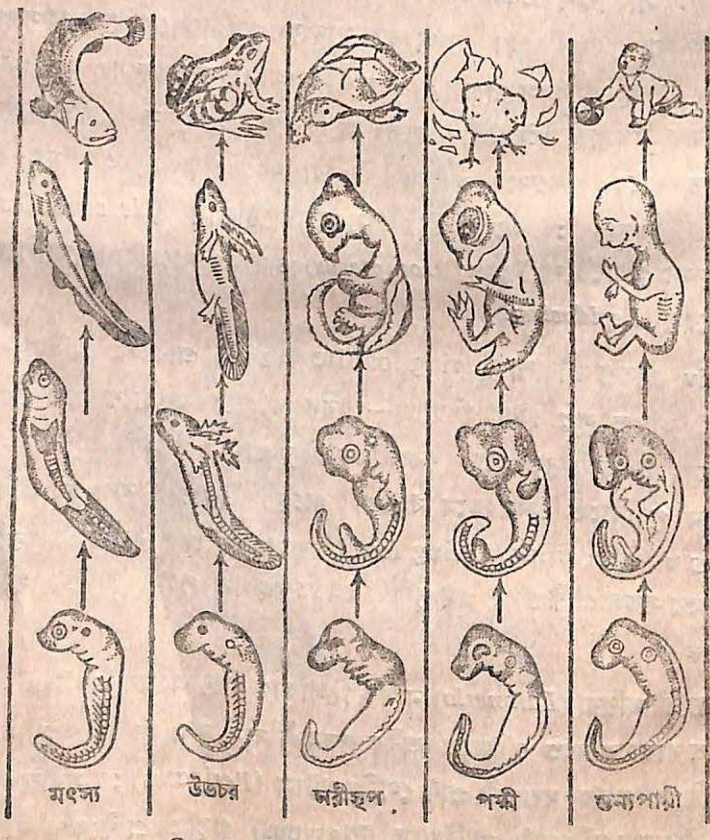
(iv) **জীবন্ত জীবাশ্ম** (Living fossil) : অন্তর্বর্তী প্রাণীদের অধিকাংশই পৃথিবী হইতে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে—কেবল তাহাদের জীবাশ্মের সূত্র ধরিয়া তাহাদের উপস্থিতি বুঝা যায়। কিন্তু কিছু কিছু প্রাচীন অন্তর্বর্তী প্রাণী এখনও বর্তমান পৃথিবীতে কোনরকমে বাঁচিয়া আছে। ইহাদের বলা হয় জীবন্ত জীবাশ্ম বা লিভিং ফসিল (Living fossil), কারণ ইহাদের নিকটবর্তী অন্যান্য প্রজাতির সকল প্রাণীগুলিই এই পৃথিবী হইতে বহুকাল পূর্বেই অবলুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

ল্যাটিমেরিয়া (*Latimeria*) নামক সিলাকান্থ মাছ, এইরূপ একটি জীবন্ত জীবাশ্ম যাহাকে মৎস্য ও উভচর শ্রেণীর অন্তর্বর্তী মনে করা হয়। অঙ্গুরীমাল ও সন্ধিপদ পর্বের মধ্যবর্তী প্রাণী **পেরিপেটাস** (*Peripatus*) ; সরীসৃপ ও স্তন্যপায়ীর মধ্যবর্তী প্রাণী **প্লাটিপাস** (Platypus) প্রভৃতি প্রাণীকেও জীবন্ত জীবাশ্ম বলা হয়। ইহারাও জৈব অভিব্যক্তির অন্যতম প্রধান সাক্ষী কারণ

ইহাদের লক্ষ্য করিলে বুঝিতে পারা যায় যে একটি পর্বের জীব তাহার পূর্ববর্তী পর্ব হইতে সৃষ্ট হইয়াছে।

2. **ভ্রূণ তত্ত্বীয় প্রমাণ (Embryological Evidences) :**

যে বিদ্যার সাহায্যে প্রাণীর ডিম্ব দশা হইতে পরিণত দশার মধ্যবর্তী অবস্থা অর্থাৎ ভ্রূণ সম্পর্কে পঠন পাঠন করা যায় তাহাকে **ভ্রূণ তত্ত্ব বা এম্ব্রায়োলজি** (Embryology) বলে। প্রাণীর ডিম্ব দশা হইতে পরিণত দশায় পরিবর্তিত হওয়াকে **পরিস্ফূরণ** (Development) বলে। বিভিন্ন প্রাণীর **পরিস্ফূরণ দশা** (Developmental stages) লক্ষ্য করিলে তাহাদের মধ্যে বিস্ময়কর সাদৃশ্য দেখা যায়, ইহার জন্য অনেকে ভ্রূণতত্ত্বকে অভিব্যক্তির সমর্থনে ব্যবহার করেন। সাধারণতঃ বয়স্ক অবস্থায় বিভিন্ন উদ্ভিদ ও প্রাণীর মধ্যে বৈসাদৃশ্য



চিত্র ৪ : বিভিন্ন মেরুদণ্ডী প্রাণীর ভ্রূণ।
(মাছ, ব্যাঙ, সরীসৃপ, পাখী ও স্তন্যপায়ী)

দেখা গেলেও পরিস্ফুরণের সময় বা ভ্রূণ অবস্থায় বিভিন্ন প্রাণীর মধ্যে বহু নিকট সাদৃশ্য দেখা যায়।

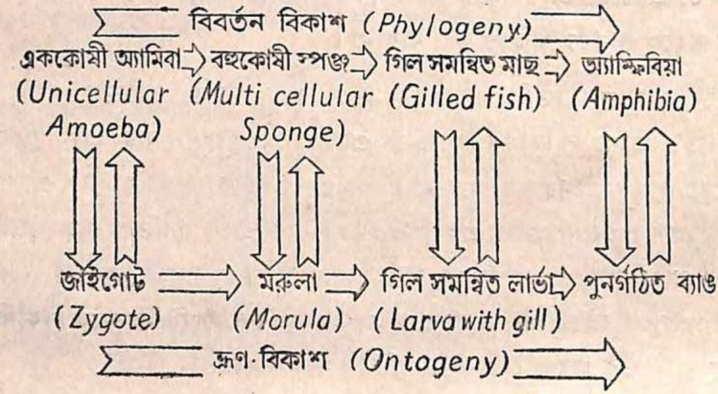
বিখ্যাত জার্মান বিজ্ঞানী **ভন বেয়ার** (Von Baer) বিভিন্ন মেরুদণ্ডী প্রাণীর ভ্রূণ লইয়া গবেষণা করেন। তিনি লক্ষ্য করেন যে প্রাথমিক অবস্থায় মেরুদণ্ডী প্রাণীদের ভ্রূণের মধ্যে এত অধিক পরিমাণে সাদৃশ্য থাকে যে তাহাদের মধ্যে সহজে পার্থক্য নিরূপণ করা যায় না।

উদাহরণস্বরূপ তিনি লক্ষ্য করেন যে মাছ, ব্যাঙ, সরীসৃপ, পাখী ও স্তন্যপায়ীর ভ্রূণের প্রাথমিক অবস্থায় প্রচুর সাদৃশ্য দেখা যায় এবং সহজে ইহাদের পার্থক্য নির্ণয় করা যায় না। অবশ্য পরবর্তীকালে ধীরে ধীরে প্রত্যেক শ্রেণীর প্রাণীর বৈশিষ্ট্যগুলি প্রকাশিত হয়। এইভাবে বিভিন্ন মেরুদণ্ডীদের ভ্রূণের প্রাথমিক দশা পর্যালোচনা করিলে ধারণা হয় যে সকল মেরুদণ্ডী প্রাণী একই পূর্বপুরুষ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে এবং পরবর্তীকালে বিভিন্নভাবে বিকশিত হইয়াছে। এই ধারণা জৈব অভিব্যক্তিকে সমর্থন করে।

বায়োজেনেটিক সূত্র (Biogenetic law) **:** বিজ্ঞানী **হেকেল** (Haeckel, 1834-1915) বিভিন্ন প্রাণীর জীবন-ইতিহাস এবং ভ্রূণের বিকাশ লক্ষ্য করিয়া সিদ্ধান্ত করেন যে—**সকল জীবের পরিস্ফুরণ দশা বা ভ্রূণদশা ঐ জীবের জাতির ক্রমবিকাশের পুনরাবৃত্তি করে।** অর্থাৎ "কোনো জীবের জীবন-ইতিহাস তাহার জাতির ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত পুনরাবৃত্তি মাত্র" (Ontogeny recapitulates phylogeny) ইহাকেই হেকেলের বায়ো-জেনেটিক তত্ত্ব বা রিক্যাপিচুলেশন তত্ত্ব (Recapitulation theory) বলা হয়। এই মতানুসারে প্রতিটি প্রাণীর উদ্ভব একটিমাত্র কোষ (যথা-জাইগোট) হইতে, যাহাকে এককোষী প্রাণী বা প্রোটোজোয়ার সহিত তুলনা করা যায়। পরিস্ফুরণকালে একটি ভ্রূণের মধ্যে যে দশাগুলি দেখা যায় সেই দশাগুলি ঐ প্রাণীর জাতির ইতিহাসেও লক্ষ্য করা যায়। উদাহরণস্বরূপ একটি ব্যাঙের জীবন-ইতিহাস (Life history) তাহার পূর্ব পুরুষের ইতিহাসকে পুনরাবৃত্তি করে।

ভন বেয়ার এবং হেকেল উভয়েই মেরুদণ্ডী প্রাণীর ভ্রূণের মধ্যে আশ্চর্য্যজনক সাদৃশ্য লক্ষ্য করিয়াই তাঁহাদের মত উপস্থাপিত করেন। প্রকৃতপক্ষে মৎস্য, উভচর, সরীসৃপ, পক্ষী এবং স্তন্যপায়ী শ্রেণীর সকল প্রাণীরই ভ্রূণে

ফুলকা-ছিদ্র (Gill slits) দেখা যায়। ইহাই তাঁহাদের ধারণাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে। ফুলকা ছিদ্র সাধারণতঃ জলচর মেরুদণ্ডী প্রাণীর ক্ষেত্রে (যথা-মৎস্য) দেখা যায়। স্থলচর মেরুদণ্ডী প্রাণীর ভ্রূণদশায় এইরূপ ফুলকা ছিদ্র দেখিয়া সহজেই ধারণা করা যাইতে পারে যে স্থলচর মেরুদণ্ডী প্রাণীর পূর্ব পুরুষও



চিত্র 9 : জীবের জাতির ইতিহাস (Phylogeny) ও জীবন ইতিহাস (Ontogeny)।

মাছের মত জলচর ছিল এবং ফুলকা ছিদ্রের সাহায্যে শ্বাসকার্য সম্পন্ন করিত। তাহা না হইলে স্থলচর প্রাণীর ভ্রূণে ফুলকা ছিদ্র দেখা যাইত না।

হেকেলের বায়োজেনেটিক তত্ত্বের অনুকূলে বিভিন্ন প্রমাণ আছে যথা—

(ক) বিভিন্ন মেরুদণ্ডী প্রাণীর প্রাথমিক ভ্রূণের মধ্যে সাদৃশ্য দেখা যায়।

(খ) সকল মেরুদণ্ডী প্রাণীর ভ্রূণের মধ্যে ফুলকা ছিদ্রের উপস্থিতি দেখা যায়।

(গ) মেরুদণ্ডী প্রাণীর নার্ভতন্ত্রটি এক্টোডার্ম হইতে উৎপন্ন হয়।

(ঘ) ব্যাঙের লার্ভা দশা বা ব্যাঙাচির সহিত মাছের সাদৃশ্য দেখা যায়।

(ঙ) মোলাস্কা এবং অ্যানিলিডা পর্বের প্রাণীদের জীবন ইতিহাস ট্রোকোফোর (Trochophore) লার্ভা দশার মধ্য দিয়া অতিবাহিত হয়।

(চ) প্রায় সকল একনালীদেহীর (Coelenterates) জীবন-চক্রে প্লানুলা লার্ভা (Planula larva) পাওয়া যায়।

সমালোচনা ঃ হেকেলের বায়োজেনেটিক তত্ত্বটি প্রকাশিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন বিজ্ঞানী উহাকে স্বাগত জানান। ওয়েসম্যান (Weisman)

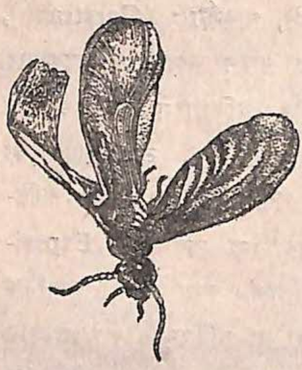
ম্যাকব্রাইড (Macbride), গ্রাহাম কার (Graham Kerr), অ্যাগাসিজ (Agassiz) প্রমুখ বিজ্ঞানীগণ অভিব্যক্তির অনুকূলে প্রকাশিত হেকেলের বায়োজেনেটিক তত্ত্বটিকে দৃঢ়ভাবে সমর্থন করেন। কিন্তু বর্তমানকালে বিভিন্ন ভ্রূণ তত্ত্ববিদ হেকেলের বায়োজেনেটিক তত্ত্বটিকে সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করেন না। হিজ (W. His), লিলি (F. R. Lillie), গারস্ট্র্যাং (Garstrang), নিড্‌হাম (Needham) প্রভৃতি ভ্রূণ তত্ত্ববিদেরা ধারণা করেন যে হেকেলের মতবাদটি অতি সরলীকৃত। কোনো জীবের জীবন ইতিহাসে তাহার জাতির অভিব্যক্তির ইতিহাস সম্পূর্ণভাবে লক্ষ্য করা যায় না। ভ্রূণগুলির মধ্যে আপাত-সাদৃশ্য এক ধরনের সমান্তরালবাদ (Parallelism) এবং অভিযোজনের ফলে সম্ভব হয়। আধুনিক প্রয়োগিক ভ্রূণবিদ্যা (Experimental Embryology) হেকেলের মতবাদকে সমর্থন করে না। আধুনিক বিজ্ঞানীদের মতে কোনো জীবের ভ্রূণের দশা বা পরিস্ফুরণ দশা তাহার জাতির পরিণত দশার পুনরাবৃত্তি করিতে পারে না, তবে জাতির ভ্রূণ দশার পুনরাবৃত্তি করিতে পারে। যাহা হউক ভ্রূণতত্ত্বীয় প্রমাণ হেকেলের বায়োজেনেটিক তত্ত্বকে সমর্থন না করিলেও জৈব অভিব্যক্তিকে অবশ্যই সমর্থন করে।

3. **জীবাশ্মঘটিত প্রমাণ** (Palaeontological evidences) :

প্রাকৃতিকভাবে সংরক্ষিত প্রাচীন উদ্ভিদ ও প্রাণীর দেহাবশেষকে জীবাশ্ম বা ফসিল বলে। জীবাশ্ম বা ফসিল জৈব অভিব্যক্তির সমর্থনে একটি উল্লেখযোগ্য প্রমাণ। জীবাশ্ম সম্বন্ধীয় পঠন পাঠনকে **প্যালিওণ্টোলজি** (Palaeontology) বলে। ডারউইন এই জীবাশ্মঘটিত প্রমাণকে জৈব অভিব্যক্তির অনুকূলে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য প্রমাণ বলিয়া অভিহিত করেন।

পৃথিবীর আদি শিলাস্তরে অতীতের বিভিন্ন জীবের যে প্রস্তরীভূত কঙ্কাল, জীবদেহের চিহ্ন এবং বিভিন্ন প্রকারের নিদর্শন পাওয়া যায় তাহাদের **জীবাশ্ম** বা **ফসিল** (*Fossil*) বলে। সাধারণতঃ জীবের মৃত্যুর পর বিভিন্ন বিয়োজক বা জীবাণুর আক্রমণে সেই মৃতদেহ পচিয়া যায় এবং তাহার উপাদানগুলি বিশ্লিষ্ট হইয়া পরিবেশে মিশিয়া যায়। প্রাণীদেহের কঠিনতম কঙ্কালও এইভাবে বিনষ্ট হইতে পারে। কিন্তু কখনো কখনো দেখা যায় বিভিন্ন প্রাকৃতিক কারণে এই সকল জীবদেহ ধীরে ধীরে প্রস্তরীভূত হইয়া যায় যাহার ফলে ঐ সকল জীব-

দেহের কোনও অংশ, জীবের ছাপ অথবা সমগ্র জীবদেহই প্রাকৃতিক ভাবে সংরক্ষিত হইয়া জীবাশ্মে পরিণত হয়। এই ভাবে বিভিন্ন ধরণের জীবাশ্ম পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে ও বিভিন্ন স্তরে ছড়াইয়া আছে।



চিত্র 10 : পতঙ্গের জীবাশ্ম।



চিত্র 11 : ট্রাইলোবাইটের জীবাশ্ম।

ভূত্বকে যে **পাললিক শিলা** বা **স্তরীভূত শিলা** (Sedimentary rock) স্তরে স্তরে সজ্জিত থাকে তাহার মধ্যেই অধিকাংশ জীবাশ্ম পাওয়া যায়। ভূতাত্ত্বিকগণ (Geologists) এই পাললিক শিলার বয়স বিভিন্ন উপায়ে বাহির করেন এবং এই পাললিক শিলার বয়স হইতে তাহার মধ্যে অবস্থিত জীবাশ্মের বয়সও নির্ণয় করা যায়। শিলাস্তরের বয়স জানিবার জন্য আজকাল তিনটি পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়—

(ক) ইউরেনিয়াম-লেড পদ্ধতি (Uranium-Lead method), (খ) পটা-সিয়াম—আর্গন পদ্ধতি (Potassium—Argon method) ও (গ) তেজস্ক্রিয় কার্বন পদ্ধতি (Radio-Carbon method)। অতি প্রাচীন শিলাস্তর বা জীবাশ্মের বয়স জানিবার জন্য ইউরেনিয়াম-লেড পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়। প্রাচীন প্রস্তর হইতে কি পরিমাণ তেজস্ক্রিয় ইউরেনিয়াম সীসায় পরিবর্তিত হইয়াছে তাহা হইতেই ঐ প্রস্তরের বয়স জানা সম্ভব। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে শতকরা 1 ভাগ তেজস্ক্রিয় ইউরেনিয়াম-এর সীসায় পরিবর্তিত হইতে প্রায় 66,000,000 বৎসর অতিবাহিত হয়। বর্তমানে **পটাসিয়াম** ও **আরগন** হইতে তাহাদের **আইসোটোপের** পরিমাণ নির্ধারণ করিয়া প্রাচীন শিলাস্তরের বয়স পরিমাপ করা হয়। প্রায় সকল শিলাস্তরেই পটাসিয়াম

থাকে এবং এই উপায়ে প্রায় 300 কোটি বৎসর পূর্বের শিলাস্তরের বয়স নির্ধারণ করা যায়। অবশ্য অপেক্ষাকৃত নবীন শিলাস্তরের বয়স তেজস্ক্রিয় কার্বন (Radioactive Carbon—C^{14}) পদ্ধতিতে পরিমাপ করা হয়। এই পদ্ধতিটি যে সকল শিলাস্তরে তেজস্ক্রিয় কার্বন থাকে তাহার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। সাধারণতঃ কার্বন-পদ্ধতিতে 70,000 বৎসর পর্যন্ত বয়স পরিমাপ করা যায়। দেখা গিয়াছে তেজস্ক্রিয় কার্বনের 50% তেজস্ক্রিয়তা হারাইয়া প্রায় 5,760 বৎসরে সাধারণ কার্বনে পরিণত হয়।

বিভিন্ন শিলাস্তরে যে জীবাশ্মগুলি (Fossils) পাওয়া যায় সেগুলি লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে অপেক্ষাকৃত প্রাচীন শিলাস্তরে সরল জীবের জীবাশ্ম দেখিতে পাওয়া যায়। ধীরে ধীরে শিলাস্তরের উপরের দিকে ক্রমশ জটিল গঠনের জীবাশ্ম দেখা যায়। অতএব বিভিন্ন জীবাশ্ম পর্যবেক্ষণ করিলে পৃথিবীর উপর বিভিন্ন জীবের ক্রমবিকাশ সুস্পষ্ট ভাবে লক্ষ্য করা যায়। শিলাস্তর ও জীবাশ্মের বয়স নির্ণয় করিয়া তাহাদের পর্যবেক্ষণ করিলে যে চিত্রটি পাওয়া যায় তাহাই জৈব অভিব্যক্তির চিত্র। সেইজন্য জীবাশ্ম ঘটিত প্রমাণকে জৈব অভিব্যক্তির প্রত্যক্ষ প্রমাণ বলিয়া মনে করা হয়।

প্রাচীন শিলাস্তর এবং জীবাশ্মের বয়স নির্ণয় করিয়া ভূত্বককে বিভিন্ন ভাবে বিভক্ত করা হইয়াছে যথা—**ইরা** (Eras), **পিরিয়ড (Period)**, **ইপোক** (Epoch) প্রভৃতি। এই সকল বিভিন্ন শিলাস্তরে ঘোড়া, হাতী, উট প্রভৃতি প্রাণীর যে জীবাশ্মগুলি পাওয়া গিয়াছে তাহা হইতে ঐ সকল প্রাণীর ক্রমবিকাশ লক্ষ্য করা যায়।

নীচে ভূত্বকের বিভিন্ন স্তরের বয়স এবং সেই সময়ের প্রধান উদ্ভিদ ও প্রাণীর নাম উল্লেখ করা হইল।

ভূতাত্ত্বিক সময় সারণী (সংক্ষিপ্ত রূপ)

ইরা বা যুগ (এবং সময়কাল)	পিরিয়ড বা কাল	কত বৎসর পূর্বে	প্রাণী এবং উদ্ভিদের ক্রমবিকাশ
সিনোজয়িক (স্তন্যপায়ীর যুগ) স্থায়িত্বকাল	কোয়াটারনারী	দশ লক্ষ বৎসর	স্তন্যপায়ীর বর্তমান প্রজাতি বিশাল স্তন্যপায়ীর বিলুপ্তি এবং মানুষ জাতির বিকাশ।
প্রায় 7 কোটি বৎসর	টারশিয়ারী	7 কোটি	পাখী এবং প্লাসেন্টাযুক্ত স্তন্যপায়ীর বিকাশ।

ইরা বা যুগ (এবং সময়কাল)	পিরিয়ড বা কাল	কত বৎসর পূর্বে	প্রাণী এবং উদ্ভিদের ক্রমবিকাশ
মেসোজয়িক (সরীসৃপের যুগ) স্থায়িত্বকাল : প্রায় 12 কোটি বৎসর	ক্রিটাসিয়াস	12 কোটি	সপুষ্পক উদ্ভিদের প্রাধান্য ; অতিকায় সরীসৃপের বিলুপ্তি।
	জুরাসিক	15·5 কোটি	সরীসৃপের প্রাধান্য, পাখী ও স্তন্যপায়ীর আবির্ভাব।
	ট্রায়াসিক	19 কোটি	প্রথম ডাইনোসর, কচ্ছপ, ইকথিওসর ও প্লিসিওসর ; সাইকাস ও পাইন জাতীয় উদ্ভিদ।
প্যালিওজয়িক স্থায়িত্বকাল : প্রায় 36 কোটি বৎসর	পারমিয়ান	21·5 কোটি	সরীসৃপের বিকাশ ও উভচরের সংখ্যা হ্রাস ; পৃথিবী ব্যাপী হিমবাহ।
	কার্বনিফেরাস	30 কোটি	ফার্ণজাতীয় উদ্ভিদের প্রাধান্য ; হাঙর এবং ক্রিনয়েডের প্রাচুর্য; উভচরের বিকাশ ; প্রথম সরীসৃপের আবির্ভাব।
	ডিভোনিয়ান	35 কোটি	মৎস্য যুগ (প্রধানতঃ মিঠা-জলে) প্রথম বৃক্ষ ও উভচরের আবির্ভাব।
	সিলুরিয়ান	39 কোটি	স্থলভাগে উদ্ভিদ ও সন্ধিপদী প্রাণীর বিকাশ; প্রাচীন চোয়াল-হীন মেরুদণ্ডীর আবির্ভাব।
	ওরডোভিসিয়ান	48 কোটি	মেরুদণ্ডী প্রাণীর উদ্ভব, সন্ধিপদ (আর্থ্রোপড), ব্রাকিওপড ও সেফালোপডের প্রাধান্য।
	ক্যামব্রিয়ান	55 কোটি	অমেরুদণ্ডী প্রাণীর উদ্ভব এবং বিকাশ ; ট্রাইলোবাইট ও ব্রাকিওপডের প্রাধান্য ; বিভিন্ন প্রকারের শৈবাল।
প্রোটেরোজয়িক		100 কোটি	অমেরুদণ্ডী প্রাণীর আবির্ভাব ও বিকাশ, শৈবালের আবির্ভাব।
আরকিওজয়িক		200-250 কোটি	এককোষী উদ্ভিদ ও প্রাণীর আবির্ভাব ও ক্রমবিকাশ।

উপরের ভূতাত্ত্বিক সময় সারণীটি পর্যবেক্ষণ করিলে উদ্ভিদ ও প্রাণীর জৈব অভিব্যক্তি বা ক্রমবিকাশ সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট ধারণা হয়। অবশ্য জীবের আবির্ভাবের প্রথম দিককার জীবাশ্ম এখনও পাওয়া যায় নাই ; সেইজন্য জীবনের আবির্ভাব সম্পর্কে বিভিন্ন জীববিজ্ঞানীর বিভিন্ন মত দেখা যায়, তবে জীবনেব আবির্ভাব সম্পর্কে মতভেদ থাকিলেও জৈব অভিব্যক্তি সম্পর্কে এখন কোনো বিজ্ঞানীরই মতভেদ নাই। এইভাবে দেখা যায় যে জীবাশ্ম ঘটিত প্রমাণ জৈব অভিব্যক্তির একটি প্রত্যক্ষ প্রমাণ। সম্ভবতঃ সেইজন্য চার্লস ডারউইন জীবাশ্মকে 'পৃথিবীর উপর জীবনের ইতিহাস' রূপে গণ্য করেন।

4. শারীরবৃত্তীয় প্রমাণ (Physiological evidences) :

বিভিন্ন প্রাণীর শারীরবৃত্তীয় কার্য তুলনা করিলে তাহাদের মধ্যে বিশেষ সাদৃশ্য দেখা যায়। অধিকাংশ জীবেরই দেহ **কোষ (Cell)** দ্বারা গঠিত— **কোষের** গঠন এবং কার্য বিভিন্ন জীবে একই ধরণের। ইহা হইতে ধারণা করা যায় যে প্রথম জীবের সৃষ্টি সরল আদি কোষ রূপেই সম্পন্ন হইয়াছিল।

বিভিন্ন জীবের বংশগতির ধারক ও বাহক ক্রোমোজোম এবং জিনের গঠন এবং কার্যেও সাদৃশ্য দেখা যায়। **ডি. এন. এ (DNA)** অণুর গঠন, কার্য এবং বিভাজন পদ্ধতি বিভিন্ন জীবে একই প্রকার। এই ডি. এন. এ কে বংশগতির ধারক ও বাহক বলা হয়। আবার বিভিন্ন জীবের পাচনতন্ত্রে যে সকল উৎসেচক বা **এনজাইম (Enzymes)** ক্রিয়া করে তাহাদের মধ্যে বিশেষ সাদৃশ্য দেখা যায়। প্রোটিওলাইটিক (Proteolytic), লাইপোলাইটিক (Lipolytic), অ্যামাইলেজ (Amylase) প্রভৃতি এনজাইমসমূহ এককোষী প্রাণী অ্যামিবা হইতে স্তন্যপায়ী প্রাণী মানুষ পর্যন্ত সকলের দেহেই একই ধরনের কার্য সম্পন্ন করে। ইহা জৈব অভিব্যক্তিকে সমর্থন করে। অপরদিকে মেরুদণ্ডী প্রাণীর বিভিন্ন **হরমোন (Hormones)**-এর উৎস এবং কার্যেও সাদৃশ্য দেখা যায়। মেরুদণ্ডী প্রাণীর দেহে থাইরয়েড গ্রন্থি হইতে যে হরমোন নিঃসৃত হয় তাহার কার্যপ্রণালী বিভিন্ন প্রাণীতে প্রায় একই প্রকারের। সেইজন্য মানুষের থাইরয়েড গ্রন্থির অপ্রতুলতা বানর বা অন্য স্তন্যপায়ীর থাইরয়েড গ্রন্থির সাহায্যে দূর করা যায়।

সিরাম সম্বন্ধীয় প্রমাণ (Serological evidence) শারীরবৃত্তীয় প্রমাণের মধ্যে রক্তের সিরাম-সম্বন্ধীয় প্রমাণ (Serological evidence) উল্লেখযোগ্য।

বিভিন্ন মেরুদণ্ডী প্রাণীর রক্তের **সিরাম** (Serum) পর্যালোচনা করাকে **সেরোলজি** (Serology) বলে—ইহার সাহায্যেও জৈব অভিব্যক্তির যথার্থতা প্রমাণ করা যায়।

যদি অল্প পরিমাণ মানুষের সিরাম (কোষব্যতীত রক্তের তরল অংশ) লইয়া একটি খরগোসের দেহে প্রবেশ করানো হয় তাহা হইলে ঐ খরগোসের রক্তে অ্যান্টিবডি (Antibody) সৃষ্টি হয়। এই ধরণের রক্তকে মানুষের সিরামের **অ্যান্টিসিরাম** (Antiserum) বলে। এইবার এই অ্যান্টিসিরামের কিছু অংশ টেষ্টটিউবে লইয়া যদি মানুষের সিরাম, শিম্পাঞ্জীর সিরাম, বানরের সিরাম এবং কুকুরের সিরামের সহিত মিশ্রিত করা হয়, তাহা হইলে দেখা যাইবে যে—

(ক) মানুষের সিরাম এবং শিম্পাঞ্জীর সিরামের সহিত অ্যান্টিসিরামের বিক্রিয়ায় অধিক অধঃক্ষেপ পড়ে।

(খ) বানরের সিরামের সহিত অ্যান্টিসিরামের বিক্রিয়ায় অল্প অধঃক্ষেপ পড়ে।

(গ) কুকুরের সিরামের সহিত অ্যান্টিসিরামের প্রক্রিয়ায় প্রায় কিছুই অধঃক্ষেপ পড়ে না।

অতএব সিরাম সম্বন্ধীয় পরীক্ষায় অধঃক্ষেপ যত বেশী পড়িবে, আত্মীয়তা ততই বেশী হইবে।

ইহা হইতে প্রমাণিত হয় যে মানুষ এবং শিম্পাঞ্জীর সিরামে যে সাদৃশ্য আছে, মানুষ এবং বানরের সিরামে তাহার অপেক্ষা কম সাদৃশ্য থাকে আবার মানুষ এবং কুকুরের সিরামে সাদৃশ্য অত্যন্ত কম। সিরামের তুলনামূলক বিচার বিবর্তনের সত্যতা প্রমাণ করে। বর্তমানে স্তন্যপায়ীর শ্রেণীবিন্যাসের ক্ষেত্রে সিরামের সম্পর্ককে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়।

5. **ভৌগোলিক বিস্তার হইতে প্রমাণ** (Geographical evidence) :

প্রত্যেক দেশের উদ্ভিদ এবং প্রাণীদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে একই প্রকারের উদ্ভিদ ও প্রাণী নিকটবর্তী অঞ্চলে দেখা যায়। প্রধানতঃ সেই অঞ্চলের জলবায়ুর জন্য ঐ অঞ্চলের উদ্ভিদ ও প্রাণী একই প্রকারের হয়। তবে বহু ক্ষেত্রে একই প্রকারের প্রাণী বহু দূরবর্তী অঞ্চলে বাস করিতে দেখা যায়। উদাহরণস্বরূপ সিংহ, হাতী ও গণ্ডার

প্রভৃতি প্রাণী ভারত এবং আফ্রিকা—এই দুই দেশেই পাওয়া যায়। অনুরূপভাবে লামা এবং আলপাকা নামক দুইটি উট জাতীয় প্রাণী দক্ষিণ আমেরিকায় দেখা যায় কিন্তু উট কেবল আরব ও মধ্য এশিয়ায় দেখা যায়। অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশে প্লাটিপাস (Platypus), একিডনা (Echidna) নামক অণ্ডজ স্তন্যপায়ী এবং ক্যাঙারু (Kangaroo) পাওয়া যায়, অন্য কোথাও পাওয়া যায় না। বিভিন্ন প্রাণীর এই প্রকারের বিসদৃশ ভৌগোলিক বিস্তারকে **বিচ্ছিন্ন বিস্তার** (Discontinuous distribution) বলা হয়। প্রাণীদের ভৌগোলিক বিস্তার পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে উহা সম্পূর্ণভাবে জলবায়ুর উপর নির্ভরশীল নহে। বহু ক্ষেত্রে দুইটি দেশের জলবায়ু এক প্রকার হইলেও তাহাদের প্রাণী এক প্রকার হয় না। উদাহরণস্বরূপ গ্রেটব্রিটেন এবং নিউজিল্যাণ্ডের জলবায়ু একপ্রকার হইলেও এই দুইটি অঞ্চলের প্রাণীর মধ্যে কোন সাদৃশ্য নাই।

এইরূপ বিচ্ছিন্ন এবং বিসদৃশ ভৌগোলিক বিস্তার একমাত্র জৈব অভিব্যক্তির সাহায্যে ব্যাখ্যা করা সম্ভব। বিজ্ঞানীরা বলেন যে, কোন একটি নির্দিষ্ট জীব সর্বপ্রথম একটি স্থানে আবির্ভূত হয়। আহার, বাসস্থান ও বংশবৃদ্ধির জন্য ঐ জীব ও তাহার সন্তান সন্ততি ধীরে ধীরে এক অঞ্চল হইতে অন্য অঞ্চলে এবং এক দেশ হইতে অন্যদেশে ছড়াইয়া পড়ে। এইভাবে নূতন নূতন পরিবেশে আসিবার ফলে তাহাদের মধ্যে নূতন নূতন বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। এই বৈশিষ্ট্যগুলি তাহাদের পূর্বপুরুষ হইতে ক্রমশ ভিন্ন হয় এবং পরবর্তী বংশে সঞ্চারিত হয়। এইভাবে নুতন প্রজাতির সৃষ্টি হয়। যে সকল প্রাণী কোনো পরিবেশের সহিত সামঞ্জস্যবিধান করিতে পারেনা তাহারা ক্রমে অবলুপ্ত (Extinct) হইয়া যায়।

ঘোড়া, হাতী এবং উটের আবির্ভাব ও অভিব্যক্তি প্রাণীর ভৌগোলিক বিস্তারের এই ব্যাখ্যাকে সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করে। আবার কোনো দ্বীপপুঞ্জে গেলে সেই অঞ্চলের জীবের সহিত মূল ভূখণ্ডের জীবের যথেষ্ট সাদৃশ্য থাকিলেও বহুক্ষেত্রে বৈসাদৃশ্য দেখা যায়। আমেরিকার নিকটবর্তী গ্যালাপাগো দ্বীপপুঞ্জে (Galapagos islands) যে সকল প্রাণী আছে তাহাদের সহিত মূল ভূখণ্ডের প্রাণীর যথেষ্ট বৈসাদৃশ্য দেখা যায়। চার্লস ডারউইন প্রমুখ জীব-বিজ্ঞানীদের মতে এই প্রাণীগুলির পূর্বপুরুষ মূল ভূখণ্ড হইতে বিস্তারলাভ করিয়া দ্বীপপুঞ্জে আসিয়াছিল এবং বিচ্ছিন্নরূপে (Isolated) বাস করিতে করিতে ক্রমশ পরিবর্তিত হইয়া নূতন সগোত্রীয় প্রজাতির সৃষ্টি করে।

জলাশয়, পর্বত ও মরুভূমি অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রাণীর ভৌগোলিক বিস্তারে বাধা (Barrier) সৃষ্টি করে। এইরূপ বাধা থাকিবার ফলে এক অঞ্চলের প্রাণী সহজে অন্য অঞ্চলে যাইতে পারে না। সম্ভবতঃ একই কারণে ভারত ও চীনদেশের বন্য প্রাণীর মধ্যে প্রচুর পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়।

শ্রেণীবিন্যাস সম্বন্ধীয় প্রমাণ (Taxonomical evidences) :

পৃথিবীতে জীবিত উদ্ভিদ এবং প্রাণীর সংখ্যা অগণিত। এখনও পর্যন্ত কয়েক লক্ষ প্রজাতির উদ্ভিদ ও প্রাণী আবিষ্কৃত হইয়াছে, ইহা ব্যতীত লুপ্ত জীবাশ্মের সংখ্যাও প্রচুর। বিশৃঙ্খলভাবে এই সকল জীবের বিষয় সঠিকভাবে জ্ঞানলাভ করা সম্ভব নয়। সেইজন্য উদ্ভিদ ও প্রাণীকে শ্রেণীবিভাগ করা হয় যাহার প্রধান উদ্দেশ্য বিশৃঙ্খলার মধ্যে শৃঙ্খলা স্থাপন করা।

শ্রেণীবিন্যাস পদ্ধতির মাধ্যমে সাদৃশ্য এবং বৈসাদৃশ্যের ভিত্তিতে বিভিন্ন উদ্ভিদ এবং প্রাণীর শ্রেণীবিভাগ করা হয়, তাহাদের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয় করা হয় এবং প্রত্যেকটি জীবের বৈজ্ঞানিক নামকরণ করা হয়। আধুনিক শ্রেণীবিন্যাস পদ্ধতিতে অভিব্যক্তির ধারা অনুযায়ী জীবজগতের শ্রেণীবিভাগ করা হয় এবং প্রতিটি জীবকে যথাযোগ্য স্থান দেওয়া হয়। ইহাকে **জাতিজনিগত** বা **ফাইলোজেনেটিক শ্রেণীবিভাগ** (Phylogenetic Classification) বলে। এই পদ্ধতির শ্রেণীবিভাগ পর্যালোচনা করিলে সহজেই জৈব অভিব্যক্তি সম্বন্ধে একটি সুস্পষ্ট ধারণা করা যায়।

প্রাণিজগতের শ্রেণীবিভাগ (Classification of the Animal Kingdom) : পৃথিবীর সকল প্রকারের প্রাণী লইয়া গঠিত হইয়াছে প্রাণিজগত। এই প্রাণিজগতকে কয়েকটি প্রধান বিভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। এই প্রধান বিভাগগুলিকে পর্ব বলা হয়। প্রাণিজগতে বহু পর্ব আছে কিন্তু তাহাদের মধ্যে নিম্নলিখিত গুলি প্রধান।

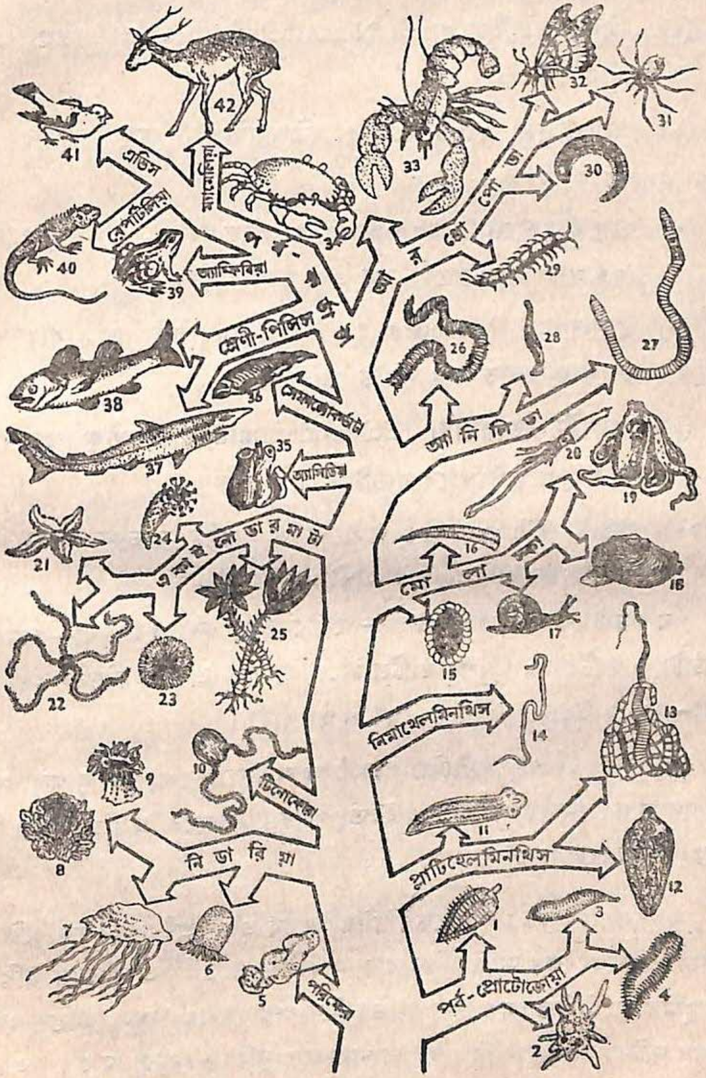
(১) **প্রোটোজোয়া** (Protozoa) এককোষী ও আণুবীক্ষণিক প্রাণী।

(২) **পরিফেরা** (Porifera) : ছিদ্রাল এবং অচল স্পঞ্জ জাতীয় প্রাণী।

* (৩) **সিলেনটেরাটা** (Coelenterata) : একনালীদেহী, দ্বিস্তর কোষ-বিশিষ্ট প্রাণী।

---

* বর্তমানে ইহাকে দুইটি পৃথক পর্বে বিভক্ত করা হইয়াছে। যথা—পর্ব নিডারিয়া (**Cnidaria**) ও পর্ব টিনোফোরা **Ctenophora**)।



চিত্র 12 : প্রাণীর ক্রমবিকাশের রূপরেখা।

(৪) **প্লাটিহেলমিনথেস** (Platyhelminthes)**:** ত্রিস্তরবিশিষ্ট চ্যাপ্টা কৃমি।

(৫) **নিমাটহেলমিনথেস** (Nemathelminthes) **:** ত্রিস্তরবিশিষ্ট গোলকৃমি।

(৬) **অ্যানেলিডা** (Annelida)**:** ত্রিস্তরবিশিষ্ট, দেহ অঙ্গুরীর মত খণ্ডকে বিভক্ত।

(৭) **আর্থ্রোপোডা** (Arthropoda)**:** ত্রিস্তরবিশিষ্ট, সন্ধিপদী প্রাণী। দেহ সাধারণতঃ মস্তক, বক্ষ এবং উদরে বিভক্ত ;

(৮) **মোলাস্কা** (Mollusca)**:** কোমল অখণ্ডিত দেহ, সাধারণতঃ খোলকে আবৃত এবং অঙ্কীয় পদবিশিষ্ট।

(৯) **একাইনোডারমাটা** (Echinodermata)**:** কণ্টক ত্বকবিশিষ্ট এবং দেহ অরীয়ভাবে পাঁচটি ভাগে বিভক্ত।

(১০) **কর্ডাটা** (Chordata)**:** নোটোকর্ড, পৃষ্ঠীয় নার্ভকর্ড এবং গলবিলীয় ফুলকাছিদ্রবিশিষ্ট প্রাণী।

পর্ব কর্ডাটাকে পুনরায় দুইটি উপ-পর্বে বিভক্ত করা হয় যথা—প্রোটোকর্ডাটা ও ভার্টিব্রাটা, উপপর্ব ভার্টিব্রাটাকে কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয় যথা—মৎস্য, উভচর, সরীসৃপ, পক্ষী ও স্তন্যপায়ী।

প্রাণিজগতের এই শ্রেণীবিন্যাসকে জৈব অভিব্যক্তির ধারায় বৃক্ষের শাখা প্রশাখারূপে পুনর্বিন্যাস করা যাইতে পারে। ইহাকে জাতিজনিগত বৃক্ষ (Phylogenetic tree) বলা হয়।

অনুরূপভাবে কর্ডাটা পর্বকে বিভিন্ন উপপর্ব এবং শ্রেণীতে বিভক্ত করিলেও তাহাদের মধ্যে জৈব অভিব্যক্তির ধারা লক্ষ্য করা যায়। একইভাবে উদ্ভিদের আধুনিক শ্রেণীবিন্যাসেও জৈব অভিব্যক্তির ধারা অর্থাৎ 'সরল উদ্ভিদ হইতে ক্রমশ জটিল জীবের ক্রমবিকাশ' সুস্পষ্টভাবে বুঝিতে পারা যায়। অতএব পৃথিবীর উপর জীবের ক্রমবিকাশ বা জৈব অভিব্যক্তি যে একটি নিশ্চিত ঘটনা সে সম্পর্কে প্রায় সকলেই একমত।

সারাংশ

জৈব অভিব্যক্তির অনুকূলে বিভিন্ন প্রমাণ এই প্রকৃতিতেই ছড়াইয়া আছে। সামগ্রিকভাবে এই প্রমাণগুলি জৈব অভিব্যক্তিকে নিশ্চিত ঘটনারূপে প্রতিষ্ঠিত করে।

১। **অঙ্গ সংস্থানগত প্রমাণ:** উদ্ভিদ ও প্রাণীর বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ গঠন পর্যালোচনা করিলে সহজেই অভিব্যক্তির ধারাটি বুঝিতে পারা যায়।

(ক) **তুলনামূলক অঙ্গসংস্থান:** বিভিন্ন মেরুদণ্ডী প্রাণীর তুলনামূলক অঙ্গসংস্থান (যথা—হৃৎপিণ্ড, মহাধমনী, মস্তিষ্ক প্রভৃতি) পরীক্ষা করিলে বিভিন্ন অঙ্গের গঠনে বিশেষ সাদৃশ্য এবং ক্রমবিকাশের ধারা লক্ষ্য করা যায়।

(খ) **সমসংস্থ অঙ্গ:** যে সকল অঙ্গের পরিস্ফুরণ পদ্ধতি বা উৎপত্তি একই প্রকার তাহাদের সমসংস্থ অঙ্গ বলে, যথা—বাদুড়ের ডানা, ঘোড়ার অগ্রপদ, মানুষের হাত, ব্যাঙের অগ্রপদ প্রভৃতি। বিভিন্ন পরিবেশে অভিযোজিত হইবার জন্য ইহাদের বাহ্যগঠনে পরিবর্তন দেখা যায়।

(গ) **নিষ্ক্রিয় অঙ্গ:** আমাদের দেহে বিভিন্ন প্রকারের নিষ্ক্রিয় অঙ্গ আছে যথা—কানের পেশী, উপপল্লব, পুচ্ছাস্থি, অ্যাপেনডিক্স প্রভৃতি। এই সকল লুপ্তপ্রায় অঙ্গের উপস্থিতি ইহাই প্রমাণ করে যে আমাদের পূর্বপুরুষের মধ্যে ইহারা সুগঠিত ও কার্যকরী ছিল। পরিবেশের :পরিবর্তনে উহারা ব্যবহৃত না হইয়া নিষ্ক্রিয় অঙ্গে পরিণত হইয়াছে।

(ঘ) **সংযোগকারী প্রাণী:** জীবজগতে এমন কয়েকটি জীব দেখা যায় যাহারা কোনো বিশেষ পর্বে অন্তর্ভুক্ত নহে। ইহারা দুইটি জীব-গোষ্ঠীর মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করে। ইহাদের সংযোগকারী জীব বা অন্তর্বর্তী জীব বলে, যথা—লাংফিশ, প্লাটিপাস প্রভৃতি। ইহাদের লক্ষ্য করিলে বুঝিতে পারা যায় যে একটি পর্বের জীব তাহার পূর্ববর্তী পর্বের জীব হইতে সৃষ্ট হইয়াছে।

২। **ভ্রূণ তত্ত্বগত প্রমাণঃ** বিভিন্ন মেরুদণ্ডী প্রাণীর ভ্রূণের প্রাথমিক অবস্থাগুলির মধ্যে এত সাদৃশ্য দেখা যায় যে উহাদের সহজে পৃথক করা যায় না। ভন বেয়ার এই সাদৃশ্যকে জৈব অভিব্যক্তির অনুকূলে অন্যতম প্রমাণ হিসাবে উল্লেখ করেন। বিজ্ঞানী হেকেল-এর মতে জীবের জীবন ইতিহাস বা জীবজনি তাহার জাতির ইতিহাস বা জাতিজনিকে সংক্ষিপ্তভাবে পুনরাবৃত্তি করে। অবশ্য বর্তমানে প্রয়োগিক ভ্রূণবিদ্যা হেকেলের মতবাদকে সমর্থন করে না।

৩। **জীবাশ্মঘটিত প্রমাণঃ** প্রাকৃতিকভাবে সংরক্ষিত প্রাচীন জীবের দেহাবশেষকে জীবাশ্ম বলে। সাধারণতঃ এই সকল জীবদেহ বা তাহার ছাপ প্রস্তরীভূত হইয়া প্রাচীন পাললিক শিলাস্তরের মধ্যে অবস্থান করে। বিভিন্ন উপায়ে শিলাস্তর ও জীবাশ্মের বয়স নির্ণয় করিয়া পৃথিবীতে জীবের ক্রমবিকাশের একটি সুস্পষ্ট ধারা লক্ষ্য করা যায়। সেইজন্য জীবাশ্মঘটিত প্রমাণই জৈব অভিব্যক্তির অনুকূলে সর্বাপেক্ষা বড় প্রমাণ।

৪। **শারীরবৃত্তীয় প্রমাণঃ** বিভিন্ন জীবের কোষীয় সংগঠন ও তাহাদের শারীরবৃত্তীয় কার্য লক্ষ্য করিলে উহাদের কার্যের মধ্যে প্রচুর সাদৃশ্য দেখা যায়। বিভিন্ন প্রাণীর দেহে উৎপন্ন উৎসেচক, হরমোন, রক্ত প্রভৃতির মধ্যেও সাদৃশ্য দেখা যায়। স্তন্যপায়ী প্রাণীদের রক্তের সিরাম লইয়া পরীক্ষা করিলে তাহাদের নিজেদের মধ্যে আত্মীয়তা বা সম্পর্ক লক্ষ্য করা যায়। বর্তমানে ইহা প্রাণীর শ্রেণীবিন্যাসের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়।

৫। **ভৌগোলিক বিস্তারঃ** প্রত্যেকটি দেশেরই কয়েকটি নিজস্ব প্রাণী থাকে আবার একই প্রকারের প্রাণী বহুদূরে বিস্তৃত থাকিতে দেখা যায়। প্রাণীর ভৌগোলিক বিস্তার এবং উহাদের পূর্বপুরুষের জীবাশ্ম লক্ষ্য করিলে ক্রমবিকাশের ধারাটি সহজেই বুঝিতে পারা যায়।

৬। **শ্রেণীবিন্যাসঃ** পৃথিবীতে অগণিত উদ্ভিদ ও প্রাণী বাস করে। শ্রেণীবিন্যাস না করিয়া ইহাদের সম্বন্ধে পঠন পাঠন সম্ভব নয়। বর্তমানে অধিকাংশ বিজ্ঞানীই এরূপভাবে শ্রেণীবিন্যাস করেন

যাহাতে সরল হইতে জটিল জীবের উৎপত্তি অর্থাৎ জৈব অভিব্যক্তির রূপটি শ্রেণীবিন্যাসের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়।

অনুশীলনী

1. জৈব অভিব্যক্তির অনুকূলে প্রধান প্রমাণগুলি উল্লেখ কর।
2. প্রাণীর তুলনামূলক অঙ্গসংস্থান কিভাবে জৈব অভিব্যক্তিকে সমর্থন করে?
3. সমসংস্থ ও সমবৃত্তীয় অঙ্গ কাহাকে বলে?
4. নিক্রিয় অঙ্গ কি? মানুষের দেহে অবস্থিত কয়েকটি নিক্রিয় অঙ্গের নাম উল্লেখ কর। কিভাবে ইহারা জৈব অভিব্যক্তিকে সমর্থন করে?
5. সংযোগকারী প্রাণী ও জীবন্ত জীবাশ্ম কাহাকে বলে?
6. জৈব অভিব্যক্তির অনুকূলে ভ্রূণতত্ত্বীর প্রমাণ সংক্ষেপে বর্ণনা কর।
7. হেকেলের বায়োজেনেটিক সূত্রটি কি? এই সূত্রটির অনুকূলে এবং বিরুদ্ধে কি কি প্রমাণ দেখা যায়?
8. জীবাশ্ম কি? জৈব অভিব্যক্তিকে ইহা কিভাবে সমর্থন করে?
9. ভূতাত্ত্বিক সময় সারণী কি? ইহা সংক্ষিপ্তভাবে উল্লেখ কর।
10. জৈব অভিব্যক্তির অনুকূলে রক্তের সিরাম সম্বন্ধীয় পরীক্ষাটি ব্যাখ্যা কর।
11. প্রাণীর ভৌগোলিক বিস্তার কিভাবে জৈব অভিব্যক্তিকে সমর্থন করে?
12. জৈব অভিব্যক্তির অনুকূলে শ্রেণীবিন্যাস সম্বন্ধীয় প্রমাণটি উল্লেখ কর ও প্রাণিজগতের প্রধান পর্বগুলির নাম উল্লেখ কর।

গ্রন্থপঞ্জী ও নির্দেশিকা (References)

Darwin, C. 1959. The Origin of species by Natural Selection. Modern Library series, New York.

Lull, R. S. 1947. Organic Evolution rev, ed. The Macmillan C. New York

Guyer, M. F. 1948. Animal Biology 4th. ed. Harper and Brothers, New York.

Moody P. A. 1964. Introduction to Evolution 2nd. ed. Harper & Brothers, New York.

Mukherjee D. 1972. Text Book of Zoology. New Book Stall, Calcutta.

de Beer, G. R. 1958. Embryos and Ancestors, 3rd. ed. Oxford University Press.

Darlington P. J. 1957. Zoogeography. John Wiley & Sons, New York.

মুখোপাধ্যায়, মেদ্দা মেদ্দা, মুখোপাধ্যায় 1980—জীববিজ্ঞান, নিউ বুক স্টল কলিকাতা।

চতুর্থ অধ্যায়

জৈব অভিব্যক্তির ইতিহাস (The History of Organic Evolution)

জৈব অভিব্যক্তির প্রমাণ সমূহ পর্যালোচনা করিলে সহজেই ধারণা করা যায় যে আদি সরল প্রকৃতির জীব হইতেই বর্তমান জটিল জীবের সৃষ্টি হইয়াছে। উনবিংশ শতাব্দী হইতে জৈব অভিব্যক্তি বা ক্রমবিকাশের রূপটি সকলের নিকট সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে কিন্তু প্রাচীনকাল হইতেই বিভিন্ন দার্শনিক এবং বিজ্ঞানীর মধ্যে জীবের ক্রমবিকাশের ধারণা ছিল। তবে এই ক্রমবিকাশের ধারণা যুগ যুগ ধরিয়া বিভিন্ন দার্শনিক এবং বিজ্ঞানীর সাহায্যে পুষ্ট হইয়া বর্তমান রূপটি ধারণ করিয়াছে। নীচে প্রাচীনকাল হইতে বর্তমানকাল পর্যন্ত জীবের ক্রমবিকাশের ধারাবাহিক ইতিহাসটি সংক্ষেপে উল্লেখ করা হইল।

জৈব অভিব্যক্তি সম্পর্কে বিভিন্ন ধারণা প্রাচীনকাল হইতেই প্রচলিত আছে। প্রাচীন যুগের বিভিন্ন ধর্মপুস্তক, পৌরাণিক কাহিনী, লোকমুখে এবং বিভিন্ন বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থাদির মাধ্যমে আমরা এই সকল মতবাদ সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করিতে পারি। এই সকল মতবাদকে আমরা তিনটি বিভাগে বিভক্ত করিতে পারি—

(ক) **প্রাচীন মতবাদ (Early Theories)**: ইহার মধ্যে বাইবেলে বর্ণিত বিশেষসৃষ্টিবাদ, বিভিন্ন গ্রীক দার্শনিক ও বিজ্ঞানীদের মতবাদ, হিন্দু পৌরাণিক কাহিনী বর্ণিত মতবাদ প্রভৃতি অন্তর্গত।

(খ) **পূর্ব-আধুনিক মতবাদ (Pre-modern Theories)**: ষষ্ঠদশ শতাব্দীতে ফ্রান্সিস বেকন হইতে অষ্টাদশ শতাব্দীর ইরাসমাস ডারউইন পর্যন্ত বিজ্ঞানীদের মতবাদ ইহার অন্তর্গত।

(গ) **আধুনিক মতবাদ (Modern Theories)**: উনবিংশ শতাব্দীতে বিভিন্ন জীববিজ্ঞানী জৈব অভিব্যক্তির পদ্ধতি সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকভাবে আলোচনা করেন। ইহাদের মধ্যে লামার্ক, চার্লস ডারউইন, হিউগো ডি-ভ্রিস প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

(১) **বিশেষ সৃষ্টি মতবাদ** (Special Creation Theory) : পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্মপুস্তকে এবং পৌরাণিক কাহিনীতে ঈশ্বর বা অতিপ্রাকৃত শক্তি দ্বারা জীব সৃষ্টির কাহিনী উল্লেখ করা হইয়াছে। বাইবেলে বর্ণিত আছে যে ঈশ্বর মাত্র ছয়দিনে সমগ্র পৃথিবী, উদ্ভিদ, প্রাণী ও মানব সৃষ্টি করেন এবং সপ্তম দিনে তিনি বিশ্রাম গ্রহণ করেন। এই মতবাদের অনুকূলে কোনো প্রমাণ না থাকায় জীববিজ্ঞানীদের নিকট ইহা গ্রহণযোগ্য নয়। অন্যান্য পৌরাণিক কাহিনীতেও জীব সৃষ্টির সহিত ঈশ্বর, দেবতা অথবা অতিপ্রাকৃত ঘটনাবলী যুক্ত থাকে যাহার ফলে ঐ সকল কাহিনী বিজ্ঞানী কর্তৃক সমর্থিত হয় না। কিন্তু আমাদের মহাভারতে উল্লেখ আছে যে, বিভিন্ন জন্মের মধ্য দিয়া মনুষ্যজন্মের সৃষ্টি হয়—ইহা হইতে বর্তমান অভিব্যক্তির আভাস পাওয়া যায়।

(২) **গ্রীকদের মতবাদ** (Greek Theories) : এক হিসাবে গ্রীকদের আদি অভিব্যক্তিবাদী (Early evolutionists) বলা যাইতে পারে কারণ তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই ধারণা করিতেন যে সরল জীব হইতে ক্রমশ জটিল জীবের সৃষ্টি হয়। গ্রীক অভিব্যক্তিবাদীদের মধ্যে নিম্নলিখিত নামগুলি উল্লেখযোগ্য :

(ক) **অ্যানাক্সিমিণ্ডার** (Anaximinder, 611-547 BC) : ইনি মনে করিতেন যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে মাটি ও জল হইতে জীবের সৃষ্টি হইতে পারে। তাঁহার মতে মানুষের পূর্বপুরুষ মৎস্যরূপে জলে বাস করিত, পরে উহারা মৎস্যের ত্বক পরিত্যাগ করিয়া স্থলভাগে উঠিয়া আসে। তাঁহার এই অনুমানে জীবের ক্রমবিকাশের সামান্য আভাস পাওয়া যায়।

(খ) **জেনোফেন্‌স** (Xenophanes, 576-490 BC) : ইনিই সর্বপ্রথম পৃথিবীর বিভিন্ন শিলাস্তরে জীবাশ্ম বা ফসিল (Fossils) পর্যবেক্ষণ করেন এবং উহাদের প্রাচীন জীবের অংশ হিসাবে চিহ্নিত করেন। তিনি পৃথিবীর উপরিভাগে সামুদ্রিক প্রাণীর জীবাশ্ম লক্ষ্য করিয়া সিদ্ধান্ত করেন যে এক সময় পৃথিবী সম্পূর্ণভাবে জলবেষ্টিত ছিল।

(গ) **এমপেডোক্লিস** (Empedocles, 504-433 BC) : ইনি মনে করিতেন যে পৃথিবীতে প্রথমে উদ্ভিদ এবং পরে প্রাণী সৃষ্টি হয়। পৃথিবীতে প্রথম দিকে অধিক বৈচিত্র্যময় জীবের সৃষ্টি হয় এবং তাহাদের মধ্যে যাহারা সাহস বা গতি অবলম্বন করে তাহারাই পরবর্তীকালে বাঁচিয়া থাকে। বিজ্ঞানী

অসবোর্ন (Osborn, 1896) এর মতে ইনিই সর্বপ্রথম অভিব্যক্তির ধারণা করেন।

(ঘ) অ্যারিস্টোটল (Aristotle, 384-322 BC): ইনি গ্রীক দার্শনিক এবং বিজ্ঞানীদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিচিত। তিনি প্রাণকে



চিত্র 13: অ্যারিস্টোটল

আত্মা বলিতেন এবং উহার ক্রমবিকাশে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি জলচর প্রাণীদের শ্রেণীবিভাগ করেন এবং তাহাদের মধ্যে ক্রমবিকাশ লক্ষ্য করেন। জীবজগতকে তিনি তিনটি বিভাগে বিভক্ত করেন, যথা—উদ্ভিদ, প্রাণী এবং উদ্ভিদ-সদৃশ প্রাণী (যথা-স্পঞ্জ ও সি-অ্যানিমোন)। প্রাণীজগতে তিনি 'ক্ষুদ্র হইতে বৃহৎ' একটি ক্রমবিকাশের ধারা বর্ণনা করেন যাহার শীর্ষে মানুষের স্থান ছিল। এইভাবে তিনি জীবজগতে জাতিজনিগত বৃক্ষ (Phylogenetic tree) সম্বন্ধে প্রথম ধারণা করেন যাহা পরবর্তীকালে লামার্ক প্রমুখ জীববিজ্ঞানীকে প্রভাবিত করে। তবে তাঁহার বৃক্ষে কোনো শাখা-প্রশাখা ছিল না এবং প্রাচীন জীব বা জীবাশ্মের উল্লেখ ছিল না। অ্যারিস্টোটল অবশ্য জীবের স্বতঃস্ফূর্ত উদ্ভবে বিশ্বাসী ছিলেন যাহা পরবর্তীকালে বহুশত বৎসর পর্যন্ত বিজ্ঞানীদের বিভ্রান্ত করিয়াছিল।

অ্যারিস্টোটল জীবাশ্ম সম্পর্কে কোনোরূপ আগ্রহ প্রদর্শন করিতে অসফল হন।

(৩) **পূর্ব আধুনিক মতবাদ** (Pre-modern Theories) : কয়েকজন প্রকৃতি বিজ্ঞানী এবং দার্শনিক বিভিন্নভাবে অভিব্যক্তির ধারা সমর্থন করেন।

(ক) **ফ্রান্সিস বেকন** (Francis Bacon, 1561-1626) : ইনি অ্যারিস্টোটলের ধারণাকে পুনরুজ্জীবিত করেন। ইহার মতে বংশগতির ধারায় যে বৈসাদৃশ্য বা প্রকারণ (Variation) দেখা যায় তাহার ফলে নূতন ধরণের জীব সৃষ্টি হয়। তিনি মনে করিতেন মানুষ হইতে শিম্পাঞ্জীর সৃষ্টি হইয়াছে।

(খ) **বনেট** (Bonnet, 1707-93) : ইনি মনে করিতেন যে প্রাণীর ডিমের মধ্যে সমগ্র প্রাণীটি সঙ্কুচিত অবস্থায় থাকে এবং পরিস্ফুরণের সময় উহা প্রকাশিত হয়।

(গ) **লিনীয়াস** (Linnaeus, 1707-78) : ইনি আধুনিক শ্রেণীবিন্যাস পদ্ধতি বা ট্যাক্সনমির জনক। তিনি বিভিন্ন উদ্ভিদ ও প্রাণীর যথাযথ



চিত্র 14 : লিনীয়াস

শ্রেণীবিন্যাস করেন এবং উহাদের বৈজ্ঞানিক নামকরণ প্রচলন করেন। তাঁহার প্রবর্তিত এই নামকরণ পদ্ধতিকে দ্বিপদ নামকরণ (Binomial nomenclature) বলা হয়। তাঁহার লিখিত সিস্টেমা ন্যাচুরি (Systema Naturae) গ্রন্থটি

সকল প্রকার উদ্ভিদের শ্রেণীবিন্যাসের প্রবর্তক। তবে লিনীয়াস স্বয়ং বিশেষ সৃষ্টির মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। পরবর্তীকালে অবশ্য তাঁহার পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া জীবজগতের শ্রেণীবিভাগ করা হয় যাহা জৈব অভিব্যক্তিকে সমর্থন করে।

(ঘ) **বুফন** (Buffon, 1707-88)**:** ইনি একজন ফরাসী প্রকৃতি বিজ্ঞানী ছিলেন। বুফন তাঁহার 'ন্যাচারাল হিস্ট্রি অফ অ্যানিম্যালস' (Natural History of Animals) গ্রন্থে তাঁহার মতবাদ ব্যক্ত করেন। তাঁহার মতে কোনো জীবের গঠনগত পরিবর্তন পরিবেশের প্রভাবে সম্পন্ন হয় এবং এই পরিবর্তন বংশগতির মাধ্যমে সঞ্চারিত হয়। তাঁহার ধারণা ছিল মানুষ-সদৃশ প্রাণী হইতে গরিলা এবং ঘোড়া সদৃশ প্রাণী হইতে গাধার সৃষ্টি হইয়াছে।

(ঙ) **ইরাসমাস ডারউইন** (1731-1802)**:** ইনি চার্লস ডারউইন-এর পিতামহ ছিলেন। ইনি একজন ডাক্তার এবং প্রকৃতি বিজ্ঞানী ছিলেন। ইনিও বিশ্বাস করিতেন যে পরিবেশের প্রভাবেই জীবের ক্রমবিকাশ হয় তবে এই ক্রমবিকাশে জীবের অভিযোজিত বৈশিষ্ট্যগুলি দেহের মধ্যেই সৃষ্টি হয়। জীবের উপর পরিবেশের প্রভাব এবং তাহার বংশগতিতে সঞ্চারণ-এই ধারণার সহিত লামার্কের ধারণার সাদৃশ্য পাওয়া যায়।

(চ) **লুই পাস্তুর** (Louis Pastour, 1822-1895)**:** প্রথম বিজ্ঞানী যিনি জীবের স্বতঃস্ফূর্ত উদ্ভব (Spotaneous generation)-এর বিরোধিতা করেন। তিনি বিভিন্ন পরীক্ষার সাহায্যে প্রমাণ করেন যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবাণুও কেবল পূর্ববর্তী জীব হইতেই উৎপন্ন হইতে পারে।

(৪) **আধুনিক মতবাদ** (Modern Theories)**:** উপরের আলোচনা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে জীবের ক্রমবিকাশ অথবা জৈব অভিব্যক্তি সম্বন্ধে ধারণাটি বহু প্রাচীন এবং এখনও পর্যন্ত জৈব অভিব্যক্তির সঠিক পদ্ধতি অনুধাবন করা সম্ভব হয় নাই। তবে আধুনিক কালে লামার্ক, ডারউইন, ডিভ্রিস প্রভৃতি বিভিন্ন জীববিজ্ঞানী জৈব অভিব্যক্তির পদ্ধতি সম্পর্কে বিভিন্ন-ভাবে আলোচনা করেন। নীচে তাঁহাদের ধারণা সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হইল।

(ক) **জে. বি লামার্ক** (Jean Baptiste Lamarck, 1744-1829)— লামার্ক একজন ফরাসী জীববিজ্ঞানী ছিলেন, তিনিই সর্বপ্রথম 'বায়োলজি'

(Biology) শব্দটির প্রবর্তন করেন এবং উদ্ভিদ ও প্রাণীকে একত্রে পাঠ করার প্রয়াস করেন। লামার্ক প্রাণীজগৎকে মেরুদণ্ডী এবং অমেরুদণ্ডী এই দুইটি বিভাগে বিভক্ত করেন। জৈব অভিব্যক্তি সম্পর্কে লামার্কের মতবাদ অত্যন্ত সুপরিচিত। পরিবেশের প্রভাবে জীবদেহে পরিবর্তন, ব্যবহারের ফলে অঙ্গ প্রত্যঙ্গের বৃদ্ধি এবং অর্জিত বৈশিষ্ট্যের বংশানুক্রমণ—ইহাই লামার্কের মতবাদের প্রধান অংশ। বিভিন্ন প্রাণীর উদাহরণের সাহায্যে, বিশেষতঃ জিরাফের লম্বা গলার উদাহরণ দিয়া তিনি জৈব অভিব্যক্তিকে সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেন। পরবর্তীকালে অবশ্য লামার্কের মতবাদের যথেষ্ট সমালোচনা হয় এবং বর্তমানে অধিকাংশ বিজ্ঞানী তাঁহার মতবাদকে সমর্থন করেন না।

(খ) **ক্যুভিয়ের** (Cuvier, 1769-1832)—ইনিও লামার্কের সমসাময়িক একজন ফরাসী বিজ্ঞানী ছিলেন। ইনি বিভিন্ন জীবাশ্ম পরীক্ষা করিয়া এই



চিত্র 15 : ক্যুভিয়ের।

সিদ্ধান্তে আসেন যে পৃথিবীতে মহা প্রলয়ের ফলে সব জীব ধ্বংস হইয়া যায় এবং নূতনভাবে জীবের সৃষ্টি হয়। তাঁহার এই মতবাদকে বিপর্যয়বাদ (Theory of Catastrophism) বলা হয়।

(গ) **চার্লস ডারউইন** (Charles Darwin, 1809-1882) ব্রিটিশ প্রকৃতি বিজ্ঞানী চার্লস ডারউইন নিঃসন্দেহে জৈব অভিব্যক্তির ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি। তিনি জৈব অভিব্যক্তির পদ্ধতি সম্পর্কে যে মতবাদ প্রকাশ করেন তাহা 1859 খ্রীষ্টাব্দে 'প্রজাতির উদ্ভব' (Origin of Species) নামক গ্রন্থে প্রকাশিত হয়। তাঁহার মতবাদকে প্রাকৃতিক নির্বাচন বাদ (Theory of Natural Selection) অথবা সংক্ষেপে ডারউইনবাদ (Darwinism) বলা হয়।

ডারউইনের মতবাদকে কয়েকটি অংশে বিভক্ত করা যায়, যথা—

(i) জীবের অত্যধিক জন্মহার (Over production) কিন্তু আহার ও বাসস্থান সীমিত।

(ii) প্রতিটি জীবের মধ্যে আত্মরক্ষার জন্য সংগ্রাম (Struggle for existence)।

(iii) বংশগতি (Heredity) এবং প্রকারণ (Variation)-এর ফলে বিভিন্ন জীবের সন্তান-সন্ততির মধ্যে সাদৃশ্য এবং বৈসাদৃশ্য।

(iv) যোগ্যতমের জয় (Survival of the fittest)

(v) পরিবেশের পরিবর্তন এবং প্রাকৃতিক নির্বাচনের ফলে নূতন প্রজাতির উদ্ভব (Origin of species by Natural Selection)।

ডারউইনের মতবাদ প্রকাশিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে চতুর্দিকে সমালোচনা ওঠে। বহু বিজ্ঞানী তাঁহার মতবাদের বিরোধিতা করিলেও তাঁহার মতবাদের সমর্থনে যে সকল প্রাকৃতিক ঘটনা তিনি উল্লেখ করেন তাহা অস্বীকার করিবার উপায় ছিল না। অবশ্য বর্তমানে উন্নত ধরনের যন্ত্রপাতির সাহায্যে জীববিদ্যার সকল ক্ষেত্রে যে উন্নতিলাভ হইয়াছে তাহার ভিত্তিতেই ডারউইনের মতবাদ কিছু কিছু পরিবর্তিত হইয়াছে, ইহাকে নূতন ডারউইন বাদ (Neo Darwinism) বলে।

ওয়ালেস (Wallace, 1823-1913) আলফ্রেড রাসেল ওয়ালেস একজন ব্রিটিশ জীববিজ্ঞানী ছিলেন। ইনিও সম্পূর্ণ সাধারণভাবে অভিব্যক্তি পদ্ধতি সম্বন্ধে তাঁহার ধারণা ব্যক্ত করেন এবং ডারউইনও তাঁহাকে স্বীকৃতি দেন। ইনিও প্রাকৃতিক নির্বাচন তত্ত্বে বিশ্বাসী ছিলেন।

মেণ্ডেল (Mendel, 1822-1884) : গ্রেগর জোহান মেণ্ডেলকে আধুনিক বংশগতি ও প্রজনন বিদ্যার জনক বলা হয়। মেণ্ডেল অস্ট্রিয়ার ধর্মযাজক

ছিলেন এবং মটর গাছের উপর গবেষণা করিয়া প্রজনন বিদ্যার ভিত্তি স্থাপন করেন। মেণ্ডেল প্রত্যক্ষভাবে জৈব অভিব্যক্তি সম্পর্কে কোনো মতবাদ ব্যক্ত না করিলেও তাঁহার সূত্রের সাহায্যে ডারউইনের অভিব্যক্তিবাদ (বিশেষত বংশগতি ও প্রকারণ অংশটি) ব্যাখ্যা করা সহজ হইয়াছে। মেণ্ডেলের মতে জীবদেহে প্রতিটি বৈশিষ্ট্যের জন্য একজোড়া নির্ধারক (Factor) থাকে এবং ইহারাই বংশানুক্রমে সঞ্চারিত হয়। পরবর্তীকালে এই নির্ধারকগুলিকেই জোহানসেন (Johansen) জিন (gene) নামে অভিহিত করেন। বর্তমানে এই জিন (gene) সম্পর্কে প্রচুর গবেষণা হইয়াছে যাহার ফলে জৈব অভিব্যক্তির পদ্ধতি নূতন ভাবে ব্যাখ্যা করা সম্ভব হইয়াছে।



চিত্র 16 : ওয়েসম্যান



চিত্র 17 : মেণ্ডেল

ওয়েসম্যান (Weismann, 1834-1914) : অগাস্ট ওয়েসম্যান একজন জার্মাণ বিজ্ঞানী যিনি 'জার্মপ্লাজম মতবাদ (Germplasm Theory) প্রবর্তন করেন। তাঁহার মতে জীবের বংশানুক্রমণ জার্মপ্লাজম-এর সাহায্যে সম্পন্ন হয় এবং ইহাতে দেহকোষ কোন সাহায্য করে না। এইভাবে তিনি লামার্কের মতবাদের বিরোধিতা করেন এবং ডারউইনকে সমর্থন করেন। এক হিসাবে তিনি নব-ডারউইনবাদের প্রবক্তা ছিলেন।

ভন বেয়ার (Von Baer, 1792-1876) : একজন জার্মান জীববিজ্ঞানী ছিলেন। ইনি মেরুদণ্ডী প্রাণীদের ভ্রূণের মধ্যে সাদৃশ্য লক্ষ্য করেন এবং তাহাকে জৈব অভিব্যক্তির প্রমাণরূপে উপস্থাপন করেন। ভন বেয়ারকে আধুনিক ভ্রূণবিদ্যার জনক বলা হয়।

হেকেল (Haeckel, 1834-1919) : একজন জার্মান জীববিজ্ঞানী এবং বায়োজেনেটিক তত্ত্বের প্রতিষ্ঠাতা। ইনি বিভিন্ন মেরুদণ্ডী প্রাণীর ভ্রূণের পরিস্ফুরণ দশা পর্যবেক্ষণ করিয়া সিদ্ধান্ত করেন যে—"কোন জীবের জীবন-ইতিহাস তাহার জাতির বা পূর্বপুরুষের ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত পুনরাবৃত্তি মাত্র" (Ontogeny recapitulates Phylogeny)। অনেকে এই তত্ত্বটিকে জৈব অভিব্যক্তির অন্যতম প্রমাণরূপে গণ্য করেন। অবশ্য বর্তমান কালের ভ্রূণ-তত্ত্ববিদগণ তাঁহার মতবাদটিকে সমর্থন করেন না।

ডি ভ্রিস (De Vries, 1848-1935) : হিউগো ডি ভ্রিস হল্যাণ্ডের অধিবাসী এবং 'মিউটেশন তত্ত্বের' (Mutation Theory) প্রবক্তা। ইনি কয়েকটি উদ্ভিদের উপর গবেষণা করিতে করিতে লক্ষ্য করেন যে একই প্রজাতির উদ্ভিদের মধ্যে আকস্মিকভাবে কতকগুলি বৃহৎ পরিবর্তন দেখা যায়। এই পরিবর্তিত উদ্ভিদগুলিকে তিনি মিউটেণ্ট (Mutant) বলেন এবং এই আকস্মিক ও স্থায়ী পরিবর্তনকে মিউটেশন নামে অভিহিত করেন। তাঁহার মতে কেবল পরিব্যক্তি বা মিউটেশনের ফলেই নূতন প্রজাতির উদ্ভব হয়। বর্তমানে বিজ্ঞানীগণ 'মিউটেশন' শব্দটি গ্রহণ করিলেও ডি ভ্রিসের মিউটেশন তত্ত্বকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া মনে করেন না।

বিংশ শতাব্দীতে বিভিন্ন যন্ত্রপাতি আবিষ্কৃত হইবার ফলে জীব বিজ্ঞানের প্রভূত উন্নতি সাধন হয় এবং অভিব্যক্তিবাদ সম্বন্ধে অনেক নূতন তথ্য পাওয়া যায়। **মর্গান** (T.H. Morgan, 1866-1945), **মূলার** (H.J. Muller, 1890-1967), **ওয়াটসন** (Watson, 1928-), **ক্রীক** (Francis Crick) প্রভৃতি বিজ্ঞানী বংশগতি ও জিনের উপর গবেষণা করিয়া বহু তথ্য আবিষ্কার করেন যাহা হইতে জৈব অভিব্যক্তির পদ্ধতি সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা করা যায়। আমেরিকা বাসী ভারতীয় বিজ্ঞানী **হরগোবিন্দ খোরানা** (H.G. Khorana, 1922-) জেনেটিক কোডের উপর গবেষণা করিয়া 1969 খ্রীষ্টাব্দে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। এই শতাব্দীতেই **ওপারিন** (Oparin), **হলডেন**

(J.B.S. Haldane), **মিলার** (Stanley Miller) প্রমুখ বিজ্ঞানীগণ পৃথিবীতে জীবনের আবির্ভাব সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য আবিষ্কার করেন।

মুলার (Muller, 1890-1967)ঃ এইচ, জে, মুলার একজন আমেরিকান বিজ্ঞানী এবং তিনি বংশগতির পদ্ধতি, বিশেষ করিয়া কৃত্রিম পরিব্যক্তি বা মিউটেশন এর উপর প্রচুর গবেষণা করেন। তিনি **ড্রসোফিলা** (*Drosophila*) নামক মাছির উপর এক্স-রে (X-ray) প্রয়োগ করিয়া তাহাদের মধ্যে পরিব্যক্তি বা মিউটেশন লক্ষ্য করেন। তাঁহার প্রবর্তিত মিউটেশন পদ্ধতিকে কৃত্রিম মিউটেশন বা আবিষ্ট মিউটেশন বলা হয়। মূলারের এই মৌলিক গবেষণার জন্য তাঁহাকে 1946 খ্রীষ্টাব্দে নোবেল পুরস্কার প্রদান করা হয়।

ওয়াটসন এবং ক্রীক (Watson and Crick)ঃ জে, ডি, ওয়াটসন এবং ফ্রান্সিস ক্রীক যুক্তভাবে বংশগতির ধারক ও বাহক ডি-এন-এ অণুর গঠন বিন্যাস সম্পর্কে গবেষণা করেন। ইঁহারাই সর্বপ্রথম ডি এন অণুর দ্বিতন্ত্রী বিন্যাস (Double helical structure) সম্বন্ধে আলোকপাত করেন যাহার ফলে বংশগতি এবং জিন সম্বন্ধে গবেষণা করার বহু সুবিধা হইয়াছে। ইহারা 1962 খ্রীষ্টাব্দে তাঁহাদের অমূল্য গবেষণার ফলস্বরূপ নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

খোরানা (Khorana, 1922-)ঃ হরগোবিন্দ খোরানা ভারতে জন্মগ্রহণ করিলেও বর্তমানে আমেরিকা নিবাসী। ইনি জৈব রসায়ন (Bio-Chemistry) বিভাগে প্রচুর গবেষণা করেন। ডি-এন-এ অণু এবং জেনেটিক কোড (Genetic Code)-এর উপর ইনি যে অসামান্য গবেষণা করেন তাহার ফলস্বরূপ তাঁহাকে 1969 খ্রীষ্টাব্দে নোবেল পুরস্কার প্রদান করা হয়।

উপরোক্ত বিজ্ঞানীগণ ব্যতীত পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে অসংখ্য বিজ্ঞানী বর্তমানে জীবের ক্রমবিকাশ লইয়া গবেষণা করিতেছেন। জীববিজ্ঞানের এই নূতন শাখাটি বর্তমানকালের অধিকাংশ বিজ্ঞানীকেই আগ্রহান্বিত করিয়া তুলিয়াছে যাহার ফলে এই শাখাটিও দ্রুত বিস্তারলাভ করিতেছে। কেবল জীববিজ্ঞানই নয়, রসায়ন শাস্ত্র (Chemistry), ভৌতবিজ্ঞান (Physics) গণিতশাস্ত্র (Mathematics) সংখ্যাতত্ত্ব (Statistics) প্রভৃতির সাহায্যে বর্তমানকালে জৈব অভিব্যক্তিবাদকে নূতনভাবে ব্যাখ্যা করা হইতেছে।

সারাংশ

জীবের ক্রমবিকাশ বা জৈব অভিব্যক্তি সম্পর্কে বিভিন্ন ধারণা প্রাচীনকাল হইতেই প্রচলিত আছে। এই সকল ধারণা বা মতবাদকে প্রধানত তিনটি বিভাগে বিভক্ত করা যায় যথা—(ক) প্রাচীন মতবাদ-ইহা বাইবেল ও অন্যান্য ধর্মপুস্তকে বর্ণিত জীবসৃষ্টির মতবাদ, প্রাচীন গ্রীক দার্শনিকদের মতবাদ লইয়া গঠিত। ইহাদের মধ্যে অ্যানাক্সিমিণ্ডার, জেনোফেন্স্, অ্যারিস্টোটল প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। (খ) পূর্ব আধুনিক মতবাদ—ইহা ষোড়শ শতাব্দী হইতে অষ্টাদশ শতাব্দীর বিভিন্ন বিজ্ঞানীর মতবাদ লইয়া গঠিত। ইহাদের মধ্যে ফ্রান্সিস বেকন, লিনীয়াস, বুফন, ইরাসমাস ডারউইন, লুই পাস্তর প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। (গ) আধুনিক মতবাদ—আধুনিক কালে অর্থাৎ উনবিংশ শতাব্দীতে লামার্ক ও ডারউইন অভিব্যক্তির আধুনিক ব্যাখ্যা উপস্থাপিত করেন। ইহাদের মধ্যে ডারউইনের মতবাদটি অধিকতর যুক্তিগ্রাহ্য এবং অধিকতর স্বীকৃত। পরবর্তীকালে ওয়ালেস, ওয়েসম্যান, মেণ্ডেল, ভন বেয়ার, হেকেল, ডি ভ্রিস, মর্গান, মূলার, ওয়াটসন ও ক্রীক, খোরানা প্রভৃতি বিজ্ঞানী জীববিদ্যার বিভিন্ন শাখায় গবেষণা করিয়া অভিব্যক্তিবাদকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।

অনুশীলনী

1. প্রাচীনকালে জীবের ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে কিরূপ ধারণা ছিল উল্লেখ কর।
2. বিশেষ সৃষ্টি মতবাদ এবং গ্রীক দার্শনিকদের মতবাদে কি পার্থক্য দেখা যায় ?
3. জৈব অভিব্যক্তির ধারণার ইতিহাসে লিনীয়াস, ইরাসমাস ডারউইন ও লুই পাস্তর-এর অবদান ব্যাখ্যা কর।
4. আধুনিক কালের জৈব অভিব্যক্তির পদ্ধতি সম্পর্কে যাঁহারা আলোচনা করিয়াছেন তাঁহাদেব নামোল্লেখ কর॥
5. লামার্ক, চার্লস ডারউইন এবং ডি ভ্রিসের মতবাদগুলির মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা কর।
6. সংক্ষিপ্ত টীকা লেখ—(ক) মেণ্ডেল (খ) ডিভ্রিস (গ) ওয়াটসন ও ক্রীক (ঘ) মূলার এবং (ঙ) খোরানা।

গ্রন্থপঞ্জী ও নির্দেশিকা (References)

Gardner E.J, 1978 History of Biology, 3rd-ed Wiley Eastern Limited.

Adhikari S and Sinha A, 1979 Fundamentals of Biology of Animals, New Central Book Agency.

Moody P.A. 1964. Introduction to Evolution 2nd-ed Harper and Brothers. New York.

Mukherjee D. 1972. Text Book of Zoology, New Book Stall. Calcutta.

পঞ্চম অধ্যায়

জৈব অভিব্যক্তিবাদ (Theories of Organic Evoiution)

পূর্ববর্তী আলোচনা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে জৈব অভিব্যক্তির ধারণা নূতন কিছু নয়। প্রাচীনকাল হইতেই বহু বিজ্ঞানীর ধারণা ছিল যে সরল জীব হইতেই জটিল জীবের ক্রমবিকাশ সম্ভব। জৈব অভিব্যক্তির বিভিন্ন প্রমাণ হইতে বর্তমানে প্রায় সকলেই নিঃসন্দেহ যে জৈব অভিব্যক্তি একটি বৈজ্ঞানিক সত্য। তবে জৈব অভিব্যক্তির পদ্ধতি সম্পর্কে মতভেদ আছে। বর্তমানে জৈব অভিব্যক্তির পদ্ধতি সম্পর্কে যে কয়টি মতবাদ প্রচলিত আছে তাহাদের মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি অন্যতম :

(i) **অর্জিতবৈশিষ্ট্যের বংশানুক্রমণ** বা **লামার্কবাদ** (Lamarckism).

(ii) **প্রাকৃতিক নির্বাচনবাদ** বা **ডারউইনবাদ** (Darwinism)

(iii) **ডি ভ্রিস-এর মিউটেশন তত্ত্ব** (Mutation theory of De Vries)

(iv) **আধুনিক সংশ্লেষবাদ** (Modern Synthetic Theory).

লামার্কবাদ (Lamarckism)

ফরাসী জীব বিজ্ঞানী জঁ্যা ব্যাপটিস্ট লামার্ক* (**J. B. Lamarck, 1744-1829**) সর্বপ্রথম জৈব অভিব্যক্তি উপর একটি সম্পূর্ণ তত্ত্ব বা মতবাদ প্রকাশ করেন। বিজ্ঞানী অসবোর্ণ (**Osborn**) লামার্ক-কে অভিব্যক্তির বিষয়ে অ্যারিস্টটল এবং ডারউইন-এর মধ্যবর্তী প্রধান চরিত্র বলিয়া মনে করেন।

লামার্ক তাঁহার মতবাদটি 1909 খ্রীষ্টাব্দে **'ফিলোসফি জুওলজিক'** (***Philosophie Zoologique***) নামক গ্রন্থটিতে প্রকাশ করেন। তাঁহার মতে মনুষ্য সহিত সকল জীব পূর্ববর্তী জীব হইতে সৃষ্টি হইয়াছে। সুবিধার জন্য তাঁহার মতবাদটিকে কয়েকটি অংশে বিভক্ত করা যায়। এই অংশগুলিকে

---

* লামার্কের নাম জঁ্যা ব্যাপটিষ্ট পিয়েরে দ্য মনেট লামার্ক (**Jean Baptiste Piere De Monet Lamarck**)।

অনেকে লামার্কের সূত্র (Law) নামে অভিহিত করেন। ডডসন (Dodson, 1967) লামার্কবাদকে নিম্নলিখিত কয়েকটি বিভাগে বিভক্ত করেন।

1. জীবদেহে ও দেহের প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গে আকারে বৃদ্ধি পাইবার একটি প্রবণতা সর্বদা লক্ষ্য করা যায়।

2. জীবের জীবনধারণের প্রয়োজনে নূতন চাহিদার উৎপত্তি হয় এবং এই চাহিদার ফলে জীবন-অভ্যাসে যে পরিবর্তন হয়, তাহার জন্যই নূতন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ নূতন চাহিদা হইতেই নূতন অঙ্গের উৎপত্তি হয়।



চিত্র 18 : লামার্ক

3. যদি একটি অঙ্গ নিয়মিত ব্যবহার করা যায় তাহা হইলে উহা অত্যন্ত উন্নত ও সুগঠিত হয়, কিন্তু ব্যবহৃত না হইলে অঙ্গটি ক্ষয়প্রাপ্ত ও বিলুপ্ত হইয়া যায়। লামার্কের এই সূত্রটিকে **ব্যবহার ও অব্যবহার সূত্র** (Law of use and disuse) বলা হয়।

4. ব্যবহার ও অব্যবহারের ফলে জীবদ্দশায় জীবদেহের যে পরিবর্তন হয় তাহা (অর্জিত বৈশিষ্ট্য) পরবর্তী প্রজন্মগুলিতে সঞ্চারিত হয়। এই সূত্রটিকে **অর্জিত বৈশিষ্ট্যের বংশানুক্রমণ সূত্র** (Law of Inheritance of acquired characters) বলা হয়।

লামার্ক'বাদ-এর ব্যাখ্যা : লামার্কের মতে জীবদেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মধ্যে সর্বদা বৃদ্ধির প্রবণতা দেখা যায়। কোনো জীবের পরিবেশের পরিবর্তন ঘটিলে উহার দৈহিক পরিবর্তন ঘটে। প্রয়োজন দেখা দিলে জীবদেহে নূতন অঙ্গের সৃষ্টি হয়। লামার্কের মতে যে অঙ্গটি ক্রমাগত ব্যবহৃত হইতে থাকে তাহা ক্রমশ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ও উন্নত হয়। অন্যদিকে কোনো অঙ্গ অব্যবহৃত থাকিলে তাহা ধীরে ধীরে ক্ষয়প্রাপ্ত হয় এবং পরিশেষে লুপ্ত হইয়া যায়। লামার্ক এই প্রসঙ্গে বিভিন্ন উদাহরণ স্থাপন করেন—

(1) কর্মকার এবং ব্যায়ামবীরের হাতের পেশী (Biceps) নিয়মিত ব্যবহারের ফলে পেশীযুক্ত ও সবল হইয়া ওঠে।

(2) হাঁসের পায়ের আঙ্গুলগুলি জলের সহিত ক্রমাগত ঘর্ষণের ফলে লিপ্তপদে (Webbed feet) পরিণত হয়।

(3) গর্তে বাস করার জন্য এবং দেহ বাঁকাইয়া চলার ফলে সাপের দেহ রজ্জুর মত দীর্ঘাকার হয়।

(4) উটপাখী (Ostrich), এমু (Emu), কিউই (Kiwi) প্রভৃতি পাখী ক্রমাগত না উড়িবার ফলে উহাদের ডানাগুলি ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে।

(5) উচুঁ গাছ হইতে পাতা ভক্ষণ করিবার জন্য জিরাফের গলা ও সামনের পা দুইটি ক্রমশ লম্বা হইয়াছে।

উপরের উদাহরণগুলি লামার্কের ব্যবহার ও অব্যবহার সূত্রের যথার্থ উদাহরণ। এইরূপ অসংখ্য উদাহরণ প্রকৃতিতে দেখা যায়।

লামার্কের মতবাদের পরবর্তী অংশ অনুসারে বলা হয় যে জীবের জীবনকালে অর্জিত বৈশিষ্ট্য পরবর্তী প্রজন্মে সঞ্চারিত হয় এবং ইহা হইতেই নূতন প্রজাতির সৃষ্টি হয়।

লামার্ক এই প্রসঙ্গে পুনরায় জিরাফের গলা লম্বা হইবার কারণ ব্যক্ত করেন। তাঁহার মতে জিরাফের পূর্বপুরুষের গলা ও সামনের পা দুইটি লম্বা ছিল না। ইহাদের আকৃতি প্রায় হরিণের মত ছিল। ইহারা যেখানে বাস করিত সেখানে চারণযোগ্য ঘাসের অভাব দেখা দেওয়ায় জিরাফের পূর্বপুরুষরা গাছের পাতা ভক্ষণ করিতে আরম্ভ করে। গাছের উপরদিকের পাতাগুলি ভক্ষণ করিবার জন্য ইহাদের গলা ক্রমাগত লম্বা করিতে হইত। জিরাফের জীবনকালে এই অর্জিত বৈশিষ্ট্যটি (লম্বা গলা) বংশানুক্রমিক-

ভাবে সঞ্চারিত হইতে থাকে এবং ইহার ফলে ধীরে ধীরে বর্তমান লম্বা গলার জিরাফের উৎপত্তি হয়।

লামার্কবাদের সমালোচনা (Criticism)**:** লামার্কের মতবাদটি প্রকাশিত হইবার পর হইতেই নানারূপ সমালোচনার সম্মুখীন হয়। প্রথমত লামার্ক প্রতিটি জীবদেহে বৃদ্ধির প্রবণতার কথা বলিয়াছেন কিন্তু পরবর্তীকালে বিজ্ঞানীগণ সকল জীবে দৈহিক বৃদ্ধি লক্ষ্য করেন নাই বরং তাঁহারা জীবের বংশবৃদ্ধি লক্ষ্য করিয়াছিলেন। পরিবেশের প্রভাবে এবং নুতন চাহিদার ফলেই নুতন অঙ্গের সৃষ্টি হয়—লামার্কের এই তত্ত্বে আপাত সরলতা দেখা যায় যাহা প্রমাণ করা কঠিন। সমালোচকরা বলেন তাহা হইলে কোনো মানুষ তাহার জীবনকালে আকাশে উড়িতে চাহিলে পরবর্তীকালে কি তাহার ডানার উদ্ভব হইবে? লামার্কের ব্যবহার অব্যবহার সূত্রটি বিজ্ঞানীগণ স্বীকার করিলেও অর্জিত বৈশিষ্ট্যের বংশানুক্রমণ এই তত্ত্বটি কেহ সমর্থন করেন না।

লামার্কের বিপক্ষে সমালোচনা: লামার্কের মতবাদের বিপক্ষে বিভিন্ন বিজ্ঞানী যে সকল অভিযোগ উত্থাপন করেন তাহার অধিকাংশই তাঁহার 'অর্জিত বৈশিষ্ট্যের বংশানুক্রমণ' সূত্রটির জন্য।

1. **পরীক্ষা নির্ভর তথ্য:** বিভিন্ন বিজ্ঞানীগণ নানাপ্রকার পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে লামার্কবাদকে ভ্রান্ত প্রমাণ করেন।

(i) বিজ্ঞানী **ওয়েসম্যান** (Weisman) তাঁহার বিখ্যাত পরীক্ষায় কয়েকটি সাদা ইঁদুরের লেজ কাটিয়া তাহাদের মধ্যে প্রজনন ঘটান এবং তাহাদের সন্তান সন্ততিদেরও লেজ কাটিয়া দেন। এইভাবে মোট 22টি প্রজন্মের ইঁদুরের লেজ কাটিলেও তিনি লক্ষ্য করেন কোনো প্রজন্মেই লেজ-কাটা ইঁদুরের সৃষ্টি হয় না। এইভাবে তিনি লামার্কবাদকে ভ্রান্ত প্রমাণ করেন।

(ii) রুশ বিজ্ঞানী **প্যাভলভ** (Pavlov) কয়েকটি ইঁদুরকে এমনভাবে শিক্ষা দিলেন যে ঘণ্টা বাজাইবার সঙ্গে সঙ্গে উহারা খাইবার জন্য খাঁচার উপর হইতে নীচে নামিয়া আসিত, কিন্তু এই অর্জিত বৈশিষ্ট্য পরবর্তী প্রজন্মে সঞ্চারিত হয় নাই।

(iii) **ক্যাসল এবং ফিলিপ্স** (Castle nnd Phillips) দুইটি সাদা এবং দুইটি কালো গিনিপিগের স্ত্রী ও পুরুষ নির্বাচন করেন। ইহারা সাদা

স্ত্রী গিনিপিগের ডিম্বাশয়কে কালো স্ত্রী গিনিপিগের দেহে এবং কালো স্ত্রী গিনিপিগের ডিম্বাশয়কে সাদা স্ত্রী গিনিপিগের দেহের মধ্যে স্থানান্তরিত করেন। ইহার পর সাদা স্ত্রী গিনিপিগের সহিত সাদা পুরুষ এবং কালো স্ত্রী গিনিপিগের সহিত কালো পুরুষের প্রজনন ঘটান। পরবর্তী প্রজন্মে দেখা যায় যে সাদা স্ত্রী গিনিপিগ হইতে কালো সন্তান এবং কালো স্ত্রী গিনিপিগ হইতে সাদা সন্তানের উৎপত্তি হইয়াছে। ইহার ফলে প্রমাণিত হয় যে দেহকোষ জননকোষকে প্রভাবিত করে না।

(iv) ফলের মাছি **ড্রসোফিলা** (**Drosophila**) লইয়া প্রায় 60 প্রজন্ম ধরিয়া সম্পূর্ণ অন্ধকার ঘরে প্রজনন ঘটান হইয়াছে কিন্তু কোনো প্রজন্মে চক্ষুহীন বা অন্ধ ড্রসোফিলা জন্মায় নাই। ইহাও লামার্ক-বাদকে সমর্থন করে না।

2. **পর্যবেক্ষণ নির্ভর তথ্য ঃ** কর্মী মৌমাছি অথবা কর্মী পিপীলিকা জননকার্যে অক্ষম হয় এবং ইহারা নিজেদের মত জীবের জন্ম দিতে পারে না। ইহাদের ক্ষেত্রে পরবর্তী প্রজন্মে অর্জিত বৈশিষ্ট্যের বংশানুক্রমণ করিবার কোনো প্রশ্নই সাধারণত ওঠে না। তবু বংশানুক্রমে এই সকল কর্মী মৌমাছি ও কর্মী পিপীলিকা প্রচুর সংখ্যায় জন্মায় এবং বিভিন্ন পরিবেশের সহিত খাপ খাওয়াইয়া লয়। ইহা হইতে প্রমাণিত হয় যে লামার্কবাদ সকল ক্ষেত্রে কার্যকরী নয়।

3. **বংশগতি নির্ভর তথ্য ঃ** বর্তমানে জীব বিজ্ঞানীগণ বংশগতির ক্ষেত্রে দেহকোষের প্রভাবের কথা স্বীকার করেন না। তাঁহাদের মতে জিন অথবা ডি. এন. এ (**DNA**) অণুই বংশগতির ধারক ও বাহক। সাধারণতঃ জীবের জীবনকালে কোনো অর্জিত বৈশিষ্ট্য 'জিন'কে প্রভাবিত করে না। [জীবদেহে কোনো একটি বৈশিষ্ট্য প্রকাশের সময় **DNA** হইতে প্রথমে **RNA** এবং পরে **RNA** হইতে প্রোটিন বা এনজাইম সৃষ্টি হয়। **DNA** এবং **RNA**-এর বিক্রিয়াটি উভমুখী হইলেও **RNA** এবং প্রোটিন-এর বিক্রিয়াটি উভমুখী নয় (**DNA**←→**RNA**→প্রোটিন→বৈশিষ্ট্য) অর্থাৎ দেহকোষের অর্জিত বৈশিষ্ট্য **DNA** বা বংশগতিতে সঞ্চারিত হয় না।]

লামার্কের সপক্ষে পরীক্ষা ঃ কয়েকজন জীব বিজ্ঞানী বিভিন্ন পরীক্ষার মাধ্যমে লামার্কবাদকে সমর্থন করেন। কিন্তু পরবর্তীকালে দেখা যায় এই সকল পরীক্ষা নিরীক্ষার পদ্ধতি সঠিক ছিলনা অর্থাৎ এই পরীক্ষাগুলির

সাহায্যে লামার্কবাদকে প্রতিষ্ঠিত করা যায় না। নীচে কয়েকটি পরীক্ষা উল্লেখ করা হইল।

(i) **ম্যাকডুগাল** (Macdougall, 1938) একটি খাঁচায় কয়েকটি ইঁদুর রাখেন। খাঁচায় দুইটি পথ ছিল, একটি পথ অন্ধকার এবং অন্য পথটি আলোকিত। আলোকিত পথটিতে বৈদ্যুতিক তার থাকায় ইঁদুরগুলি সেই পথে বাধা পাইত এবং অন্ধকার পথেই যাতায়াত করিত। পরে দেখা যায় বাধা না থাকিলেও ঐ ইঁদুরগুলির সন্তান সন্ততির মধ্যে অধিকাংশই অন্ধকার পথে যাতায়াত করিত। ইহা হইতে ম্যাকডুগাল সিদ্ধান্ত করেন যে ইঁদুরগুলির জীবনকালে অর্জিত গুণ তাহাদের সন্তান সন্ততিদের মধ্যে সঞ্চারিত হয়। কিন্তু পরবর্তী বিজ্ঞানী **ক্রু** (Crew), **আগর** (Agar, 1954) ও তাঁহার শিষ্যগণ পরীক্ষা করিয়া দেখেন যে ম্যাকডুগাল কণ্ট্রোল লাইন (Control line) লইয়া পরীক্ষা করেন নাই সেইজন্য তাঁহার পরীক্ষা সঠিক নয়।

(ii) বিজ্ঞানী **ক্যামেরার** (Kammerer, 1907) উভচর প্রাণী স্যালামাণ্ডার (Salamander)-এর উপর পরিবেশের প্রভাব লক্ষ্য করেন। তিনি বিভিন্ন বর্ণযুক্ত বাক্সে কয়েকটি স্যালামাণ্ডারকে রাখিয়া দেখেন যে পরিবেশের প্রভাবে উহাদের বর্ণ পরিবর্তিত হয় এবং উহা পরবর্তী প্রজন্মেও সঞ্চারিত হয়। পরবর্তীকালে বিভিন্ন বিজ্ঞানী এই পরীক্ষা করিয়া দেখেন কিন্তু অনুরূপ ফললাভে অসমর্থ হন।

(iii) বিখ্যাত রুশবিজ্ঞানী **লাইসেঙ্কো** (Lysenko) পরিবেশের পরিবর্তন ঘটাইয়া বিভিন্ন উদ্ভিদের মৌলিক বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তনসাধন করেন। তাঁহার মতে এই বৈশিষ্ট্যগুলি বংশানুক্রমে সঞ্চারিত হয়। বর্তমানে জানা গিয়াছে যে পরীক্ষাকালে তিনি যেসকল উদ্ভিদ নির্বাচিত করেন তাহারা শুদ্ধ (Pure) ছিল না। সেইজন্য তাঁহার পরীক্ষাগুলিও লামার্কবাদকে সমর্থন করে না।

নব লামার্কবাদ বা নিও-লামার্কিজম (Neo-Lamarckism) :

লামার্কের মতবাদ প্রকাশিত হইবার পর কিছু বিজ্ঞানীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেও উপযুক্ত প্রমাণাদির অভাবে বিশেষ গুরুত্ব পায় নাই। ডারউইন এবং ওয়েসম্যান লামার্কবাদের বিরূপ সমালোচনা করেন। পরবর্তীকালে স্পেনসার (Spencer), ম্যাক ব্রাইড (Mc Bride), প্যাকার্ড (Packard)

প্রভৃতি জীব বিজ্ঞানীগণ লামার্কবাদের কিছু কিছু অংশ সংশোধন করেন, ইহাকেই নব লামার্কবাদ বা নিও-লামার্কিজম বলা হয়। তবে আধুনিক জীব বিজ্ঞানীদের মতে 'অর্জিত বৈশিষ্ট্যের বংশানুক্রমণ'—এই তত্ত্বটি লামার্কবাদের একটি প্রধান ত্রুটি। সেইজন্য তাঁহারা লামার্ককে যতটা ঐতিহাসিক মূল্য দেন ততটা বৈজ্ঞানিক মূল্য দেন না।

কার্টার (Carter, 1960)-এর মতে লামার্কের মতবাদ বর্তমানে গৃহীত না হইলেও লামার্কই ছিলেন আধুনিক অভিব্যক্তিবাদের পথিকৃৎ। বিজ্ঞানীদের মস্তিষ্কে অভিব্যক্তি সম্বন্ধে চিন্তার বীজরোপন করার কৃতিত্ব তাঁহারই।

ডারউইনবাদ (Darwinism)

ব্রিটিশ বিজ্ঞানী **চার্লস রবার্ট ডারউইন** (Charles Robert Darwin, 1809-1882)-এর নাম অভিব্যক্তিবাদের ইতিহাসে একটি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্করূপে বিরাজমান। তিনি জৈব অভিব্যক্তি বা জীবের ক্রমবিকাশ সম্পর্কে সর্বপ্রথম তথ্যবহুল ও যুক্তিনির্ভর মতবাদ প্রকাশ করেন। এইজন্য তাঁহাকে জৈব অভিব্যক্তিবাদের 'প্রধান প্রবক্তা' (Pioneer) বলা হয়। জৈব অভিব্যক্তি সম্পর্কে তাঁহার মতবাদটি **'প্রাকৃতিক নির্বাচনবাদ'** (Natural Selection Theory) নামে পরিচিত।

সংক্ষিপ্ত জীবনী ঃ চার্লস ডারউইন 1809 খ্রীষ্টাব্দের 12 ফেব্রুয়ারী ইংল্যাণ্ডের শ্রুসবেরী (Shrewsbury) নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা একজন চিকিৎসক ছিলেন এবং পিতার ইচ্ছানুসারে তিনি প্রথমে এডিনবরাতে চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যায়ন করিতে যান। কিন্তু গতানুগতিক শিক্ষাধারা তাঁহার পছন্দ ছিল না, সেইজন্য পরবর্তীকালে তিনি কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে **থিওলজি** (Theology) অধ্যয়ন করেন ও তথা হইতে 1831 খ্রীষ্টাব্দে স্নাতক হন। 1831 খ্রীষ্টাব্দেরই শেষের দিকে তিনি **এইচ, এম, এস বিগ্‌ল** (HMS Beagle) নামক একটি জাহাজে প্রকৃতি বিজ্ঞানী (Naturalist) রূপে নিযুক্ত হন। সুদীর্ঘ পাঁচ বৎসর ধরিয়া এই জাহাজটি আটলান্টিক মহাসাগরের দ্বীপ, দক্ষিণ আমেরিকার উপকূলভাগ, প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ প্রভৃতি বিভিন্ন অঞ্চল পরিভ্রমণ করে। এই সময় ডারউইন পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের উদ্ভিদ ও প্রাণী সংগ্রহ করেন এবং

সেখানকার ভূতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যগুলি বিশেষভাবে লক্ষ্য করেন। ভ্রমণ হইতে ফিরিয়া আসিয়া তিনি তাঁহার পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতালব্ধ ফল লইয়া গবেষণা করিতে আরম্ভ করেন এবং তাঁহার গবেষণার ফলগুলি প্রকাশিত হইতে থাকে। 1838 খ্রীষ্টাব্দে তিনি **ম্যালথাস** (Malthus) লিখিত জনসংখ্যাতত্ত্ব



চিত্র 19 : চার্লস ডারউইন

(Population theory) প্রবন্ধটি পাঠ করিয়া বিশেষভাবে প্রভাবিত হন এবং জীবজগতে বৈচিত্র্য ও প্রজাতির উদ্ভব সম্বন্ধে গবেষণা করিতে থাকেন।

1858 খ্রীষ্টাব্দে **আলফ্রেড রাসেল ওয়ালেস** (Alfred Russel Wallace) নামক একজন তরুণ বিজ্ঞানী ডারউইনের নিকট একটি গবেষণা পত্র পাঠান। ডারউইন বিস্মিত হইয়া দেখেন যে তাঁহার গবেষণার সহিত ওয়ালেসের গবেষণার প্রচুর সাদৃশ্য আছে। বিজ্ঞানী জনোচিত উদারতায় ডারউইন তৎক্ষণাৎ তাঁহার গবেষণার ফলাফল ওয়ালেসকে দিতে স্বীকৃত হন কিন্তু বিজ্ঞানী **লাইয়েল** এবং **হুকার** (Lyell and Hooker) তাঁহাকে ওয়ালেস-এর সহিত যুক্তভাবে গবেষণাপত্র পাঠ করিতে পরামর্শ দেন। ইহার ফলে তিনি ওয়ালেসের সহিত যুক্তভাবে একটি গবেষণাপত্র লণ্ডনের লিনিয়ান সোসাইটিতে পেশ করেন। ইহার পর 1959 খ্রীষ্টাব্দে ডারউইন তাঁহার

'প্রজাতির উদ্ভব' বা **'অরিজিন অফ স্পিসিজ** (Origin of Species) * নামক বিখ্যাত গ্রন্থটি প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থটি প্রকাশিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে কেবল বিজ্ঞানী মহলেই নয়, সাধারণ পাঠকদের মধ্যেও সাড়া পড়িয়া যায়। প্রথমে অনেকে তাঁহার মতবাদের বিরোধিতা করেন কিন্তু তাঁহার মতবাদটি এতই যুক্তিপূর্ণ ও তথ্যনির্ভর ছিল যে অধিকাংশ বিজ্ঞানীই তাঁহাকে সমর্থন করেন। 1882 খ্রীষ্টাব্দের 19 এপ্রিল ডারউইন 73 বৎসর বয়সে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ইংলণ্ডের ওয়েস্টমিনস্টার অ্যাবেতে তাঁহাকে নিউটনের সমাধির নিকট সমাধিস্থ করা হয়।

প্রাকৃতিক নির্বাচনবাদ (Theory of Natural Selection) :

জৈব অভিব্যক্তি সম্পর্কে ডারউইনের মতবাদটিকে প্রাকৃতিক নির্বাচনবাদ বলা হয়। এই মতবাদটিকে সংক্ষিপ্ত উপায়ে প্রকাশ করা যায়। পৃথিবীতে সকল উদ্ভিদ এবং প্রাণী অত্যধিক হারে বংশবৃদ্ধি করে অথচ পূর্ণাঙ্গ দশায় উদ্ভিদ ও প্রাণীর সংখ্যা প্রায় একই থাকে। সুতরাং সকল উদ্ভিদ এবং প্রাণীর মধ্যে বাঁচিয়া থাকার জন্য সংগ্রাম দেখা যায়। এই সংগ্রামে যোগ্যতমের জয় হয়। উদ্ভিদ ও প্রাণীর মধ্যে যে সকল প্রকারণ পরিবেশে বাস করিবার পক্ষে অধিকতর উপযোগী হয় তাহারাই প্রকৃতি কর্তৃক নির্বাচিত হয়। পরিবেশের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে উপযুক্ত প্রকারণ ও বংশগতির মাধ্যমে প্রাচীন প্রজাতির পরিবর্তন হয় এবং নূতন প্রজাতির উদ্ভব হয়।

ডারউইনের প্রাকৃতিক নির্বাচনবাদের মূলতত্ত্বগুলিকে নীচে সংক্ষেপে বর্ণনা করা হইল।

1. **দ্রুতহারে সংখ্যাবৃদ্ধি বা বংশবৃদ্ধি** (Rapid Increase in Numbers) : ডারউইন মনে করিতেন যে জীবের ক্রমবিকাশের একটি প্রধান কারণ জীবের দ্রুতহারে বংশবৃদ্ধির প্রবণতা। প্রতিটি জীবই জ্যামিতিক হারে বংশবৃদ্ধি করে এবং এই সকল জীবের বংশবৃদ্ধির হার পর্যবেক্ষণ করিলে বিস্মিত হইতে হয়। উদাহরণস্বরূপ একটি স্ত্রী স্যামন মাছ (Salmon fish) একটি প্রজনন ঋতুতে প্রায় 28,000,000 (দুই কোটি আশি লক্ষ) ডিম পাড়ে। অন্যদিকে

* গ্রন্থটির প্রকৃত নাম 'The Origin of Species by means of Natural Selection or The Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life'.

অয়েস্টার (Oyster) নামক সামুদ্রিক ঝিনুক জাতীয় প্রাণী একবারে প্রায় 114,000,000 (এগারো কোটি চল্লিশ লক্ষ) ডিম পাড়ে। ইহাদের সবগুলি বাঁচিয়া থাকিলে কয়েক প্রজন্মের মধ্যেই সমগ্র পৃথিবীর জলরাশি কেবল স্যামন মাছ বা অয়েষ্টারে পরিপূর্ণ হইত। মানুষের দেহে বসবাসকারী গোলকৃমি 'অ্যাসকারিস' (Ascaris) 24 ঘণ্টায় প্রায় 700,000 (সাত লক্ষ) ডিম উৎপন্ন করে। ইহাদের সবগুলি বাঁচিয়া থাকিলে অচিরেই পৃথিবীর সমস্ত মানুষ গোলকৃমির দ্বারা আক্রান্ত হইত। সমগ্র স্তন্যপায়ী প্রাণীর মধ্যে হাতীর জন্মহার সর্বাপেক্ষা কম কিন্তু ডারউইনের হিসাবে একজোড়া হাতী হইতে 750 বৎসরে প্রায় 19,000,000 (এক কোটি নব্বই লক্ষ) বংশধর সৃষ্টি হইতে পারে।

2. **সীমিত আহার ও বাসস্থান (Limited Food and Space) :** জীবের মধ্যে দ্রুতহারে বংশবৃদ্ধি করার প্রবণতা থাকিলেও সকল জীবের জন্য যথেষ্ট আহার ও বাসস্থান পাওয়া যায় না। ভূপৃষ্ঠের আয়তন সীমাবদ্ধ এবং কোনো একটি স্থানে বহুজীব একত্রে বাস করে। প্রাকৃতিক বিপর্যয় এবং পরিবেশের পরিবর্তনেও জীবের বাসস্থান ধ্বংস হয়। অন্যদিকে সকল জীবেরই জীবন ধারণের জন্য খাদ্য প্রয়োজন কিন্তু সকল সময়ে বা সকল স্থানে যথেষ্ট খাদ্য পাওয়া যায় না। খাদ্য ও আশ্রয়ের অভাবে বহু জীব অপরিণত অবস্থাতেই বিনষ্ট হয় এবং প্রজাতির সংখ্যা নির্দিষ্ট (Constant) থাকে।

3. **জীবন-সংগ্রাম (Struggle for Existence) :** একদিকে প্রতিটি জীবের দ্রুত বংশবৃদ্ধির প্রবণতা এবং অন্যদিকে খাদ্য ও আশ্রয়ের অভাব থাকার ফলে প্রতিটি জীবকেই জীবন ধারণের জন্য সংগ্রাম করিতে হয়। ইহাকেই জীবন সংগ্রাম বা আত্মরক্ষার জন্য সংগ্রাম বলা হয়। অবশ্যই ডারউইন এই 'জীবন সংগ্রাম' শব্দটিকে অত্যন্ত ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করেন। তাঁহার মতে একটি খাদক যখন খাদ্যকে আক্রমণ করিতেছে, একটি প্রাণী যখন প্রাণভয়ে পলায়ন করিতেছে আবার একটি গাছের নীচে বিভিন্ন বীজ হইতে অঙ্কুরোদ্গমের চেষ্টা হইতেছে—ইহারা সবই জীবন সংগ্রামেরই বিভিন্ন রূপ। জীবজগতে প্রধানত তিন প্রকারের জীবন সংগ্রাম দেখা যায়—

(i) **অন্তঃ প্রজাতি সংগ্রাম (Intra Specific Struggle) :** খাদ্য ও বাসস্থানের জন্য যখন একই প্রজাতির বিভিন্ন সদস্যদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়

তখন তাহাকে অন্তঃপ্রজাতি সংগ্রাম বলে। যথা—কুকুরে-কুকুরে, বিড়ালে-বিড়ালে বা মানুষে-মানুষে সংগ্রাম। আবার একটি বড় গাছের নীচে প্রচুর সংখ্যক বীজ পড়ে কিন্তু তাহা হইতে অল্পসংখ্যক চারাগাছ বাহির হয় এবং মাত্র কয়েকটি শেষ পর্যন্ত গাছে পরিণত হয়। ইহার কারণ পর্যাপ্ত আলোক, বাতাস, খাদ্য, বাসস্থান প্রভৃতির জন্য ইহাদের মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয় যাহার ফলে অধিকাংশ বীজই পরিণতি লাভ করে না।

(ii) **আন্তঃপ্রজাতি সংগ্রাম** (Inter-Specific Struggle) : খাদ্য ও আশ্রয়ের জন্য যখন দুইটি বিভিন্ন প্রজাতির মধ্যে জীবন সংগ্রাম হয় তখন তাহাকে আন্তঃপ্রজাতি সংগ্রাম বলে। যথা—কুকুরে-বিড়ালে, বিড়ালে-ইঁদুরে বা সাপে-নেউলে সংগ্রাম। জীবজগতে বিভিন্ন প্রাণীর মধ্যে খাদ্য-খাদক সম্পর্ক থাকার জন্য জীবন সংগ্রামের ভয়াবহ রূপটি ফুটিয়া ওঠে। যেমন পতঙ্গ ও ব্যাঙ, ব্যাঙ ও সাপ, হরিণ ও বাঘ প্রভৃতি। অবশ্য একটি বাঘের হরিণের পিছনে দৌড়ানো এবং হরিণটির বাঘের ভয়ে দৌড়ানো দুটিই জীবনসংগ্রামের বিভিন্ন রূপ।

(iii) **পরিবেশগত সংগ্রাম** (Environmental Struggle) : পরিবেশ সর্বদা জীবের অনুকূল থাকে না। প্রতিকূল পরিবেশ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য জীবকে যে সংগ্রাম করিতে হয় তাহাকেই পরিবেশগত সংগ্রাম বলে। খরা-বন্যা, ঝড়-বৃষ্টি, শুষ্কতা-আর্দ্রতা, উষ্ণতা-শৈত্য, ভূমিকম্প-অগ্ন্যুৎপাত প্রভৃতি নানা প্রকার প্রাকৃতিক প্রতিকূলতা জীবের আহার, বাসস্থান অথবা জীবকেই ধ্বংস করিয়া ফেলে। সেই জন্য জীবকে সর্বদাই প্রতিকূল পরিবেশের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় প্রতিকূল পরিবেশ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য বীজের উপরকার আবরণী সাধারণত কঠিন হয়; আবার শীতপ্রধান দেশের স্তন্যপায়ীর দেহে অধিক লোম দেখা যায়।

4. **প্রকারণ** (Variations) **এবং বংশগতি** (Heredity) : পৃথিবীতে কোনো দুইটি জীব সম্পূর্ণভাবে একটি অপরের মত নয়। একই প্রজাতির জীবের মধ্যে, এমনকি একই পিতামাতার সন্তান-সন্ততির মধ্যে কিছু কিছু পার্থক্য দেখা যায়। জীবজগতে এই বৈচিত্র্যকেই প্রকারণ বা ভেদ (Variation) বলা হয়। এই প্রকারণের ভিত্তিতেই বিভিন্ন জীবগোষ্ঠীর (Population) মধ্যে অধিকতর পার্থক্য দেখা যায় যাহার ফলে উপপ্রজাতি

(Sub species) বা ডারউইন বর্ণিত প্রারম্ভিক প্রজাতি (Incipient species) গঠিত হয়। ডারউইনের মতে জীবের পক্ষে অনুকূল প্রকারণগুলি বংশগতির মাধ্যমে পরবর্তী প্রজন্মে সঞ্চারিত হয়। অতএব যে সকল প্রকারণ একটি মরুভূমির উদ্ভিদে জলের বাষ্পমোচন হ্রাস করে তাহাই উহার পক্ষে অনুকূল প্রকারণ এবং তাহাই বংশানুক্রমে সঞ্চারিত হয়। অন্যদিকে জীবের ক্ষতিকর প্রকারণগুলি তাহাকে জীবন সংগ্রামে অনুপযুক্ত করিয়া তোলে ফলে তাহার অবলুপ্তি ঘটে।

5. **যোগ্যতমের জয়** (Survival of the fittest) : যে সকল জীবের দেহ পরিবেশের সহিত অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ (অভিযোজিত) তাহারাই জীবন সংগ্রামে সাফল্য লাভ করে। পরিবেশের পরিবর্তনে ইহারা অধিক দক্ষতার পরিচয় দেয়। এই সকল অনুকূল পরিবর্তনযুক্ত উদ্ভিদ বা প্রাণী যৌন পরিণতি লাভ করে এবং বংশ পরম্পরায় প্রকারণগুলি সঞ্চারিত হওয়ায় জীবন-সংগ্রামে উহারাই জয়ী হয়। হার্বার্ট স্পেনসার (Herbert Spencer) ইহাকেই 'যোগ্যতমের জয়' (Survival of the fittest) বলিয়াছেন, এবং ডারউইন বলিয়াছেন 'প্রাকৃতিক নির্বাচন' (Natural selection)। ডারউইনের মতে জীবন সংগ্রামে কে যোগ্যতম তাহা প্রকৃতি নির্বাচন করে এবং অন্যেরা ক্রমশ অবলুপ্ত হয়। প্রকৃতপক্ষে জীবন সংগ্রামে যাহারা জয়ী হইতে পারে না, তাহারা যৌন পরিণতি লাভ করিবার পূর্বেই মৃত্যুবরণ করে এবং ধীরে ধীরে অবলুপ্ত হয়। এইভাবে পরিবেশের পরিবর্তনের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া জীবদেহে পরিবর্তন হয় এবং নূতন প্রজাতির উদ্ভব হয়।

ডারউইন তাঁহার প্রাকৃতিক নির্বাচনের ভাবার্থ ব্যাখ্যা করিবার জন্য জীবজগতে বিভিন্ন নির্বাচন পদ্ধতির উল্লেখ করেন, যথা—যৌন নির্বাচন, কৃত্রিম নির্বাচন ও অনুকৃতি।

(i) **যৌন নির্বাচন** (Sexual selection) : ডারউইন লক্ষ্য করেন যে সকল জীবে স্ত্রী-পুরুষ ভেদাভেদ আছে তাহাদের মধ্যে কোনো কোনো ক্ষেত্রে দুই প্রকার যৌন-লক্ষণ দেখা যায়, যথা—(a) মুখ্যযৌন লক্ষণ—যাহা প্রত্যক্ষভাবে জনন কার্যে সাহায্য করে এবং (b) গৌণ যৌন লক্ষণ—যাহা বাহির হইতে স্ত্রী-পুরুষ ভেদাভেদ চিহ্নিত করে। প্রাণীজগতে অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রধানতঃ স্ত্রী প্রাণীকে আকর্ষণ করিবার জন্য পুরুষ প্রাণীর দেহে বিশেষ বর্ণ বৈচিত্র্য দেখা যায় (যথা—ময়ূর ও মোরগ)।

(ii) **কৃত্রিম নির্বাচন** (Artificial selection)ঃ মানুষ বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যযুক্ত উদ্ভিদ বা প্রাণীর মধ্যে কৃত্রিমভাবে প্রজনন ঘটাইয়া অধিকতর গুণসম্পন্ন উদ্ভিদ বা প্রাণী সৃষ্টি করে, ইহাকেই কৃত্রিম নির্বাচন বলে। কৃত্রিম নির্বাচন হইতেই ডারউইনের মনে প্রাকৃতিক নির্বাচনের ধারণার উদয় হয়।

(iii) **অভিযোজন ও অনুকৃতি** (Adaptation and mimicry)ঃ ডারউইনের মতে যে সকল জীব পরিবেশের সহিত সামঞ্জস্য রাখিতে পারে বা সঠিকভাবে অভিযোজিত হইতে পারে, তাহারাই জীবন সংগ্রামে জয়ী হয়। বস্তুতঃ এইরূপ অভিযোজন প্রাকৃতিক নির্বাচনের ফল। কখনো কখনো একটি জীবের বর্ণে, আকারে অথবা আচরণে অন্য একটি জীবের বা নির্জীব পদার্থের সাদৃশ্য দেখা যায়। জীবের এইরূপ আচরণকে বা সাদৃশ্যকে অনুকৃতি বা মিমিক্রি বলে। পত্রাকৃতি পতঙ্গ, কাঠি পতঙ্গ, মৃতপত্র প্রজাপতি প্রভৃতি বহু প্রাণীর মধ্যে এই অনুকৃতি দেখা যায়। ডারউইনের মতে অনুকৃতি জীবন সংগ্রামে জয়ী হইবার একটি কৌশলমাত্র এবং ইহা প্রাকৃতিক নির্বাচনের ফলেই সম্ভব।

জিরাফের উৎপত্তির ব্যাখ্যাঃ ডারউইন বর্তমান লম্বা গলা জিরাফের উৎপত্তি নিম্নলিখিতভাবে ব্যাখ্যা করেন। তাঁহার মতে জিরাফের পূর্বপুরুষের গলা লম্বা ছিল না তবে প্রকারণের ধারা অনুসারে কয়েকটি জিরাফের গলা লম্বা ছিল। উহারা যখন গাছের পাতা ভক্ষণ করিবার জন্য নিজেদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিত তখন লম্বা গলার জিরাফগুলি অধিক সুবিধা লাভ করিত। জিরাফের লম্বা গলার প্রকারণটি অনুকূল প্রকারণ হওয়ায় উহা যৌন পরিণতি লাভ করিয়া বংশ পরম্পরায় সঞ্চারিত হইল। অন্যদিকে ক্ষুদ্র গলার জিরাফেরা যৌন পরিণতি লাভ করিতে না পারিয়া ধীরে ধীরে অবলুপ্ত হইয়া গেল। পরিশেষে কেবল লম্বা গলাযুক্ত জিরাফই বাস করিতে লাগিল। ডারউইন-এর মতে প্রকৃতি এই লম্বাগলা জিরাফকে নির্বাচন করিয়াছে এবং ইহা প্রাকৃতিক নির্বাচনের উদাহরণ।

ডারউইন-বাদের সারাংশ (Summary of Darwinism)

জুলিয়ান হাক্সলে (Julian Huxley) কয়েকটি প্রাকৃতিক ঘটনা ও তাহা হইতে সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে ডারউইনের মতবাদের সারাংশ উল্লেখ করেন।

ঘটনা (Facts)	সিদ্ধান্ত (Deductions)
(1) অত্যধিক জন্মহার (2) সীমিত আহার ও বাসস্থান,	জীবন সংগ্রাম
(3) জীবন সংগ্রাম (4) প্রকারণ ও বংশগতি	যোগ্যতমের জয় বা প্রাকৃতিক নির্বাচন
(5) যোগ্যতমের জয় (6) পরিবেশের পরিবর্তন	নূতন প্রজাতির উদ্ভব

ডারউইনের মতবাদের সমালোচনা (Criticism of Darwin's Theory) : ডারউনের প্রাকৃতিক নির্বাচনবাদ তাঁহার সুদীর্ঘ পাঁচ বৎসরের ভ্রমণের অভিজ্ঞতা, অসংখ্য উদ্ভিদ ও প্রাণী সংগ্রহ, তাহাদের পর্যবেক্ষণ এবং সর্বোপরি তাঁহার বহু বর্ষব্যাপী দার্শনিক চিন্তাধারার ফল। বর্তমানে জৈব অভিব্যক্তি সম্বন্ধে আমাদের যে ধারণা তাহার সূচনা ডারউইনই করেন। তাঁহারি প্রাকৃতিক নির্বাচনবাদ তৎকালীন বিজ্ঞানীমহলে সাড়া জাগাইলেও পরবর্তীকালে ইহার কয়েকটি ত্রুটি ধরা পড়ে, যথা—

(1) ডারউইন ক্ষুদ্র এবং অস্থায়ী প্রকারণের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছিলেন কিন্তু নূতন প্রজাতির উদ্ভবে ইহার ভূমিকা সম্বন্ধে অনেকে সন্দেহ পোষণ করেন।

(2) ডারউইন প্রকারণকে প্রজাতি উদ্ভবের প্রধান কারণ বলিয়া মনে করিতেন কিন্তু প্রকারণের উৎপত্তি কিভাবে হয় তাহা তিনি ব্যাখ্যা করেন নাই।

(3) লামার্কের মত ডারউইনও প্রথমদিকে অর্জিত বৈশিষ্ট্যের বংশানুক্রমণ সম্বন্ধে বিশ্বাসী ছিলেন।

(4) ডারউইন অর্জিত বৈশিষ্ট্যের বংশানুক্রমণ সম্বন্ধে একটি তত্ত্ব উত্থাপন করেন যাহাকে প্যানজেনেসিস তত্ত্ব বলা হয়। পরে ইহা ভ্রান্ত প্রমাণিত হইয়াছে।

ডারউইনের প্যানজেনেসিস তত্ত্ব (Pangenesis hypothesis) : ডারউইন মনে করিতেন যে জীবের দেহকোষ (Somatie cell) যখন বিভাজিত হয় তখন তাহার ভিতর হইতে একপ্রকার সূক্ষ্ম কণা বা গেমিউল (Gemmule)

বাহির হইয়া আসে। এই গেমিউলগুলি একত্রিত হইয়া জননকোষে (germ cell) প্রবেশ করে। জনন কোষের ভিতরে এই গেমিউলগুলির মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয় এবং ইহারা পরবর্তী প্রজন্মে সঞ্চারিত হয়। অনুকূল পরিবেশে এই গেমিউল হইতে বৈশিষ্ট্যগুলি বিকাশ লাভ করে।

ডারউইনের প্যানজেনেসিস তত্ত্ব পরবর্তীকালে ওয়েসম্যানের জার্মপ্লাজম তত্ত্ব দ্বারা স্থানচ্যুত হয়।

ওয়েসম্যানের জার্মপ্লাজম তত্ত্ব (Germplasm theory) ঃ ডারউইনের মতবাদের প্রধান দুর্বলতা ছিল এই যে উহা প্রকারণকে প্রজাতির উদ্ভবের কারণ মনে করিত। কিন্তু প্রকারণের উদ্ভবের কারণ কি তাহা জানা ছিল না। ডারউইনের প্যানজেনেসিস তত্ত্বের ভিত্তিও সুদৃঢ় ছিল না। এই সমস্যার সমাধানের জন্য অগাস্ট ওয়েসম্যান (August Weismann, 1834—1914) তাঁহার জার্মপ্লাজম তত্ত্ব প্রকাশ করেন। তাঁহার মতে জীবের বংশগত গুণাবলীর উপাদানগুলি জননকোষে বা জার্মপ্লাজমে থাকে। ইহাই বংশগতির একক এবং জীবের প্রকারণের উদ্ভবের কারণ। অতএব জীবের দেহকোষ বা সোমাটোপ্লাজম বংশগতিতে কোনো ভূমিকাই গ্রহণ করে না। কোনো জীবের জীবনকালে তাহার সোমাটোপ্লাজমে যে পরিবর্তন হয় তাহা জার্মপ্লাজমে প্রবেশ করে না এবং পরবর্তী প্রজন্মে সঞ্চারিত হয় না।

নব ডারউইনবাদ বা নিও ডারউইনিজম (Neo-Darwinism) ঃ ডারউইনের প্রাকৃতিক নির্বাচনবাদ সহজবোধ্য, যুক্তি নির্ভর ও তথ্য নির্ভর হওয়ার জন্য সহজেই স্বীকৃতি লাভ করিয়াছিল। কিন্তু সেই সময় কোষতত্ত্ব, বংশগতি প্রভৃতি বিষয়ে অজ্ঞানতার জন্য প্রকারণ সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় নাই। বিগত শতাধিক বৎসরে জীববিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় বিশেষ করিয়া কোষতত্ত্ব ও জিনতত্ত্ব সম্বন্ধে বহু নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই সকল নূতন তথ্যের ভিত্তিতে ডারউইনের সমর্থকগণ তাঁহার প্রাকৃতিক নির্বাচনবাদের যে পুনর্মূল্যায়ন করিয়াছেন তাহাকেই নব-ডারউইনবাদ বা নিওডারউইনিজম বলা হয়। বর্তমানকালের কয়েকজন বিখ্যাত জীববিজ্ঞানী যথা—মুলার, রাইট, গোল্ডস্মিথ, ওয়াডিংটন, ডবজানস্কি প্রভৃতি নব ডারউইনবাদের সমর্থক। নব ডারউইনবাদ হইতেই অভিব্যক্তির আধুনিক সংশ্লেষবাদ (Modern Synthetic theory of Evolution)-এর উদ্ভব হইয়াছে।

ডি ভ্রিসের মিউটেশন তত্ত্ব (Mutation theory of De Vries) :

হল্যাণ্ডের উদ্ভিদ বিজ্ঞানী হিউগো ডি ভ্রিস (Hugo De Vries, 1848-1935) জৈব অভিব্যক্তির কারণ হিসাবে 1901 খ্রীষ্টাব্দে যে মতবাদ প্রকাশ করেন তাহাকে পরিব্যক্তিবাদ বা মিউটেশন তত্ত্ব বলা হয়। ডি. ভ্রিস সন্ধ্যামনি (Evening primrose) বা **'ইনোথেরা লামার্কিয়ানা'** (*Oenothera lamarckiana*) নামক উদ্ভিদের প্রজনন পরীক্ষা করিবার সময় কয়েকটি



চিত্র 20 : ডি ভ্রিস।

উদ্ভিদের মধ্যে আকস্মিক ও বিরাট পরিবর্তন লক্ষ্য করেন। এই পরিবর্তনগুলি আকস্মিক হইলেও স্থায়ী এবং বংশানুক্রমিক। তিনি এই সকল স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য-যুক্ত উদ্ভিদগুলির নাম দেন **মিউটেণ্ট** (Mutant)। যে পদ্ধতিতে এই মিউটেণ্টের উদ্ভব হয় তাহাকে বলে পরিব্যক্তি বা **মিউটেশন** (Mutation)। ডি ভ্রিসের মতে এই মিউটেশনের ফলেই জীবদেহে আকস্মিক পরিবর্তন হয় এবং নূতন প্রজাতির উদ্ভব হয়।

ডি ভ্রিসের পরীক্ষায় ইনোথেরা লামার্কিয়ানা হইতে বহু প্রারম্ভিক প্রজাতির উদ্ভব হয়, যথা—

(i) **ইনোথেরা লিভিফোলিয়া** (*Oenothera leavifolia*) : ইহা মসৃণ পাতাযুক্ত।

(ii) **ইনোথেরা ব্রেভিস্টাইলিস** (*Oenothera brevistylis*) ঃ খর্ব গর্ভদণ্ডযুক্ত।

(iii) **ইনোথেরা ন্যান্নেলা** (*Oenothera nannela*) ঃ খর্বাকৃতি কাণ্ড।

(iv) **ইনোথেরা জাইগাস** (*Oenothera gigas*) ঃ বৃহদাকৃতি কাণ্ড।

(v) **ইনোথেরা রুব্রিনার্ভিস** (*Oenothera rubrinervis*) ঃ লাল শিরাযুক্ত। ডি ভ্রিস উপরোক্ত উদ্ভিদগুলিতে স্বপ্রজনন ঘটাইয়া দেখেন যে এই পরিবর্তনগুলি স্থায়ী এবং বংশানুক্রমিক। তিনি ইহাদের নুতন প্রজাতি বলিয়া মনে করেন।

ডি-ভ্রিস ডারউনের সমালোচনা করিয়া বলেন যে সাধারণ ভেদ বা প্রকারণ (variation)-এর ফলে নূতন প্রজাতি সৃষ্টি হইতে পারে না। তাঁহার মতে একমাত্র মিউটেশনই নূতন প্রজাতির সৃষ্টি এবং জৈব অভিব্যক্তির জন্য দায়ী। মিউটেশনের ফলে জীবদেহে যে আকস্মিক ও বিরাট পরিবর্তন দেখা যায় তাহা স্থায়ী এবং বংশানুক্রমিক হইবার ফলে একটি প্রজাতি হইতে অকস্মাৎ অপর একটি প্রজাতির সৃষ্টি হয়। প্রাকৃতিক পরিবেশ এই নূতন প্রজাতি বা মিউটেন্টের অনুকূল হইলে তাহার বংশবৃদ্ধি হয় কিন্তু পরিবেশ মিউটেন্টের প্রতিকূল হইলে তাহা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। এইভাবে পরিবেশের আকস্মিক পরিবর্তনেও মিউটেন্টের লুপ্ত হইবার সম্ভাবনা থাকে।

ডি ভ্রিসের মিউটেশন তত্ত্ব বর্তমান জীববিজ্ঞানীগণ সমর্থন করেন না কারণ তিনি যে সকল উদ্ভিদের উপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন সেগুলি শুদ্ধ (Pure) ছিল না। অতএব তাঁহার পরীক্ষালব্ধ ফলও প্রকৃত মিউটশনের ফল নয়। তবে মিউটেশন বা পরিব্যক্তিকে জীবের ক্রমবিকাশের অন্যতম কারণ মনে করা হয়।

পরিব্যক্তি বা মিউটেশন কিভাবে সংঘটিত হয় সে সম্বন্ধেও ডি ভ্রিসের বিশেষ ধারণা ছিল না। এখন অবশ্য জীববিজ্ঞানের দ্রুত অগ্রগতির সহিত বিভিন্ন প্রকারের মিউটেশনের কথা জানা গিয়াছে, যথা—

(1) জিন মিউটেশন (Gene Mutation)

(2) ক্রোমোজোমীয় মিউটেশন (Chromosomal Mutation)

(3) কৃত্রিম বা আবিষ্ট মিউটেশন (Induced Mutation)

বর্তমানে জীবদেহের উপর এক্স্-রে (X-Ray), গামা রে (Gama Ray),

ডিডিটি (DDT) প্রভৃতি প্রয়োগ করিয়া মিউটেশন ঘটানো হয়। ইহাকে কৃত্রিম (Artificial) বা আবিষ্ট মিউটেশন (Induced Mutation) বলে। বিজ্ঞানী মূলার (Mullar) 1927 খ্রীষ্টাব্দে পরীক্ষাগারে ড্রসোফিলার (Drosophila) উপর এক্স্-রে প্রয়োগ করিয়া বহু নূতন বৈশিষ্ট্যের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। পরবর্তীকালে প্রাকৃতিক প্রজাতিগুলির মধ্যেও ঐ ধরনের বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। ইহা হইতে বিজ্ঞানীগণ অনুমান করেন যে প্রকৃতিতেও মিউটেশন সংঘটিত হয়।

নব-ডারউইনবাদ ও সংশ্লেষবাদ (Neo-Darwinism and Synthetic theory of Evolution) ঃ নব-ডারউইনবাদ এবং অভিব্যক্তির সংশ্লেষবাদ —এই দুইটি শব্দ লইয়া অনেকের মতভেদ আছে। অনেক বিজ্ঞানী মনে করেন নব-ডারউইনবাদই অভিব্যক্তির সংশ্লেষ-বাদ (Synthetic theory) হিসাবে পরিচিত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে নব-ডারউইনবাদ এবং সংশ্লেষবাদ এই দুইটি সম্পূর্ণ পৃথক মতবাদ। বিজ্ঞানী সিম্পসন (Simpson) তাঁহার অভি-ব্যক্তির অর্থ (The Meaning of Evolution) পুস্তকটিতে ইহা লইয়া বিশদভাবে আলোচনা করিয়াছে। তাঁহার মতে নব-ডারউইনবাদ প্রকৃতপক্ষে ওয়েসম্যান (Weisman) ও তাঁহার শিষ্যদের মতবাদ। ওয়েসম্যান এবং তাঁহার শিষ্যেরা নব-ডারউইনবাদ প্রবর্তন করিতে গিয়া ডারউইনবাদকেই পরিবর্তিত করেন। যাহার ফলে 'প্রাকৃতিক নির্বাচন' অংশটি ব্যতীত ডারউইনবাদের অন্যান্য অংশগুলি যথেষ্ট পরিবর্তিত হয়। ডারউইন মনে করিতেন একমাত্র প্রাকৃতিক নির্বাচনের ফলেই অভিযোজন (Adaptation) বা জীবের পরিবেশের সহিত খাপ খাওয়াইয়া লইবার ক্ষমতার উদ্ভব হয়। কিন্তু নব-ডারউইনবাদের প্রবক্তারা মনে করিতেন অভিযোজনের বহু কারণ থাকিতে পারে এবং প্রাকৃতিক নির্বাচন তাহাদের মধ্যে একটি। নব ডারউইনবাদ-এর প্রবক্তাগণ পরিব্যক্তি বা মিউটেশনকেও বিশেষ গুরুত্ব দেন নাই। ইহার ফলে নব ডারউইনবাদ অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। ডারউইনের সময় কোষ ও জিন সম্বন্ধে অজ্ঞতার ফলে প্রাকৃতিক নির্বাচনবাদের যে অংশ-গুলি দুর্বল ছিল তাহাকেই বর্তমান কোষতত্ত্ব ও জিনতত্ত্বের ভিত্তিতে পরিবর্তিত করিয়া সংশ্লেষবাদের সৃষ্টি করা হইয়াছে। অতএব সংশ্লেষবাদকে নব ডারউইন বাদের পরিবর্তিত রূপ না বলিয়া প্রকৃত ডারউইনবাদ-এর পরিবর্তিত রূপ মনে করাই বাঞ্ছনীয়।

অভিব্যক্তির সংশ্লেষবাদ (Synthetic Theory of evolution) **ঃ**

জৈব অভিব্যক্তির পদ্ধতি সম্পর্কে আমাদের বর্তমান ধারণা প্রধানতঃ কোষতত্ত্ব (Cytology) এবং জিন তত্ত্বের (Genetics) উপর নির্ভরশীল। কোষ এবং জিন সম্বন্ধে উন্নত জ্ঞানের ভিত্তিতে ডারউইনের প্রাকৃতিক নির্বাচন-বাদকে মিশ্রিত করিয়া সংশ্লেষবাদ গঠিত হইয়াছে। **ডবজানস্কি** (Dobzansky), **ফিশার** (Fisher), **হলডেন** (Haldane), **রাইট** (Wright), **মেয়ার** (Mayer), **স্টেবিন্স** (Stebins) প্রভৃতি আধুনিক বিজ্ঞানীরা এই সংশ্লেষবাদ-এর সমর্থক।

আধুনিক সংশ্লেষবাদ বা মিশ্রতত্ত্ব জৈব অভিব্যক্তিকে আধুনিক জিনতত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। এই তত্ত্বটিকে নিম্নলিখিতভাবে সংক্ষেপিত করা যায়।

1. জৈব অভিব্যক্তির পদ্ধতিটির প্রাথমিক একককে জীবগোষ্ঠী বা পপুলেশন (Population) বলে।

2. পপুলেশন-এর জিনগত গঠনের পরিবর্তনে ক্ষুদ্র অভিব্যক্তি বা মাইক্রোইভল্যুশন (Micro evolution)-এর প্রাথমিক দশার সৃষ্টি হয়।

3. গোষ্ঠীর জিনগত পরিবর্তন বা মাইক্রোইভল্যুশন সাধারণতঃ প্রজাতির নির্বাচনের ক্ষমতা এবং অবস্থানের উপর নির্ভরশীল। গোষ্ঠীর বিস্তার এবং প্রজাতির স্বতন্ত্রীকরণ (Isolation) অভিব্যক্তিতে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করে।

4. প্রধানতঃ নির্বাচনের দিক ও গোষ্ঠীর যথেচ্ছ পরিবর্তনের মধ্য দিয়া মাইক্রো ইভল্যুশনের দিক নির্নীত হয়।

গোল্ডস্মিথ (Goldshmidt, 1941) মনে করেন, বৃহৎ অভিব্যক্তি (Macro-evolution) এবং ক্ষুদ্র অভিব্যক্তি (Micro-evolution)-এর মধ্যে পার্থক্য আছে। তাঁহার মতে মাইক্রোভল্যুশনের ফলে নূতন প্রজাতির উদ্ভব হওয়া সম্ভব নয়। এইরূপ অভিব্যক্তির ফলে প্রজাতির মধ্যে জিন-পরিব্যক্তি (Gene-mutation) ও জিনের পুনঃসংযোগ পদ্ধতিতে উপজাতি (Subspecies) এবং অন্যান্য প্রকারণের উদ্ভব হয়। তাঁহার মতে নূতন প্রজাতির সৃষ্টি হয় সিস্টেমিক মিউটেশন (Systemic mutation) পদ্ধতিতে। এই পদ্ধতিতে একটি বা দুইটি ধাপে নূতন প্রজাতির সৃষ্টি হয় এবং উহা প্রাকৃতিক নির্বাচনের সম্মুখীন হয়।

অভিব্যক্তির পদ্ধতি (Mechanism of Evolution) **:** জৈব অভিব্যক্তি যে একটি নিশ্চিত ঘটনা ও বৈজ্ঞানিক সত্য তাহা লইয়া বিজ্ঞানীমহলে এখন আর কোনো মতভেদ নাই। জৈব অভিব্যক্তি সম্বন্ধে পূর্বে নানা মতবাদ থাকিলেও এখন অধিকাংশ বিজ্ঞানী আধুনিক সংশ্লেষবাদ (Modern Synthetic Theory)-কেই সমর্থন করেন। বর্তমানকালে কোষতত্ত্ব (Cytology), বংশগতি বিজ্ঞান বা জিনতত্ত্ব (Genetics), পরিসংখ্যানতত্ত্ব (Statistics) প্রভৃতির সাহায্যে অভিব্যক্তির ব্যাখ্যা করা হয়। এখানে অভিব্যক্তির পদ্ধতির প্রধান উপাদানগুলি সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করা হইল।

1. **প্রকারণ ও বংশগতি** (Variation and heredity) **:** ডারউইন জীবের মধ্যে প্রকারণ ও বংশগতি পর্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন কিন্তু তিনি উহা কিরূপে হয় তাহা ব্যাখ্যা করিতে পারেন নাই। জিনতত্ত্বের উদ্ভাবক মেণ্ডেল (Mendel, 1866) মটর গাছের উপর পরীক্ষা করিয়া বংশগতির দুইটি সূত্র উল্লেখ করেন এবং জিন সম্বন্ধে ধারণা পোষণ করেন। কিন্তু যৌন-জননকালে গ্যামেটের মধ্যে কিভাবে ক্রোমোজোমের হ্রাসকরণ হয় তখন তাহা অজ্ঞাত ছিল। পরবর্তীকালে মিয়োসিস (Meiosis) কোষ বিভাজন পদ্ধতিতে জনন কোষ বা গ্যামেট কিভাবে সৃষ্টি হয় তাহা জানা যায়। মিয়োসিস কোষ বিভাজনের সময় কেবল জননকোষে ক্রোমোজোম সংখ্যারই হ্রাস হয়না বরং মাতৃকোষের সমসংস্থ ক্রোমোজোমগুলির মধ্যে খণ্ডক বিনিময় বা ক্রসিং ওভার (Crossing Over) হইবার ফলে জিনের নূতন বিন্যাস ঘটে এবং জনন কোষগুলির মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়। এই জননকোষগুলি যখন মিলিত হইয়া জাইগোট (Zygote) গঠন করে তখন তাহাদের মধ্যেও নূতন বৈশিষ্ট্য দেখা দেয়। এইভাবে মিয়োসিসের সময় ক্রোমোজোমের ক্রসিং ওভারের ফলে প্রকারণের আবির্ভাব ঘটে। অতএব ক্রোমোজোমের ক্রসিং ওভার এবং জিনের পুনঃ সংযোগ জৈব অভিব্যক্তির সহায়ক।

2. **জিন মিউটেশন** (Gene-mutation) **:** হিউগো ডি ভ্রিস সর্বপ্রথম মিউটেশন তত্ত্বটি প্রকাশ করিলেও এখন আর সেটিকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয় না। বর্তমানে মিউটেশন বলিতে জিন মিউটেশনই বুঝায়। জিন বা DNA অণুর রাসায়নিক পরিবর্তন জীবের বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তন ঘটায়। জিনের এই পরিবর্তনকেই জিন মিউটেশন বলে।

দুইটি বিপরীত ধর্মী জিনকে অ্যালীল বা অ্যালিলোমর্ফ (Allelomorph) বলা হয়। একই জিনের একাধিক অ্যালীল থাকিতে পারে, ইহাদের মাল্টিপল অ্যালীল (Multiple allele) বলে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় ড্রসোফিলা (Drosophila) নামক এক প্রকার মাছির সাদা চোখের জিনের অন্ততঃ 14টি অ্যালিল আছে। কোনো কোনো উদ্ভিদের ক্ষেত্রে অ্যালিলের সংখ্যা 200 পর্যন্ত হইতে পারে। জিন মিউটেশনের ফলেই একটি স্বাভাবিক জিন হইতে তাহার বিভিন্ন মিউট্যাণ্ট (Mutant) এর উদ্ভব হয়। বিভিন্ন পদ্ধতিতে গবেষণাগারে যেমন বহু মিউট্যাণ্ট সৃষ্টি করা যায় আবার প্রকৃতিতেও প্রচুর সংখ্যক মিউট্যাণ্ট দেখা যায়। তবে অধিকাংশ মিউটেশনের ফলই মারাত্মক যাহার ফলে সকল মিউট্যাণ্টগুলি প্রাকৃতিক নির্বাচনে নির্বাচিত হয় না।

এইচ, জে, মূলার (H. J. Muller, 1927) গবেষণার সাহায্যে প্রদর্শন করেন যে ড্রসোসিলার গোনাডে (শুক্রাশয়ে অথবা ডিম্বাশয়ে) এক্স-রে (X-ray) প্রয়োগ করিলে যে মিউটেশন হয় তাহা স্বাভাবিক অপেক্ষা কয়েক শত গুণ বেশী। বর্তমানে এক্স্-রশ্মি ব্যতীত গামা রশ্মি (Gama-ray), অতিবেগুনী-রশ্মি (Ultraviolet-ray), বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্য (Chemical substances) প্রভৃতির সাহায্যে মিউটেশন ঘটান যায় সেইজন্য এই সকল বস্তুকে মিউটাজেনস (Mutagens) বলে।

3. **পরিব্যক্তি ও প্রাকৃতিক নির্বাচন** (Mutation and Natural selection)ঃ বিভিন্ন প্রকারের মিউটেশন পর্যবেক্ষণ করিয়া বিজ্ঞানীগণ সিদ্ধান্ত করেন যে প্রকৃতিতে মিউটেশন স্বতঃস্ফূর্তভাবে উদ্ভব হয় এবং পরিবেশ উহার দিক নির্দেশ করে না। পরিবেশ মিউটেশনের হার প্রভাবিত করিতে পারে কিন্তু কোন্ জীবে কোন্ মিউটশনের উদ্ভব হইবে পরিবেশ তাহা নির্ধারণ করিয়া দেয় না। একটি মিউট্যাণ্ট জিন কয়েক প্রজন্ম ধরিয়া একই প্রজাতিতে সঞ্চারিত হইতে থাকে, অনুকূল পরিবেশে ঐ বৈশিষ্ট্যটিকে প্রকৃতি নির্বাচন করিতে পারে আবার প্রতিকূল পরিবেশে ঐ মিউট্যাণ্ট জিনটি পরিবর্তিত হইয়া স্বাভাবিক অবস্থায় আসিতে পারে। প্রাকৃতিক নির্বাচন কাহাকেও বিশেষ পক্ষপাতিত্ব করেনা এবং যে সকল প্রজাতি পরিবেশের সহিত অভিযোজিত হইবার ক্ষমতা রাখে কেবল তাহারাই প্রতিযোগিতায় সাফল্য-

লাভ করে। প্রাকৃতিক পরিবেশে যে কোনো গোষ্ঠীর অধিকাংশ জীবই স্বাভাবিক জিন বহন করে এবং কম সংখ্যক জীবে পরিব্যক্ত বা মিউট্যাণ্ট জিন থাকে। পরিবেশের পরিবর্তন ঘটিলে এই সকল মিউট্যাণ্টগুলি যদি নূতন পরিবেশে অভিযোজিত হয় তাহা হইলে তাহারাই বাঁচিয়া থাকে, অন্যেরা ধীরে ধীরে অবলুপ্ত হয়।* প্রাকৃতিক নির্বাচন একটি সৃজনশীল বল যাহা অভিব্যক্তির পথ নির্দেশক উপাদান (Guiding factor) হিসাবে কাজ করে। অন্যদিকে পরিব্যক্তি বা মিউটেশন এবং প্রকারণ উহার উৎস বা কাঁচামাল (Raw material) সরবরাহ করে। এইভাবে পরিব্যক্তি ও প্রাকৃতিক নির্বাচনের সমন্বয়ে নূতন প্রজাতির সৃষ্টি হয় এবং জীবের ক্রমবিকাশ ঘটে।

4. **স্বতন্ত্রীকরণ বা বিচ্ছিন্নকরণ (Isolation)** ঃ ডবজানস্কি (Dobzhansky) তাঁহার 'জেনেটিক্স অ্যাণ্ড দি অরিজিন অফ স্পিসিজ (Genetics and the Origin of Species) নামক পুস্তকে উদ্ভিদ ও প্রাণীর স্বতন্ত্রীকরণ বা বিচ্ছিন্নকরণ (Isolation) কে প্রজাতির উদ্ভবের প্রধান কারণরূপে উল্লেখ করেন। তাঁহার মতে একই প্রজাতির বিভিন্ন উপজাতি এবং নিকট সম্পর্কীয় প্রজাতি যে পদ্ধতিতে পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া নূতন প্রজাতি গঠনে সাহায্য করে তাহাকে বিচ্ছিন্নকরণ পদ্ধতি (**Isolating mechanism**) বলে। মেয়ার (Mayr, 1948) এই পদ্ধতিকে নিম্নলিখিত কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করেন।

(i) **ব্যাপক বিস্তৃতির সীমাবদ্ধতা** (Restriction of random dispersal) ঃ বিভিন্ন প্রকার ভৌগোলিক বাধা থাকায় উপযুক্ত সঙ্গীরা পরস্পরের সহিত মিলিত হইতে পারে না। পর্বত, মরুভূমি, জলাশয় প্রভৃতি প্রাকৃতিক উপাদানগুলি প্রাণীর ব্যাপক বিস্তৃতিকে বাধাদান করে।

(ii) **ব্যাপক মিলনের সীমাবদ্ধতা** (Restriction of random mating) ঃ উপযুক্ত সঙ্গী থাকিলেও বিভিন্ন কারণে যৌন মিলন সম্ভব হয় না। ভিন্ন ভিন্ন বাসস্থান নির্বাচন, স্ত্রী-পুরুষের মিলনকাল ভিন্ন ঋতুতে

---

* ডডসন-এর মতে যে সকল জীব নূতন পরিবেশে অভিযোজিত হইতে পারে না তাহাদের মৃত্যুর হার বেশী হয় এবং প্রজনন হারও কমিয়া যায়। এইভাবে তাহারা ধীরে ধীরে পরিবেশ হইতে অবলুপ্ত হইয়া যায়।

হওয়া, বিভিন্ন প্রজাতির স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে আকর্ষণের অভাব, দৈহিক অসামঞ্জস্য প্রভৃতি নানা কারণে ব্যাপক মিলন সম্ভব হয় না।

(iii) **গর্ভাধানের স্বল্প সম্ভাবনা** (Reduction of fertility) : ইহার ফলে স্ত্রী ও পুরুষ প্রাণীর মধ্যে যৌনমিলন ঘটিলেও গর্ভাধান ঘটেনা অথবা পরবর্তী প্রজন্মের বিকাশ হয় না। সাধারণতঃ এই ধরণের সঙ্কর মিলনে উৎপন্ন জাইগোটগুলির মৃত্যুর হার অধিক হয় এবং সঙ্কর জীবের জননকোষ সৃষ্টির ক্ষমতা কম থাকে বলিয়া বিচ্ছিন্নকরণ সম্ভব হয়।

(iv) **ক্রোমোজোমীয় পুনর্বিন্যাস** (Chromosomal rearrangement) : বর্তমানে ক্রোমোজোমের পুনর্বিন্যাসকেও বিচ্ছিন্নকরণের অন্যতম কারণ মনে করা হয়। ইহার ফলে ইহারা মূল প্রজাতি হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া নূতন প্রজাতি গঠন করিতে পারে।

অভিব্যক্তির আধুনিক ধারণা (Modern concept of Evolution) :

বিজ্ঞানী স্টেবিন্স (Stebbins) 1974 খ্রীষ্টাব্দে জৈব অভিব্যক্তির পর্যে... পাঁচটি মূল শর্তের উল্লেখ করেন। এই শর্তগুলি যথাক্রমে—

(i) জিন-মিউটেশন (Gene mutation)।

(ii) ক্রোমোজোমের সংখ্যাগত এবং প্রকৃতিগত পরিবর্তন (Change in the number and nature of chromosomes)।

(iii) জিন ঘটিত পুনঃসংযুক্তি (Gene-recombinations)।

(iv) জনন ঘটিত স্বাতন্ত্র (Reproductive Isolation)।

(v) প্রাকৃতিক নির্বাচন (Natural Selection)।

স্টেবিন্সের মতে উপরোক্ত শর্তগুলির মধ্যে প্রথম তিনটি প্রকারণ (variation)-এর সৃষ্টিতে প্রধান ভূমিকা পালন করে এবং শেষের দুইটি অভিব্যক্তি পদ্ধতির নির্দেশক (Guide) হিসাবে কাজ করে।

জৈব অভিব্যক্তিতে উপরোক্ত শর্তগুলির মধ্যে কোন্টি কি ভূমিকা পালন করে তাহা ব্যাখ্যা করিবার জন্য স্টেবিন্স একটি সহজ দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেন। তিনি সমগ্র অভিব্যক্তিতে জীবপ্রবাহকে একটি চলমান মোটর গাড়ীর সহিত তুলনা করেন এবং উহার বিভিন্ন অংশকে জৈব অভিব্যক্তির বিভিন্ন উপাদানের সহিত তুলনা করেন। তুলনাটি এইরূপ—

(1) গাড়ীর ইঞ্জিন—জিনঘটিত পুনঃসংযোগ

(2) গাড়ীর পেট্রল—জিন মিউটেশন

(3) গাড়ীর অ্যাকসিলারেটর—ক্রোমোজোমের পরিবর্তন

(4) গতি নিয়ন্ত্রক ও নির্দেশ চিহ্ন –জনন ঘটিত স্বাতন্ত্র্য

(5) গাড়ীর চালক—প্রাকৃতিক নির্বাচন

উপরোক্ত তুলনামূলক চিত্রটি লক্ষ্য করিলে জৈব অভিব্যক্তি সম্বন্ধে আধুনিক বিজ্ঞানীদের ধারণার কিছু আভাস পাওয়া যায়। আধুনিক কোষ-তত্ত্ব (Cytology), জিনতত্ত্ব (Genetics), পরিসংখ্যানতত্ত্ব (Statistics), প্রভৃতির সাহায্যে জৈব অভিব্যক্তির জটিল পদ্ধতি ব্যাখ্যা করা সম্ভবপর হইয়াছে।

প্রাকৃতিক নির্বাচন-এর পদ্ধতি (Natural Selection in action) **:** প্রাকৃতিক নির্বাচন কিভাবে কার্যকরী হয় তাহা ডারউইন সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করিতে পারেন নাই। বর্তমানে অবশ্য প্রাকৃতিক নির্বাচনের পদ্ধতি বিভিন্ন উদাহরণের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা সম্ভব। বিভিন্ন জীবাণুর পেনিসিলিন প্রতিরোধক মিউট্যাণ্ট গঠন, ডিডিটি প্রতিরোধক কীটপতঙ্গ, বিষ-প্রতিরোধক প্রাণী প্রভৃতি জীবগোষ্ঠীতে প্রাকৃতিক নির্বাচন সহজেই লক্ষ্য করা যায় তবে প্রাকৃতিক নির্বাচনের পদ্ধতি সর্বাপেক্ষা সুন্দরভাবে পর্যবেক্ষণ করা হইয়াছে একপ্রকার পেপার্ড মথের ক্ষেত্রে।

শিল্পাঞ্চলে বর্ণ বিকাশ (Industrial melasnism) **:** পূর্ববর্তীকালে বিজ্ঞানী হলডেন (Haldane 1927) এবং পরবর্তীকালে ইংলণ্ডের বিজ্ঞানী বার্নার্ড কেটলওয়েল (Bernard Kettlewell 1957) এবং তাঁহার সহকর্মীরা এই পেপার্ড মথের উপর প্রচুর গবেষণা করেন। পেপার্ড মথ বা **বিস্টন বেটুলারিয়া** (*Biston betularia*) ইংলণ্ডে প্রচুর সংখ্যায় দেখা যায়। ইহারা সাধারণত গাছের ডালে বা কাণ্ডের উপর বসে, যাহাতে ইহাদের দেহের বর্ণ পরিবেশের সহিত মিশিয়া যায়। স্বাভাবিক মথের দেহ অপেক্ষাকৃত হাল্কা বর্ণের। এই স্বাভাবিক মথের একটি মিউট্যাণ্ট গঠন দেখা যায় যেগুলি অপেক্ষাকৃত গাঢ় (কালো) বর্ণের। ইহাদের মেলানিক (Melanic) বলে। ইহা সাধারণত **বিসটন কার্বোনেরিয়া** (*Biston carbonarea*) নামে পরিচিত। এই ধরণের মেলানিক মথ ম্যানচেষ্টার অঞ্চলে 1848 খ্রীষ্টাব্দে

প্রথম লক্ষ্য করা হয়। ইহার পরবর্তীকালে এই ধরণের (মেলানিক) মথের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাইতে থাকে। কেটলওয়েলের গবেষণা হইতে জানা যায় যে ইংলণ্ডের শিল্প প্রধান অঞ্চলগুলিতে মেলানিক মথের প্রাধান্য দেখা যায় কিন্তু অন্যান্য অঞ্চলে স্বাভাবিক মথেরই প্রাধান্য থাকে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় ম্যানচেষ্টার অঞ্চলে (শিল্পাঞ্চল) মেলানিক মথের সংখ্যা শতকরা প্রায় 95 ভাগ আবার উত্তর স্কটল্যাণ্ড এবং দক্ষিণ-পূর্ব ইংলণ্ডে স্বাভাবিক মথের সংখ্যা শতকরা প্রায় 100 ভাগ।

পেপার্ড মথের এইরূপ ভৌগলিক বিস্তার প্রাকৃতিক নির্বাচন পদ্ধতির সাহায্যে সহজেই ব্যাখ্যা করা যায়। পর্যবেক্ষণ করিয়া দেখা গিয়াছে যে পেপার্ড মথের প্রধান শত্রু থ্রাশ জাতীয় পাখী (Thrush bird) মথগুলিকে গাছের কাণ্ডের উপর বসা অবস্থায় আক্রমণ করে ও খাইয়া ফেলে। স্বাভাবিক মথগুলি সাধারণ গাছের লাইকেন যুক্ত কাণ্ডের উপর বসিলে ইহারা পরিবেশের সহিত এমনভাবে মিশিয়া যায় যে সহজে ইহাদের লক্ষ্য করা যায় না, কিন্তু এইরূপ গাছের কাণ্ডে মেলানিক মথকে সহজেই লক্ষ্য করা যায়। অন্যদিকে শিল্পাঞ্চলের কয়লায় কালো হইয়া যাওয়া গাছের কাণ্ডের উপর মেলানিক মথ বসিলে বুঝিতে পারা যায় না কিন্তু স্বাভাবিক মথ বসিলে সহজেই ধরা যায়।

শিল্পাঞ্চল গঠিত হইবার পূর্বে ইংলণ্ডে স্বাভাবিক পেপার্ড মথের আধিক্য ছিল তবে তাহার মধ্যে কয়েকটি মেলানিক মথও ছিল। কিন্তু শিল্পাঞ্চল বিস্তারের সহিত মেলানিক মথগুলি প্রাকৃতিক নির্বাচনে জয়ী হইল এবং ঐ অঞ্চলে বিস্তার লাভ করিল। এইভাবে এক শতাব্দীর মধ্যেই পেপার্ড মথের দুটি রূপ বিভিন্ন ভৌগলিক পরিবেশ ছড়াইয়া পড়িল। ইহা প্রাকৃতিক নির্বাচন কিভাবে কার্যকরী হয় তাহার একটি অনন্য উদাহরণ।

শিল্পাঞ্চলে বর্ণবিকাশ (Industrial Melanism)-এর রেখাচিত্র

বৎসর	বিস্টন বেটুলিরিয়া	বিস্টন কার্বোনেরিয়া	পরিবেশ
1848	100%	কয়েকটি	শিল্পের সূত্রপাত
1910	50%	50%	শিল্পের উন্নতি
1957	কয়েকটি	100%	সম্পূর্ণ শিল্পাঞ্চল

প্রাকৃতিক নির্বাচন ও গোষ্ঠী জিনতত্ত্ব (Natural selection and Population Genetics) : কোনো জীবের অভিব্যক্তিগত পরিবর্তন সৃষ্টি করিতে অথবা নূতন প্রজাতি সৃষ্টি করিতে প্রাকৃতিক নির্বাচন একটি-দুটি জিনের উপর ক্রিয়া না করিয়া সমগ্র জীবগোষ্ঠীর জিনের উপর ক্রিয়া করে, ইহাকেই **গোষ্ঠী জিনতত্ত্ব** (Population Genetics) বলে।

কোনো জীব গোষ্ঠীর জিনগত বিচ্ছিন্ন এককে বর্তমানে **ডীম** (Deme) বলা হয়, যথা—একটি পুকুরের মধ্যে কার্পমাছ, গর্তের মধ্যে প্যারামেশিয়াম, সমুদ্রোপকূলের নারিকেল গাছ প্রভৃতি। একটি নির্দিষ্ট ডীম-এর জীবগোষ্ঠীর মধ্যে অন্তঃপ্রজনন ঘটে এবং সেইভাবে ইহার বংশবিস্তার হয়। সেইজন্য ইহাকে একটি **জিনগত একক** (Genetic unit) বলা যায়। একটি ডীম-এর জিনগত গঠন (Genetic constitution) অর্থাৎ সেই জীবগোষ্ঠীর সকল জিনকে একত্রে **জিন ভাণ্ডার** বা **জিন পুল** (Gene pool) বলা হয়। একটি নির্দিষ্ট জীবের ভবিষ্যৎ যেমন তাহার জিনসমূহের গঠন ও অবস্থানের [illegible] নির্ভর করে, ঠিক একইভাবে একটি জীবগোষ্ঠী বা ডীম-এর ভবিষ্যৎও [illegible] জিন পুল-এর উপর নির্ভরশীল।

[illegible]টি গোষ্ঠীর মধ্যে কোনো একটি জিন-এর বংশ পরম্পরায় সঞ্চারিত [illegible] প্রবণতাকে **জিন-প্রবণতা** বা **জিন-ফ্রিকোয়েনসি** (Gene frequency) বলে, যদিও গোষ্ঠীর মধ্যে ঐ জিনের একাধিক অ্যালীল থাকে। 1908 খ্রীষ্টাব্দে হার্ডি এবং উইনবার্গ (G. H. Hardy and W. Weinberg) গণিতের সাহায্যে প্রদর্শন করেন যে কোনো জিন-এ মিউটেশন বা নির্বাচন না হইলে একটি জীবগোষ্ঠীর জিন প্রবণতা প্রজন্মের পর প্রজন্ম একই থাকিয়া যায়। ইহাকে **হার্ডি-উইনবার্গ তত্ত্ব** (Hardy-Weinberg principle) বলে। অন্তঃপ্রজননের ফলে একই জীব-গোষ্ঠীর মধ্যে জিনের চলাচল হইতে থাকে ইহাকে **জিন প্রবাহ** বা **জিন ফ্লো** (Gene flow) বলে। তবে সামগ্রিকভাবে জীবগোষ্ঠীর মধ্যে জিনের প্রবণতা নির্দিষ্ট থাকে। জীবগোষ্ঠীর মধ্যে জিন-এর এই সাম্যাবস্থাকে **জিন-সাম্য** বা **জেনেটিক ইকুইলিব্রিয়াম** (Genetic equillibrium) বলে। এই অবস্থায় একটি ডীম অপরিবর্তিত অবস্থায় থাকে এবং তাহার অভিব্যক্তি দেখা যায় না। তবে মিউটেশন, পরিবেশের পরিবর্তন ও প্রাকৃতিক নির্বাচনের ফলে জিনের সাম্যাবস্থা নষ্ট হইয়া যায়। পরিবেশের পরিবর্তনে **নির্বাচন চাপ** (Selection pressure)-

এর পরিবর্তন ঘটে যাহা একটি বিশেষ জিনকে অথবা কয়েকটি জিনকে প্রভাবিত করিয়া তাহার প্রবণতাকে বর্ধিত করে। এইভাবে নূতন পরিবেশে নূতন জিন প্রবণতা বৃদ্ধি পায় এবং গোষ্ঠীর জিনগত পরিবর্তনের ফলে নূতন জীবগোষ্ঠীর ক্রমবিকাশ হয়।

উপরোক্ত পদ্ধতি ছাড়াও অন্যভাবে জিনের সাম্যাবস্থা নষ্ট হইতে পারে। প্রথমত কোনো কারণে একটি গোষ্ঠীর মধ্যে একটি বিশেষ জিন হারাইয়া যাইতে পারে। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে কোনো একটি ক্ষুদ্র জীবগোষ্ঠীর মধ্যে একটি নির্দিষ্ট জিন বিশিষ্ট কোনো জীবই ঠিকমত প্রজনন করিতে পারিল না। ইহার ফলে ঐ নির্দিষ্ট জিনটি গোষ্ঠী হইতে অচিরেই লুপ্ত হইয়া গেল অর্থাৎ পরবর্তী প্রজন্মে ঐ বৈশিষ্ট্যটি আর গোষ্ঠীর মধ্যে দেখা যায় না। অবশ্য এই ধরণের জিনের অবলুপ্তি একটি চরম দৃষ্টান্ত যাহা সচরাচর প্রকৃতিতে ঘটে না। তবে একটি ক্ষুদ্র জীবগোষ্ঠীতে একটি বিশেষ জিনের সংখ্যা কোনো কারণে (প্রজননগত, পরিবেশগত অথবা সুযোগের অভাবে) বিশেষভাবে হ্রাস পাইতে পারে, যাহার ফলে ঐ জিনের প্রবণতাও হ্রাস পায়। ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর মধ্যে জিন প্রবণতার এই পরিবর্তনকে **জিন সঞ্চরণ** বা **জেনেটিক ড্রিফট** (Genetic drift) বলে। অবশ্য বৃহৎ জীবগোষ্ঠীতে এই ধরণের ঘটনার সুযোগ কম, সাধারণত ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর মধ্যে এই ধরনের জিন সঞ্চরণের ফলে গোষ্ঠীর মধ্যে পরিবর্তন দেখা যায়।

কোনো একটি গোষ্ঠী পার্শ্ববর্তী গোষ্ঠী হইতে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন (isolated) হয় না। কখনও কখনও দুইটি গোষ্ঠীর মধ্যে অন্তঃপ্রজনন সম্পন্ন হয় যাহার ফলে একটি গোষ্ঠী অপর গোষ্ঠী হইতে কোনো জিন লাভ করে বা কোনো জিনের বিলুপ্তি ঘটে। কখনও কখনও পাশ্ববর্তী দুইটি পৃথক জীবগোষ্ঠী পরস্পরের সহিত মিলিত হইয়া একটি পৃথক গোষ্ঠী গঠন করে যাহার মধ্যে নূতন জিনভাণ্ডার বা জিনপুল দেখা যায়।

এইভাবে মিউটেশন, পরিবেশের পরিবর্তন, প্রাকৃতিক নির্বাচন ও বিচ্ছিন্নকরণের ফলে নূতন প্রজাতির উদ্ভব হয়।

সারাংশ

জৈব অভিব্যক্তি একটি নিশ্চিত ঘটনা কিন্তু জৈব অভিব্যক্তির পদ্ধতি সম্পর্কে মতভেদ আছে। বর্তমানে জৈব অভিব্যক্তি সম্বন্ধে নিম্নলিখিত মতবাদগুলি অন্যতম।

(ক) **লামার্কবাদ বা অর্জিতগুণের বংশানুক্রমণ**—পরিবেশের প্রভাবে জীবদেহে যে পরিবর্তন আসে, লামার্কের মতে জীবের জীবনকালে সেই অর্জিত বৈশিষ্ট্যগুলি বংশ পরম্পরায় সঞ্চারিত হয় এবং এইভাবে নতুন প্রজাতির সৃষ্টি হয়। তবে আধুনিক বিজ্ঞানীগণ বিভিন্ন পরীক্ষার সাহায্যে লামার্কবাদকে ভ্রান্ত প্রমাণ করেন।

(খ) **ডারউইনবাদ বা প্রাকৃতিক নির্বাচনবাদ**—চার্লস ডারউইন-এর মতে সকল জীবের মধ্যে অত্যধিক হারে বংশবৃদ্ধির প্রবণতা থাকে, কিন্তু আহার ও বাসস্থান সীমিত থাকায় তাহাদের মধ্যে জীবন রক্ষার জন্য সংগ্রাম দেখা যায়। অপরদিকে একই পিতামাতার সন্তানদের মধ্যেও প্রকারণ বা বৈচিত্র্য দেখা যায়। যে সকল প্রকারণ জীবকে পরিবেশের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া বাঁচিয়া থাকিতে সাহায্য করে তাহাই বংশগতিতে সঞ্চারিত হয় এবং অন্যগুলি লুপ্ত হয়। পরিবেশের পরিবর্তন ঘটিলে নূতন বৈশিষ্ট্যযুক্ত জীব প্রকৃতি কর্তৃক নির্বাচিত হয় এবং নূতন প্রজাতির উদ্ভব হয়।

ডারউইনবাদ-এর কিছু কিছু ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও এই মতবাদই এখন অধিকতর গ্রহণযোগ্য।

(গ) **ডি ভ্রিস-এর মিউটেশন তত্ত্ব**—ডি ভ্রিস ইনোথেরা লামার্কিয়ানা নামক উদ্ভিদের প্রজনন পরীক্ষা করিবার সময় কয়েকটি উদ্ভিদে আকস্মিক এবং বৃহৎ পরিবর্তন লক্ষ্য করেন। এই পরিবর্তনগুলি স্থায়ী এবং বংশানুক্রমিক। তিনি এই পদ্ধতিকে পরিব্যক্তি বা মিউটেশন বলেন, তাঁহার মতে সাধারণ প্রকারণ এর ফলে নূতন প্রজাতির সৃষ্টি হইতে পারে না। একমাত্র মিউটেশনই নূতন প্রজাতির সৃষ্টি এবং জৈব অভিব্যক্তির জন্য দায়ী। বর্তমানে ডি ভ্রিসের মিউটেশন তত্ত্বটি সকল বিজ্ঞানী স্বীকার করেন না যদিও তাঁহার প্রবর্তিত মিউটেশন শব্দটি এখন বহুল প্রচলিত।

(ঘ) **নব ডারউইনবাদ ও আধুনিক সংশ্লেষবাদ**—বর্তমানে জীববিদ্যার বিভিন্ন শাখার দ্রুত অগ্রগতির সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া ডারউইনবাদের যে

পরিমার্জন ও পরিবর্ধন করা হইয়াছে তাহাকেই নব ডারউইনবাদ বা আধুনিক সংশ্লেষবাদ বলা হয়। বর্তমানে প্রকারণ ও বংশগতি, জিন মিউটেশন, বিচ্ছিন্নকরণ, প্রাকৃতিক নির্বাচন প্রভৃতিকে জৈব অভিব্যক্তির প্রধান কারণ হিসাবে অভিহিত করা হয়।

ইংলণ্ডের পেপার্ড মথ এর উপর গবেষণা করিয়া বিজ্ঞানীগণ প্রাকৃতিক নির্বাচনের পদ্ধতিটিও সহজভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

বর্তমান বিজ্ঞানীদের ধারণা নূতন প্রজাতি সৃষ্টি করিতে প্রাকৃতিক নির্বাচন একটি বা দুটি জিনের উপর ক্রিয়া না করিয়া ঐ অঞ্চলের একটি জীবগোষ্ঠীর উপর ক্রিয়া করে। ইহার ফলে ঐ অঞ্চলের জিনপুল-এর পরিবর্তন ঘটে এবং নূতন প্রজাতির উদ্ভব হয়।

অনুশীলনী

(সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও)

1. লামার্কবাদ কি? সংক্ষেপে লামার্কবাদ আলোচনা কর।
2. 'অর্জিত গুণের বংশানুক্রমণ'—কাহার মতবাদ? ইহার স্বপক্ষে এবং বিপক্ষে কি কি যুক্তি আছে?
3. লামার্কবাদ-এর বর্তমান রূপটি কি?—আলোচনা কর।
4. চার্লস্ ডারউইন-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী লেখ।
5. প্রাকৃতিক নির্বাচন কাহার মতবাদ? এই মতবাদটি সংক্ষেপে আলোচনা কর।
6. জিরাফের লম্বা গলার উৎপত্তির ব্যাখ্যা লামার্ক এবং ডারউইন কিভাবে করেন তাহা উল্লেখ কর।
7. ডারউইনের মতবাদটির সপক্ষে এবং বিপক্ষে কি কি যুক্তি আছে? নব ডারউইনবাদ কাহাকে বলে?
8. ডি ভ্রিস-এর মিউটেশন তত্ত্বটি সংক্ষেপে আলোচনা কর।
9. নব ডারউইনবাদ ও সংশ্লেষবাদ বলিতে কি বোঝায়?
10. জৈব অভিব্যক্তির পদ্ধতি সম্বন্ধে আধুনিক ধারণা কিরূপ তাহা উল্লেখ কর।
11. শিল্পাঞ্চলে বর্ণবিকাশ বা ইণ্ডাস্ট্রিয়াল মেলানিজম (Industrial melanism) কিভাবে প্রাকৃতিক নির্বাচনবাদকে সমর্থন করে তাহা উল্লেখ কর।
12. সংক্ষিপ্ত টীকা লেখ:

    (ক) ব্যবহার ও অব্যবহার সূত্র (খ) অর্জিত গুণের বংশানুক্রমণ (গ) অরিজিন অফ স্পিসিজ (ঘ) জীবন সংগ্রাম (ঙ) যোগ্যতমের জয় (চ) প্যানজেনেসিস তত্ত্ব

(ছ) জার্মপ্লাজম তত্ব (জ) ইনোখেরা লামার্কিয়ানা (ঝ) জিন মিউটেশন (ঞ) বিচ্ছিন্নকরণ (চ) প্রকারণ ও বংশগতি (ছ) বিষ্টন বেটুলেরিয়া।

13. গোষ্ঠী জিনতত্ব কাহাকে বলে? কিভাবে একটি গোষ্ঠী হইতে নূতন গোষ্ঠীর উদ্ভব হয়?

14, নিম্নলিখিত শব্দগুলিকে ব্যাখ্যা কর—

(ক) জিনপুল (খ) জিন-ফ্রিকোয়েন্সি (গ) জিন-সাম্য (Genetic equillibrium) (ঘ) জিন-সঞ্চরণ (Genetic drift) ও (ঙ) হার্ডি-উইনবার্গ তত্ব।

গ্রন্থপঞ্জী ও নির্দেশিকা (Reference)

1. Darwin, Charles, 1859: "On the Origin of Species by Means of Natural Selection, or the Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life." Modern Library, New York.
2. Dobzhansky 1951: The Genetics and the Origin o Species. Columbia University Press, Newyork.
3. Colbert E.H. 1955: Evolution of the vertebrates
4. Dodson E.O. 1968: Evolution, Process and Product Reinhold Publishing Corpn. Newyork
5. Lull R.S. 1976: Organic Evolution, Macmillan Co. Newyork
6. Moody P.A. 1964: Introduction to Evolution, Harper and Row, Newyork
7. B.S.C.S. 1963: Molecules to Man (Blue version), Houghton Mifflin Co. Boston
8. Simpson G.G. 1967: The Meaning of Evolution. Yale Universsity Press
9. Dowdeswell, W.H. 1975: The Mechanism of Evolution, 4th ed. Heinemann Educational Books
10. Stebbins G.L. 1971: Processes of Organic Evolution. 2nd ed. Prentice Hall

11. Roberts M.B.V. 1976 : Biology, A Functional Approach Nelson (2nd. ed.)

12. তারাপদ চট্টোপাধ্যায় ও সুমন্ত মুখোপাধ্যায়, ১৯৮০, প্রাণীবিদ্যা নিউ বুক স্টল, কলিকাতা।

13. অরূপ কুমার সিংহ ও সীমানন্দ অধিকারী, ১৯৮২ : সমকালীন প্রাণীবিদ্যা, নিউ সেণ্ট্রাল বুক এজেন্সী, কলিকাতা।

14. অসীমকুমার চট্টোপাধ্যায় ও অরুণকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রাণীবিদ্যা, ১৯৮১ : নির্মলা লাইব্রেরী, কলিকাতা।

15. মুখোপাধ্যায়, মেদ্দা, মেদ্দা, মুখোপাধ্যায় ১৯৮০ : জীববিজ্ঞান নিউ বুক স্টল, কলিকাতা।

ষষ্ঠ অধ্যায়

প্রাণীর ভৌগোলিক বিস্তার (Geographical distribution of animals)

পৃথিবীতে জীবনের বিস্তার সর্বত্র। এমন কোনো অঞ্চল নাই যেখানে উদ্ভিদ অথবা প্রাণী দেখিতে পাওয়া যায় না। সুউচ্চ পর্বত, ঘন অরণ্য, তপ্ত মরুভূমি, শীতল মেরু প্রদেশ, গভীর সমুদ্র—সর্বত্রই নানা প্রকার উদ্ভিদ ও প্রাণীর বাস।

কিন্তু পৃথিবীর উপরিভাগ ভালভাবে লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে পৃথিবীতে প্রাণীর বিস্তার একপ্রকার বা অবিচ্ছিন্ন (Continuous) নয়। সাধারণত যে সকল স্থানের জলবায়ু একপ্রকার হয় সেই সকল স্থানের প্রাণীও একপ্রকার হয় কিন্তু কোনো কোনো ক্ষেত্রে ইহার বিপরীতও দেখা যায়। উদাহরণস্বরূপ আফ্রিকায় হাতী, গরিলা, শিম্পাজী প্রভৃতি পাওয়া যায় কিন্তু ব্রাজিলের জলবায়ু একপ্রকার হওয়া সত্ত্বেও সেখানে উপরোক্ত প্রাণী পাওয়া যায় না। কিন্তু সেখানে টাপির, শ্লথ ও বাঁকান লেজ যুক্ত বানর পাওয়া যায়। একইভাবে ইংলণ্ড এবং জাপানের দূরত্ব যথেষ্ট হওয়া সত্ত্বেও তাহাদের প্রাণীকূল বা ফনা (Fauna) প্রায় একপ্রকারের। অন্যদিকে মালয়দেশের দুইটি দ্বীপ বালি এবং লম্বক মাত্র 15 মাইল দূরে অবস্থিত কিন্তু এই দুইটি দ্বীপের প্রাণী সম্পূর্ণ ভিন্ন। ইহা হইতে অনুমান করা হয় যে প্রাণীগণ খাদ্য ও আশ্রয়ের সন্ধানে বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়াইয়া পড়ে কিন্তু পরবর্তীকালে বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে কিছু বাধা (Barrier) সৃষ্টি হওয়ায় তাহারা এক গোষ্ঠী হইতে অন্য গোষ্ঠীতে পৃথক হইয়া যায়।

প্রাণীর ভৌগোলিক বিস্তারের প্রধান কারণ খাদ্য এবং আশ্রয়ের সন্ধান। অত্যধিক বংশবৃদ্ধির ফলে বিভিন্ন প্রাণীর মধ্যে যে জীবন সংগ্রাম দেখা দেয় তাহারই ফলস্বরূপ প্রাণীকে খাদ্য ও আশ্রয়ের সন্ধানে কোনো নূতন অঞ্চলে যাইতে হয়। এইভাবেই প্রাণী ভৌগোলিক বিস্তার লাভ করে। কিন্তু পরিবেশের পরিবর্তন এবং দুইটি অঞ্চলের মধ্যে প্রাকৃতিক বাধা সৃষ্টি হইবার

ফলে দুইটি অঞ্চলের প্রাণিকূল পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। এইভাবে প্রতিটি অঞ্চলে তাহার নিজস্ব ধরনের উদ্ভিদ ও প্রাণী দেখা যায়।

ভৌগোলিক বিস্তারের প্রতিবন্ধক বা বাধা (Barriers to Dispersal) : প্রাণীর ভৌগোলিক বিস্তারে বিভিন্ন প্রকারের প্রতিবন্ধক বা বাধা আছে। এই সকল বাধাগুলিকে নিম্নলিখিত কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করা যায়—যথা স্থান-বিবরণঘটিত বাধা, জলবায়ুঘটিত বাধা, উদ্ভিদঘটিত বাধা, বৃহৎ জলাশয়ের বাধা, লবণাক্ত জলের বাধা প্রভৃতি।

(1) **স্থান বিবরণঘটিত বাধা** (Topographic barriers) : সাধারণতঃ সুউচ্চ পর্বতমালা স্থলচর প্রাণীদের ভৌগোলিক বিস্তারে বিশেষ বাধা সৃষ্টি করে। আবার এই পর্বতমালা যদি বিষুবরেখার সমান্তরাল হয় তবে উহার উত্তরদিকের ও দক্ষিণদিকের প্রাণীদের মধ্যে প্রচুর বৈসাদৃশ্য দেখা যায়। উদাহরণস্বরূপ ভারতের উত্তরে অবস্থিত হিমালয় পর্বতমালা বিশাল, সুউচ্চ এবং বিষুবরেখার সমান্তরাল। হিমালয়ের দক্ষিণদিকে অর্থাৎ ভারতীয় অঞ্চলে যে সকল প্রাণী পাওয়া যায়, হিমালয়ের উত্তরদিকের অঞ্চলে তাহাদের পাওয়া যায় না। হিমালয় পর্বতমালা ভারতের জলবায়ু, বৃষ্টিপাত এবং উদ্ভিদাঞ্চল নিয়ন্ত্রিত করে। আমেরিকার পশ্চিমদিকের পর্বতমালা আমেরিকার জলবায়ু, উদ্ভিদ ও প্রাণীর অবস্থান নিয়ন্ত্রণ করে।

(2) **জলবায়ুঘটিত বাধা** (Climatic barriers) : কোনো অঞ্চলের জলবায়ু সেই অঞ্চলের প্রাণীকে প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণ করে। আর্দ্র জলবায়ুতে বেশী উদ্ভিদ জন্মায় এবং সেখানে প্রাণীর সংখ্যাও বেশী হয়। শুষ্ক জলবায়ুতে উদ্ভিদ এবং প্রাণীর সংখ্যা হ্রাস পায়। বৃষ্টিপাতের অভাবে মরুভূমির সৃষ্টি হয় এবং তাহা প্রাণীদের বিস্তারে প্রধান বাধা সৃষ্টি করে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় সাহারা মরুভূমি হরিণের ভৌগোলিক বিস্তারে বাধার সৃষ্টি করে। তাপের মাত্রাও কোনো কোনো ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি করে। সাধারণতঃ স্তন্যপায়ী প্রাণীরা বিভিন্ন তাপমাত্রা সহ্য করিতে পারে কিন্তু সরীসৃপ ও উভচর প্রাণীরা উষ্ণ অথবা নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে বাস করে।

(3) **উদ্ভিদঘটিত বাধা** (Vegetative barrier) : কোনো অঞ্চলে উদ্ভিদের বৃদ্ধি সেখানকার জলবায়ুর উপর নির্ভরশীল। অন্যদিকে কোন

অঞ্চলের উদ্ভিদের উপর সেখানকার প্রাণীগোষ্ঠী পরোক্ষ অথবা প্রত্যক্ষভাবে নির্ভরশীল। উদাহরণস্বরূপ যে সকল প্রাণী বৃক্ষে বাস করে (যথা বানর, শ্লথ প্রভৃতি) তাহারা যে অঞ্চলে বৃক্ষ নাই সেখানে বাস করিতে পারে না। আবার বৃহদাকারের প্রাণী ঘন অরণ্য ভেদ করিয়া যাইতে পারে না। গরিলা, শিম্পাঞ্জি, উল্লুক প্রভৃতি (Apes) তাহাদের যাতায়াতের জন্য এবং খাদ্যের জন্য বৃক্ষের উপর নির্ভরশীল। তৃণভোজী (Grazing) এবং পত্রভোজী (Browsing) প্রাণীগুলিও পৃথক অঞ্চলে বাস করে। কোন অঞ্চলের উদ্ভিদের উপর বিশেষ ধরণের কীটপতঙ্গ নির্ভরশীল এবং ঐ কীটপতঙ্গগুলি কয়েকটি পাখীর খাদ্য। অতএব পরোক্ষভাবে ঐ অঞ্চলের উদ্ভিদের উপর পক্ষীকুলও নির্ভর করে।

(4) **বৃহৎ জলাশয়** (Large bodies of Water) ঃ সুবৃহৎ নদ-নদী, হ্রদ, বিশেষতঃ সমুদ্র ; স্থলচর প্রাণীদের ভৌগোলিক বিস্তারে প্রধান বাধা। সাধারণতঃ উভচর, সরীসৃপ এবং স্তন্যপায়ী প্রাণী ইহাদের অতিক্রম করিতে পারেনা তবে পাখী এবং বাদুড় আকাশপথে ইহাদের অতিক্রম করে। মিঠা জলের মাছ সাধারণতঃ সমুদ্রের জল অতিক্রম করিতে পারেনা তবে কোন কোন ক্ষেত্রে সামুদ্রিক মাছ বা মোহনার মাছ প্রজননের জন্য মিঠা জলে প্রবেশ করে যথা—ইলিশ মাছ ও ভেটকি মাছ। উভচর প্রাণীরা সাধারণতঃ সমুদ্রের লবণাক্ত জলে বাস করিতে পারেনা এবং সাইরেন, নিউট, স্যালামাণ্ডার প্রভৃতি উভচর দক্ষিণ গোলার্ধে দেখা যায় না। কচ্ছপ এবং কুমীরের বিস্তারে জলাশয় বাধা নয় কিন্তু গিরগিটির বিস্তারে জলাশয় একটি প্রধান বাধা। কয়েকটি দৌড় পাখী (Running birds) ব্যতীত অধিকাংশ পাখী এবং বাদুড়ের নিকট জলাশয় কোন বাধা নয়। তিমি সীল প্রভৃতি জলচর স্তন্যপায়ী প্রাণীর নিকট বৃহৎ জলাশয় কোনো সমস্যা না হইলেও ইহাদের নিকট স্থলভাগ একটি প্রধান বাধা।

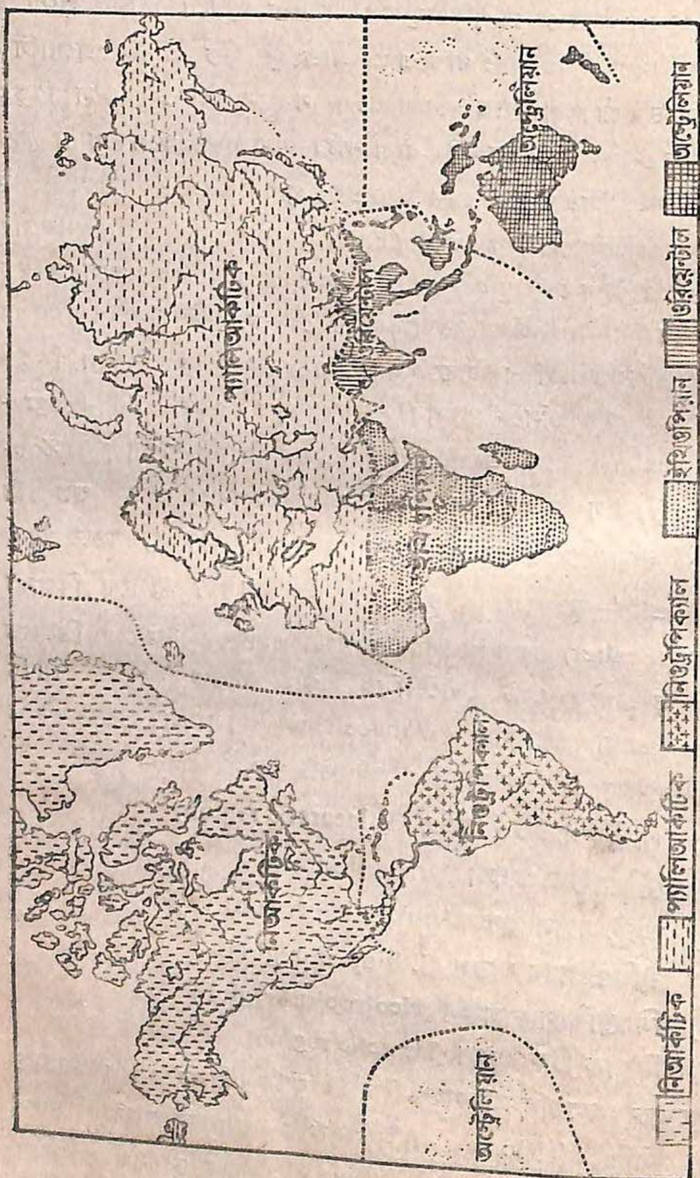
লবণাক্ত জলের বাধা (Salinity of sea as barrier) ঃ মিষ্টি জলে যে সকল প্রাণী বাস করে তাহাদের নিকট সমুদ্রের লবণাক্ত জল একটি প্রধান বাধা। অন্যদিকে সমুদ্রে প্রচুর সংখ্যক সামুদ্রিক প্রাণী বাস করে। ইহাদের নিকট স্থলভাগ এবং মিষ্টি জলের জলাশয়গুলি প্রধান বাধা। উল্লেখযোগ্য কয়েকটি সামুদ্রিক প্রাণীর নাম যথাক্রমে—হাঙর, করাত মাছ, ইলেকট্রিক-রে, সামুদ্রিক কচ্ছপ, সামুদ্রিক সাপ, তিমি প্রভৃতি।

প্রাণীর ভৌগোলিক অঞ্চল (Zoo-geographical realms) :

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে পৃথিবীর উপর বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন প্রকারের প্রাণী বাস করে। প্রথমতঃ খাদ্য এবং আশ্রয়ের জন্য প্রাণী ভৌগোলিক বিস্তার লাভ করে অর্থাৎ খাদ্য ও আশ্রয়ের সন্ধানে বিভিন্ন অঞ্চলে বিস্তৃত হইয়া পড়ে। পরবর্তীকালে নূতন বাধা সৃষ্টির ফলে এক অঞ্চলের প্রাণী অন্য অঞ্চল হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। এইভাবে পৃথিবীর এক এক অঞ্চলে এক এক প্রকারের প্রাণীগোষ্ঠী বা ফণা (Fauna) দেখা যায়। প্রতি অঞ্চলেই এমন কিছু প্রাণী থাকে, যাহা সেই অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য। এক অঞ্চলের সহিত অন্য অঞ্চলের প্রাণীর বিস্তারে বহু সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য দেখা যায়। বিভিন্ন প্রকারের প্রাণীর উপস্থিতির ভিত্তিতে সমগ্র পৃথিবীকে কয়েকটি অঞ্চলে বিভক্ত করা হয়, এই অঞ্চলগুলিকে **প্রাণীর ভৌগোলিক অঞ্চল** (Zoo-geographical realms) বলে এবং ইহার পঠনকে **প্রাণি-ভূগোল** (Zoo-geography) বলে। এই ধরণের পর্যালোচনায় প্রধানতঃ স্থলচর স্তন্যপায়ী প্রাণীকেই প্রাধান্য দেওয়া হয় তবে বর্তমানে পক্ষী, সরীসৃপ, উভচর এবং মৎস্যকেও প্রাণি—ভূগোলের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। 1857 খ্রীষ্টাব্দে বিজ্ঞানী **স্কেলটার** (Scalter) প্রধানতঃ স্থলচর স্তন্যপায়ী প্রাণীদের বিস্তারের ভিত্তিতে পৃথিবীর ভূ-ভাগকে ছয়টি ভৌগোলিক অঞ্চলে বিভক্ত করেন। 1876 খ্রীষ্টাব্দে বিজ্ঞানী **ওয়ালেস** (Wallace) এই অঞ্চলগুলির প্রত্যেকটিকে কয়েকটি উপ-অঞ্চলে বিভক্ত করেন। এই ছয়টি অঞ্চলের নাম—

(১) **প্যালি আর্কটিক অঞ্চল** (Palaearctic region)
(২) **ওরিয়েন্টাল অঞ্চল** (Oriental region)
(৩) **অষ্ট্রেলিয়ান অঞ্চল** (Australian region)
(৪) **ইথিওপিয়ান অঞ্চল** (Ethiopian region)
(৫) **নিওট্রপিকাল অঞ্চল** (Neotropical region)
(৬) **নিআর্কটিক অঞ্চল** (Nearctic region)

উপরোক্ত অঞ্চলগুলি অধিকাংশ বিজ্ঞানী কর্তৃক স্বীকৃত হইলেও 1885 খ্রীষ্টাব্দে হেলপ্রিন (Helprin) প্যালি আর্কটিক এবং নি-আর্কটিক অঞ্চল দুইটির প্রাণীর মধ্যে সাদৃশ্য লক্ষ্য করেন এবং এই অঞ্চল দুইটিকে যুক্তভাবে **হলার্কটিক** (Holarctic) নাম দেন।



চিত্র 21 : প্রাণীর ভৌগোলিক অঞ্চল।

1. **প্যালিআর্কটিক অঞ্চল** (Palaearctic region) : এই অঞ্চলটি প্রাণীর ভৌগোলিক অঞ্চলের মধ্যে সর্ববৃহৎ। সাধারণভাবে সমগ্র ইওরোপ, উত্তর আফ্রিকা (মকরক্রান্তির উপরে) এবং হিমালয়ের উত্তরে সমগ্র এশিয়া ইহার অন্তর্গত। এই অঞ্চলটিকে চারিটি উপ অঞ্চলে বিভক্ত করা হয়, যথা—

(ক) ইওরোপীয় (মধ্য এবং উত্তর ইওরোপ) উপ অঞ্চল

(খ) ভূমধ্য-সাগরীয় (দক্ষিণ ইওরোপ) উপ অঞ্চল

(গ) সাইবেরীয় (উত্তর এশিয়া) উপ অঞ্চল

(ঘ) মাঞ্চুরীয় (জাপান ও উত্তর চীন) উপ অঞ্চল

প্যালিআর্কটিক অঞ্চলের উল্লেখযোগ্য প্রাণী (Fauna) :

(ক) স্তন্যপায়ী প্রাণী—হরিণ (Deer), বন্যশূকর (Wildboar), উট (Camel), ভেড়া (Sheep), সজারু (Hedgehog), নেকড়ে (Wolf), বাদামী ভল্লুক (Brown bear), মেরু ভল্লুক (Polar bear), বল্গা হরিণ (Rein deer), লাল হরিণ (Red deer), সীল (Seal), শৃগাল (Jackal), মেরু শৃগাল (Arctic fox), স্থাময় (Chamois), এল্ক (Elk), খেঁকশিয়াল (Fox), লেমিং (Lemming), মারমট (Marmot), লিঙ্কস (Lynxs), জারবোয়া (Jarboa), বুনোগাধা (Wildass), বাট্রিয়ান উট (Batrian Camel), প্রভৃতি।

(খ) পাখী—বাস্টার্ড (Bustard), ফ্লেমিংগো (Flamingo), টিল (Teal), ফিজেণ্ট (Pheasant) প্রভৃতি।

উপরোক্ত প্রাণীগুলি ব্যতীত কয়েক প্রকারের উভচর (যথা জাপানী স্থালামাণ্ডার), সরীসৃপ এবং মাছ এই অঞ্চলে পাওয়া যায়। এই অঞ্চলের সহিত নিআর্কটিক অঞ্চলের কিছু কিছু সাদৃশ্য দেখা যায়। এক সময় এই দুইটি দেশ যুক্ত থাকার ফলেই প্রাণী বিস্তারে এই ধরণের সাদৃশ্য দেখা যায়।

বিঃ দ্রঃ প্যালি আর্কটিক অঞ্চলে স্তন্যপায়ীর 35টি গণ, পক্ষীর 59টি, উভচরের 16টি, সরীসৃপের 9টি এবং মিষ্টিজলের মাছের 21টি গণ আছে।

উভচর : প্রোটিয়াস, নেক্‌চুরাস, নিউটস, হাইলা, অ্যালাইটিস প্রভৃতি।

মাছ : কার্প, স্থালমন্ পাইক, পার্চ।

2. **ওরিয়েণ্টাল অঞ্চল** (Oriental region) : এই অঞ্চলটি সাধারণভাবে সমগ্র ভারত, সিলোন (বর্তমান শ্রীলঙ্কা), দক্ষিণ চীন, ব্রহ্মদেশ, থাইল্যাণ্ড, মালয়, মালয়দ্বীপ (বালি, বোর্নিও, জাভা, সুমাত্রা, সেলেবেস ও

ফিলিপাইন)। এই সকল অঞ্চলগুলি ওয়ালেস বর্ণিত কাল্পনিক রেখার (Wallaces line) পশ্চিমে অবস্থিত। এই কাল্পনিক রেখাটি ওরিয়েন্টাল অঞ্চলকে অস্ট্রেলিয়ান অঞ্চল হইতে পৃথক করে। সমগ্র ওরিয়েন্টাল অঞ্চলটি উষ্ণ এবং আর্দ্র হওয়ায় এখানে প্রচুর উদ্ভিদ ও প্রাণী বাস করে।

ওরিয়েন্টাল অঞ্চলটিকেও চারটি উপ অঞ্চলে বিভক্ত করা হয়, যথা—

(ক) ভারতীয় উপ অঞ্চল

(খ) সিলোনীজ উপ অঞ্চল

(গ) ইন্দো-চীন উপ অঞ্চল

(ঘ) ইন্দো-মালয় উপ অঞ্চল

ওরিয়েন্টাল অঞ্চলের উল্লেখযোগ্য প্রাণী (**Fauna**) :

(ক) স্তন্যপায়ী প্রাণী—বাঘ (Tiger), চিতাবাঘ (Leopard), ভল্লুক (Bear), হাতী (Indian Elephant), গণ্ডার (Rhinoceros), ওরাং ওটাং (Orang utan), উল্লুক (Gibbon), লরিস (Loris) হরিণ, (Deer), সিংহ (Asiatic Lion), ইয়াক (Yak), নীলগাই (Neilgai), বুনো গাধা (Wild ass), পাণ্ডা (Panda), টারসিয়ার (Tarsier) প্রভৃতি।

(খ) পাখী—ময়ূর (Peacock), বন্যমোরগ (Wildcock), টিয়া (Parrot), ময়না (Myna), বুলবুল (Bulbul), কোকিল (Cuckoo), কাঠঠোকরা (Woodpecker), মাছরাঙা (Kingfisher), ধনেশ (Pelican), সারস (Crane)।

(গ) সরীসৃপ—গোসাপ (Varanus), বহুরূপী বা ক্যামেলিয়ন (Chamelin), তক্ষক (Gecko), গোখুরা সাপ (Cobra), কেউটে (Crait), ময়াল (Python), শঙ্খচূড় প্রভৃতি।

(ঘ) উভচর—সোনা ব্যাঙ (Frog), কুনো ব্যাঙ (Toad), হাইলা (Hyla), টাইলোটোট্রাইটন (Tylototriton) প্রভৃতি।

(ঙ) মাছ—রুই, কাতলা, মিরগেল, কালবোস, কৈ, মাগুর, শিঙি, পুঁটি প্রভৃতি।

3. **অস্ট্রেলিয়ান অঞ্চল (Australian region) :** এই অঞ্চলটি অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড, নিউগিনি এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় কয়েকটি দ্বীপ লইয়া গঠিত। এই অঞ্চলটির ঠিক পূর্বদিকে ওরিয়েন্টাল অঞ্চল অবস্থিত। এই দুইটি অঞ্চলের মধ্য দিয়া একটি কাল্পনিক রেখা টানা হইয়াছে যাহা দুটি

ক্ষুদ্র দ্বীপ-বালি এবং লম্বককে ভেদ করে। এই রেখাটিকে **ওয়ালেসের রেখা** (Wallaces line) বলে।

অর্স্ট্রেলিয় অঞ্চলটিও চারটি উপ-অঞ্চলে বিভক্ত, যথা—

(ক) অস্ট্রো-মালয়ান উপ অঞ্চল

(খ) অর্স্ট্রেলিয় উপ অঞ্চল

(গ) পলিনেশীয় উপ অঞ্চল

(ঘ) নিউজিল্যাণ্ড উপ অঞ্চল

অর্স্ট্রেলিয় অঞ্চলের উল্লেখযোগ্য প্রাণী :

(ক) স্তন্যপায়ী প্রাণী : অর্স্ট্রেলিয় অঞ্চলে কয়েকটি নিজস্ব স্তন্যপায়ী প্রাণী আছে, যথা হংসচঞ্চু প্লাটিপাদ (Platypus), একিডনা (Echidna), ক্যাঙারু (Kangaroo), কোয়ালা (Koala), ব্যাণ্ডিকোট (Bandicoat), ওমব্যাট (Wombat), তাসমানিয়ার নেকড়ে (Tasmanian wolf) প্রভৃতি। এখানে বিভিন্ন ধরনের বাদুড়, ইঁদুর প্রভৃতিও পাওয়া যায়।

(খ) পাখী : কাকাতুয়া (Cockatoo), স্বর্গীয় পাখী (Bird of paradise), বীণাপাখী (Lyre bird), ক্যাসোয়ারী (Cassowary), এমু (Emu), কিউই (Kiwi), প্রভৃতি এখানকার বৈশিষ্ট্যযুক্ত পাখী।

(গ) সরীসৃপ : টুয়াটারা বা স্ফেনোডন (Sphenodon) : এক ধরণের গিরগিটি জাতীয় প্রাণী কেবল এই অঞ্চলেই বাস করে। ইহাকে জীবন্ত জীবাশ্ম বা লিভিং ফসিল (Living fossil) বলে।

(ঘ) মাছ—নিওসেরাটোডাস (Neoceratodus) নামক লাংফিস (Lung fish), এই অঞ্চলে পাওয়া যায়।

বিঃ দ্রঃ অর্স্ট্রেলীয় অঞ্চলটি প্রায় 20 কোটি বৎসর পূর্বে মূল ভূখণ্ড হইতে পৃথক হইয়া গিয়াছিল সেইজন্য এখানে কোন প্লাসেণ্টাযুক্ত স্তন্যপায়ী দেখা যায় না। পরবর্তীকালে অবশ্য কিছু কিছু স্তন্যপায়ী প্রাণী অন্যদেশ হইতে এখানে আনা হইয়াছে এবং তাহারা অনুকূল পরিবেশে বংশবৃদ্ধি করিয়াছে।

4. ইথিওপিয়ান অঞ্চল (Ethiopian region) :

এই অঞ্চলটি সমগ্র আফ্রিকা (মকর ক্রান্তি রেখার দক্ষিণে), দক্ষিণ আরব, মাদাগাস্কার এবং কয়েকট দ্বীপ লইয়া গঠিত। এই অঞ্চলটিরও চারিটি উপ অঞ্চল আছে, যথা—

(ক) পূর্ব আফ্রিকার উপ অঞ্চল
(খ) পশ্চিম আফ্রিকার উপ অঞ্চল
(গ) দক্ষিণ আফ্রিকার উপ অঞ্চল
(ঘ) মালাগাজী উপ অঞ্চল

ইথিওপিয়ান অঞ্চলটি বিষুবীয় অঞ্চলে অবস্থিত। এখানকার জলবায়ু উষ্ণ ও আর্দ্র থাকায় ইহা উদ্ভিদ ও প্রাণীর বসতির অনুকূল। এই অঞ্চলে বহু উল্লেখযোগ্য প্রাণী বাস করে, যথা—

(ক) স্তন্যপায়ী প্রাণী : গরিলা (Gorilla), শিম্পাঞ্জী (Chimpanzee), বেবুন (Baboon), জিরাফ (Giraffe), জেব্রা (Zebra), জলহস্তী বা হিপোপটেমাস (Hippopotamus), গণ্ডার (Rhinoceros), আফ্রিকার হাতী (African Elephant), এবং সিংহ (African Lion), চিতা (Cheetah), চিতাবাঘ (Leopard), আর্ডভার্ক (Aardvark) প্রভৃতি।

(খ) পাখী : উটপাখী (Ostrich), ঈগল (Eagle), শকুন (Valture), বাজ, পেঙ্গুইন (Penguin) প্রভৃতি।

(গ) সরীসৃপ : গোখরো (Cobra), ময়াল (Python), বোয়া (Boa), বহুরূপী (Chameleon) প্রভৃতি।

(ঘ) মাছ—প্রোটোপটেরাস (Protopterus) নামক লাংফিস।

বিঃ দ্রঃ ইথিওপিয়ান অঞ্চলের বন্যপ্রাণী বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এখানকার বন্যপ্রাণীর সহিত ওরিয়েন্টাল অঞ্চলের বন্যপ্রাণীর কিছু কিছু সাদৃশ্য দেখা যায়, যথা—সিংহ, হাতী ও গণ্ডার উভয় অঞ্চলেই পাওয়া যায়। ইহা হইতে অনেকে অনুমান করেন যে ভারত এক সময় আফ্রিকার সহিত সংযুক্ত ছিল।

5. **নিউট্রপিকাল অঞ্চল** (Neotropical region) :

এই অঞ্চলটি সমগ্র দক্ষিণ আমেরিকা, উত্তর আমেরিকার উষ্ণ অঞ্চল এবং অ্যান্টিলিস দ্বীপপুঞ্জ (ওয়েস্ট ইণ্ডিজ) লইয়া গঠিত।

নিওট্রপিকাল অঞ্চলটিও চারটি উপ অঞ্চলে বিভক্ত ; যথা—

(ক) চিলির উপ অঞ্চল
(খ) ব্রেজিলের উপ অঞ্চল
(গ) মেক্সিকোর উপ অঞ্চল
(ঘ) অ্যান্টিলিসের উপ অঞ্চল (ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দ্বীপপুঞ্জ)

নিউট্রপিকাল অঞ্চলটি প্রধানত গ্রীষ্ম মণ্ডলে (Tropical) অবস্থিত হওয়ায় এবং এখানে প্রচুর বনভূমি, নিম্নভূমি, পর্বতমালা প্রভৃতি থাকায় এখানে বিভিন্ন প্রকারের প্রাণী বাস করে।

এই অঞ্চলের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য প্রাণী :

(ক) স্তন্যপায়ী প্রাণী : আলপাকা (Alpaca), লামা (Llama), স্লথ (Sloth), আরমাডিলো (Armadillo), তাপির (Tapir), রক্তচোষা বাদুড় বা ভ্যামপায়ার (Vampire), জাগুয়ার (Jaguar), পুমা (Puma), ভোঁদড় (Otter), মারমোসেট (Marmoset) প্রভৃতি।

(খ) পাখী : মটমট (Motmot) টিনামাস (Tenamus), হোয়াজিন (Hoatzin), ম্যাকো (Macow), রিয়া (Rhea) প্রভৃতি।

অ্যালিগেটর (Alligator), কচ্ছপ (Tortoise), বিষাক্ত গিরগিটি হেলোডার্মা (Heloderma) প্রভৃতি সরীসৃপ এবং কয়েক প্রকারের উভচর এখানে বাস করে।

লেপিডোসাইরেন (*Lepidosiren*) নামক লাংফিস (Lungfish) এই অঞ্চলে পাওয়া যায়।

6. নিআর্কটিক অঞ্চল (Nearctic region) :

এই অঞ্চলটি সমগ্র উত্তর আমেরিকা যথা গ্রীণল্যাণ্ড, কানাডা, যুক্তরাষ্ট্র (হাওয়াই দ্বীপ ব্যতীত), দক্ষিণ মেক্সিকো এবং কর্কট ক্রান্তির দক্ষিণ পর্যন্ত বিস্তৃত।

নিআর্কটিক অঞ্চলটি কয়েকট উপ অঞ্চলে বিভক্ত, যথা—

(ক) ক্যালিফর্নিয়ার উপ অঞ্চল

(খ) রকি পর্বতের (Rocky Mountain) উপ অঞ্চল

(গ) অ্যালিঘানি বা পূর্ব যুক্তরাষ্ট্রের উপ অঞ্চল

(ঘ) কানাডার উপ অঞ্চল

নিআর্কটিক অঞ্চলে উত্তর হইতে দক্ষিণে শিলাময় পর্বতমালা বিস্তৃত। এই অঞ্চলে বিভিন্ন প্রকারের জলবায়ু (যথা উত্তরের শীতমণ্ডল হইতে দক্ষিণের গ্রীষ্মমণ্ডল) দেখা যায়। এখানেও প্রচুর বনভূমি এবং বন্যপ্রাণী দেখা যায়।

এই অঞ্চলের উল্লেখযোগ্য প্রাণী :

(ক) স্তন্যপায়ী প্রাণী : অপোসাম (Opossum), আরমাডিলো

(Armadillo), লিংক্স (Lynx), এল্‌ক্ (Elk), বীভার (Beaver), রেকুন (Racoon), পাহাড়ী ছাগল (Wild goat), বাইসন (Bison), প্রেইরি ডগ (Prairy dog), প্রভৃতি।

(খ) পাখী—ঈগল (Eagle), পেঁচা (Owl), হপিং ক্রেন (Hoping crane), বন্য টার্কী (Wild turkey) প্রভৃতি।

(গ) সরীসৃপ—র‍্যাট্‌ল সাপ (Rattle snake), মিঠাজলের কচ্ছপ, অ্যালিগেটর (Alligator), গিলা মনস্টার (Gila monster) প্রভৃতি।

(ঘ) উভচর—সাইরেন (Siren), অ্যামফিউমা (Amphiuma), অ্যাক্সোলট্‌ল্ লার্ভা (Axolotl larva) প্রভৃতি।

ডার্লিংটন (Darlington, 1948) এবং কেনডাই (Kendeigh, 1968) নি-আর্কটিক, প্যালি আর্কটিক, ইথিওপিয়ান এবং ওরিয়েন্টাল অঞ্চলের প্রাণীর মধ্যে কিছু কিছু সাদৃশ্য লক্ষ্য করেন এবং এই অঞ্চলগুলিকে একত্রে আর্কটিকোজিয়া (Arcticogaea) বা উত্তর ভূমি নামে অভিহিত করেন। দক্ষিণ আমেরিকা ভূতাত্বিক হিসাবে পরে সৃষ্টি হইয়াছে বলিয়া উহাকে নিওজিয়া (Neogaea) বা নূতন ভূমি এবং অস্ট্রেলিয়াকে নোটোজিয়া (Notogaea) বা দক্ষিণ ভূমি বলা হয়।

মহাদেশীয় বিস্তার (Continental distribution) :

পৃথিবীর উপর বিভিন্ন প্রাণীর বিস্তার পর্যবেক্ষণ করিলে তাহাদের ভিতর নানা সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। উদাহরণস্বরূপ অফ্রিকা এবং দক্ষিণ আমেরিকার ভৌগলিক অবস্থান প্রায় একপ্রকার। এই দুটি মহাদেশই নিরক্ষীয় অঞ্চলে অবস্থিত হওয়ার ফলে উহাদের জলবায়ু এবং ভূপ্রকৃতির মধ্যে সাদৃশ্য দেখা যায়। ইহাদের প্রাণীকুলের মধ্যে কিছু কিছু সাদৃশ্য দেখা গেলেও অধিকাংশ প্রাণীর মধ্যেই সাদৃশ্য নাই। এইভাবে আমরা আফ্রিকাতে ছোট লেজ বিশিষ্ট বানর, বনমানুষ বা অ্যানথ্রপয়েড এপ, হাতী, উট, অ্যান্টিলোপ, জিরাফ, সিংহ, জেব্রা, জলহস্তী প্রভৃতি দেখিতে পাই। কিন্তু দক্ষিণ আমেরিকাতে উহাদের একটিকেও দেখা যায় না। বরং সেখানে আমরা বড় লেজ বিশিষ্ট বানর, লামা, টাপির, প্যান্থার, জাগুয়ার প্রভৃতি প্রাণী দেখিতে পাই, আবার অস্ট্রেলিয়া মহাদেশও পৃথিবীর দক্ষিণে অবস্থিত কিন্তু সেখানে মনোট্রিমাটা বর্গের ডিম্ব প্রসব কারী স্তন্যপায়ী (যথা-হংসচঞ্চু প্লাটিপাস ও

একিডনা) এবং মারসুপিয়াল বর্গের বিভিন্ন প্রকারের ক্যাঙারু দেখিতে পাওয়া যায়। এই ধরনের প্রাণী সাধারণত পৃথিবীর অন্যত্র দেখিতে পাওয়া যায় না, যদিও দক্ষিণ আমেরিকায় ওপোসাম নামক প্রাণীটিকে ক্যাঙারুর স্বগোত্রীয় বলা যায়। প্রকৃতপক্ষে অস্ট্রেলিয়াতে জরায়ুজ স্তন্যপায়ী খুব অল্পই পাওয়া যায় (অবশ্য বর্তমানে অন্যদেশ হইতে বিভিন্ন জরায়ুজ প্রাণী এখানে আনা হইয়াছে)।

আফ্রিকা, দক্ষিণ আমেয়িকা, অস্ট্রেলিয়া এই তিনটি মহাদেশই পৃথিবীর দক্ষিণ গোলার্ধে অবস্থিত। অপর দিকে পৃথিবীর উত্তর গোলার্ধে অবস্থিত মহাদেশগুলির মধ্যে অপেক্ষাকৃত কম বৈসাদৃশ্য দেখা যায়। যথা, উত্তর আমেরিকা, ইওরোপ এবং এশিয়ার প্রাণীকুলে যথেষ্ট সাদৃশ্য দেখা যায়। উদারণস্বরূপ এল্‌ক, রেইনডিয়ার, বাইসন, ভল্লুক, বিভার, লিংক্স, খরগোশ, পার্বত্য মেষ প্রভৃতি বহু প্রাণী এই সকল মহাদেশে দেখিতে পাওয়া যায়।

মহাদেশীয় বিস্তারের ব্যাখ্যা ঃ

পৃথিবীর মানচিত্রে মহাদেশগুলির অবস্থান দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে দক্ষিণ গোলার্ধের মহাদেশগুলি (যথা আফ্রিকা, দক্ষিণ আমেরিকা এবং অস্ট্রেলিয়া) বিশাল জলরাশির দ্বারা পরস্পর হইতে পৃথক। কিন্তু উত্তর গোলার্ধের মহাদেশগুলির মধ্যে, বিশেষতঃ উত্তর আমেরিকা এবং এশিয়ার মধ্যে 100 কিমি হইতে কম প্রশস্ত বেরিং প্রণালী (Berring strait) অবস্থিত। ভূতাত্ত্বিক প্রমাণ হইতে জানা গিয়াছে যে এইস্থানে একসময় স্থলের মাধ্যমে যোগাযোগ ছিল।

কোনো কোনো জীববিজ্ঞানীর মতে অধিকাংশ আধুনিক স্তন্যপায়ীর সৃষ্টি হয় উত্তর গোলার্ধে এবং তাহারা খাদ্য, আশ্রয় এবং বংশরক্ষার তাগিদে বিভিন্ন দিকে বিস্তার লাভ করে। এইরূপে কিছু স্তন্যপায়ী পানামা যোজক (Isthmus of Panama)-এর মধ্য দিয়া দক্ষিণ আমেরিকায় প্রবেশ করে। কিছু স্তন্যপায়ী জিব্রাল্টার প্রণালী (Strait of Gibralter) দিয়া অফ্রিকাতে প্রবেশ করে। ভূতাত্ত্বিকগণ অনুমান করেন এই প্রণালীটিও একসময় যোজক দ্বারা যুক্ত ছিল। অপরদিকে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার সহিত স্থলভাগে অস্ট্রেলিয়ার যোগাযোগ ছিল। বেরিং প্রণালীটি যথেষ্ট অগভীর থাকায় উত্তর গোলার্ধে বিভিন্ন প্রাণীর যাতায়াত চলিতে থাকে কিন্তু দক্ষিণের গোলার্ধের মহাদেশগুলি বিভিন্ন

প্রাকৃতিক বাধা সৃষ্টির ফলে উত্তর গোলার্ধ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। সম্ভবতঃ প্লাসেন্টা-যুক্ত স্তন্যপায়ী উদ্ভবের পূর্বেই অস্ট্রেলিয়া মহাদেশ উত্তর গোলার্ধ হইতে কোনো প্রাকৃতিক কারণে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। ফলে অস্ট্রেলিয়া অঞ্চলে প্লাসেন্টাযুক্ত স্তন্যপায়ী বিস্তারলাভ করে নাই; বরং ডিম্ব



চিত্র 22 : মহাদেশীয় বিস্তার
(একটি সৃষ্টিকেন্দ্র হইতে বিভিন্ন যোজকের মাধ্যমে প্রাণীর ভৌগোলিক বিস্তার)

প্রসবকারী প্লাটিপাস ও একিডনা এবং মারসুপিয়াল স্তন্যপায়ী ক্যাঙারু এইস্থানে প্রচুর দেখা যায়। প্লাসেন্টাযুক্ত স্তন্যপায়ীর অনুপস্থিতিতে মারসুপিয়াল স্তন্যপায়ীর বিভিন্ন পরিবেশে অভিযোজনীয় বিকিরণ (Adaptive radiation) দেখা যায়। অপরদিকে পানামা যোজকের নিমজ্জিত হইবার ফলে দক্ষিণ আমেরিকা, উত্তর আমেরিকা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। অনুরূপভাবে ভূমধ্যসাগর এবং সাহারা মরুভূমির বিস্তৃতির ফলে আফ্রিকাও মূলভূখণ্ড হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। এইভাবে বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন অঞ্চলে পৃথক পৃথক প্রাণীদলের উদ্ভব হয়।

বিচ্ছিন্ন ভৌগোলিক বিস্তার (Discontinuous distribution) :

বর্তমানে অধিকাংশ বিজ্ঞানীর ধারণা এই যে, কোনো প্রাণীর উদ্ভব একটি স্থানে হয়। এই স্থানটিকে তাহার সৃষ্টিকেন্দ্র (Centre of origin) বলে। ক্রমাগত বংশবিস্তার করিয়া ঐ প্রাণীর বংশধরগুলি ধীরে ধীরে বিভিন্ন দিকে গমন করে এবং বিভিন্ন ভৌগোলিক পরিবেশে বিস্তৃত হয়। ইহাকে প্রাণীর পরিযান বা মাইগ্রেসন (Migration) বলে। একই বর্গ অথবা ফ্যামিলির

প্রাণীদের বিভিন্ন পরিবেশে দেখা যায় কিন্তু উহাদের গণ অথবা প্রজাতি পৃথক হয়। যখন একই গোষ্ঠীর উদ্ভিদ অথবা প্রাণীর যথেষ্ট ভৌগোলিক দূরত্বে অবস্থান করে তখন তাহাকে বিচ্ছিন্ন ভৌগোলিক বিস্তার (Discontinuous distribution) বলে।

বিচ্ছিন্ন ভৌগোলিক বিস্তারের উদাহরণ হিসাবে উট-পরিবার (Camel fimily)-এর উল্লেখ করা যায়। উত্তর আফ্রিকা এবং এশিয়ায় এই পরিবারের উট (Camel) দেখা যায় কিন্তু দক্ষিণ্ আমেরিকায় এই পরিবারের যে প্রাণীটি দেখা যায় তাহার নাম লামা (Llama)। বিজ্ঞানীদের ধারণা সর্বপ্রথম উত্তর গোলার্ধে উটের উৎপত্তি হয় এবং তথা হইতে উহারা দক্ষিণ গোলার্ধে (আফ্রিকা এবং দক্ষিণ আমেরিকায়) বিস্তৃতি লাভ করে। উটের জীবাশ্ম এই ধারণাকে সমর্থন করে। উটের বিভিন্ন জীবাশ্ম লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে উটের ক্রমবিকাশ আরম্ভ হয় উত্তর আমেরিকায়। সেখান হইতে উহারা পানামা যোজকের মধ্য দিয়া দক্ষিণ আমেরিকায় প্রবেশ করে এবং অন্যদিকে বেরিং প্রণালীর মধ্যদিয়া এশিয়া এবং আফ্রিকায় প্রবেশ করে। পরবর্তী কালে পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া বিভিন্ন ভৌগোলিক পরিবেশে উট পরিবারের দুইটি বিভিন্ন গণ এর উদ্ভব হয়, এইভাবে এশিয়া ও আফ্রিকায় আধুনিক উট এবং দক্ষিণ আমেরিকায় লামার উদ্ভব হয়।

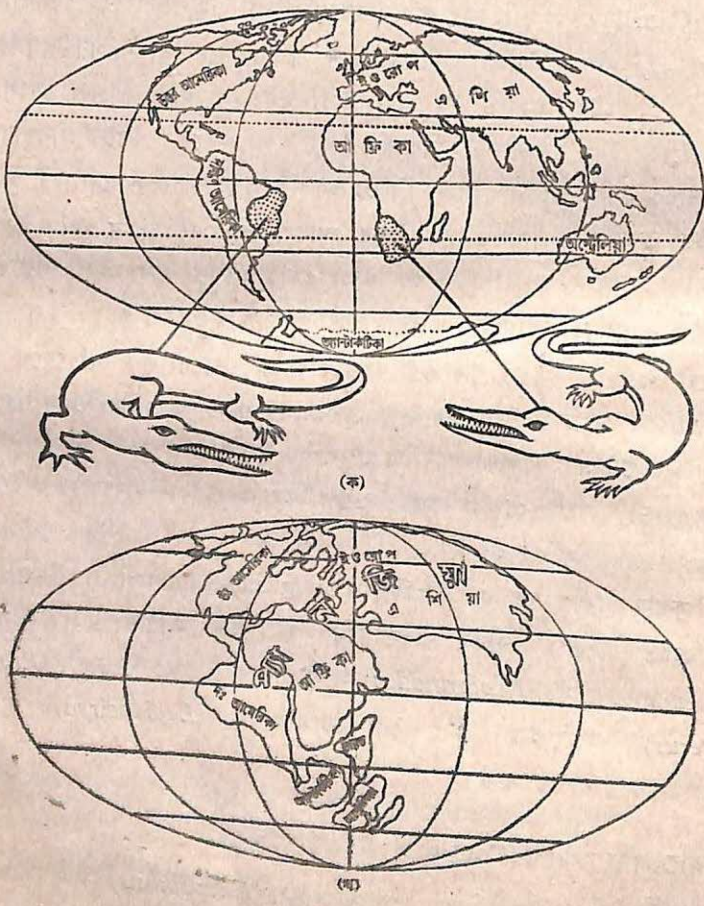
ঘোড়া, হাতী প্রভৃতি অন্যান্য স্তন্যপায়ীর ক্রমবিকাশ পর্যবেক্ষণ করিলেও একই চিত্র পরিলক্ষিত হয়।

ফুসফুসধারী মাছ বা লাংফিশ (Lungfish)-এর ভৌগোলিক বিস্তারেও বিচ্ছিন্নতা দেখা যায়। বর্তমানে জীবিত লাংফিশগুলির মধ্যে নিওসেরাটোডাস (*Neoceratodus*) অস্ট্রেলিয়ায়, প্রোটোপটেরাস (*Protopterus*) আফ্রিকায় এবং লেপিডোসাইরেন (*Lepidosiren*) দক্ষিণ আমেরিকায় পাওয়া যায়।

মহাদেশীয় সঞ্চরণ (Continental drift) :

প্রাণীর ভৌগোলিক বিস্তারে **মেসোসরাস** (*Mesosaurus*) নামক একটি লুপ্ত সরীসৃপ (Extinct reptile) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মেসোসরাস এখন হইতে প্রায় 27 কোটি বৎসর পূর্বে পৃথিবীতে বাস করিত, ইহারা দৈর্ঘ্যে প্রায় 1 মিটার, লিপ্তপদ, লেজযুক্ত এবং তীক্ষ্ণ দন্তবিশিষ্ট ছিল। ইহাদের জীবাশ্মের

গঠন দেখিয়া মনে হয় ইহারা জলে বাস করিতে অভ্যস্ত ছিল। তবে ইহাদের গঠন বিচিত্র না হইলেও ইহাদের ভৌগোলিক বিস্তার অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক। মেসোসরাস-এর জীবাশ্ম মাত্র দুইটি স্থানে পাওয়া যায়; একটি আফ্রিকার পশ্চিম দিকে এবং অপরটি দক্ষিণ আমেরিকার পূর্বদিকে। এই দুইটি মহাদেশ পরস্পর হইতে প্রায় তিন হাজার মাইল দূরে অবস্থিত এবং সরীসৃপের পক্ষে এই দূরত্ব অতিক্রম করা প্রায় অসম্ভব বিশেষতঃ অন্যত্র যখন



চিত্র 23a ও 23b : মহাদেশীয় সঞ্চরণ।
(a) পৃথিবীর বর্তমান রূপ এবং মেসোসরাস-এর জীবাশ্ম
(b) 20 কোটি বৎসর পূর্বে বিভিন্ন মহাদেশের অবস্থান।

ইহার কোনো জীবাশ্ম দেখা যায় না। ভূতাত্ত্বিকগণ এই প্রাণীর ভৌগোলিক বিস্তারের যে ব্যাখ্যা দিয়াছেন তাহাতে কেবল মেসোসরাসই নয়, অন্যান্য বহু প্রাণীর ভৌগোলিক বিস্তারই ব্যাখ্যা করা সম্ভব হইয়াছে।

ভূতাত্ত্বিকগণ অনুমান করেন যে একসময় দক্ষিণ আমেরিকা, আফ্রিকা, ভারত, অস্ট্রেলিয়া এবং কুমেরু বা অ্যান্টার্কটিকা প্রভৃতি মহাদেশ একত্র হইয়া এক বিশাল মহাদেশ গঠিত হইয়াছিল। এই বিশাল মহাদেশের নাম দেওয়া হইয়াছে **প্যানজিয়া** (Pangea)। অনুমান করা হয় এই প্রাচীন বিশাল স্থলভাগটি বিভিন্নভাবে বিভক্ত হইয়া বর্তমান কালের মহাদেশের অবস্থান অনুযায়ী সঞ্চারিত হইয়াছে। ইহাকেই মহাদেশীয় সঞ্চরণ বলে। **আলফ্রেড ওয়েগনার** (Alfred Wegner) 1912 খ্রীষ্টাব্দে সর্বপ্রথম মহাদেশীয় সঞ্চরণের মতবাদটি উপস্থাপন করেন কিন্তু তৎকালীন ভূতত্ত্ববিদগণ বিশ্বাস করিতেন যে দক্ষিণ আমেরিকা এবং অফ্রিকা একটি বিশাল স্থলভাগ দ্বারা যুক্ত ছিল যাহা বর্তমানে সম্পূর্ণভাবে নিমজ্জিত। তবে আধুনিক ভূতাত্ত্বিকগণ ভূত্বকের গঠন বৈচিত্র পর্যবেক্ষণ করিয়া মহাদেশীয় সঞ্চরণকেই সমর্থন করেন এবং বর্তমানে উহাকে প্লেট টেক্টোনিক্স (Plate tectonics) নামে অভিহিত করা হয়।

মহাদেশীয় সঞ্চরণ-এর সময়কাল সম্বন্ধে মতভেদ আছে। তবে অধিকাংশ ভূতত্ত্ববিদগণ মনে করেন প্রায় 20 কোটি বৎসর পূর্বে প্যানজিয়া বিভক্ত হইতে থাকে এবং আমেরিকা, আফ্রিকা ও ভারত প্রায় 10 কোটি বৎসর পূর্বে পরস্পর হইতে পৃথক হইয়া পড়ে। এই মহাদেশীয় সঞ্চরণ সম্ভবতঃ আধুনিক স্তন্যপায়ীর উদ্ভবের পূর্বেই সংঘটিত হইয়াছিল যাহার ফলে স্তন্যপায়ীর ক্রমবিকাশ প্যানজিয়া মতবাদের সাহায্যে প্রমাণ করা যায় না, তবে অস্ট্রেলিয়াতে মারসুপিয়াল স্তন্যপায়ীর উপস্থিতি প্রমাণ করা যায়। কোনো কোনো জীববিজ্ঞানীর মতে দক্ষিণ আমেরিকা হইতে কুমেরু হইয়া মারসুপিয়াল স্তন্যপায়ী অস্ট্রেলিয়াতে প্রবেশ করে। কেবল দক্ষিণ আমেরিকায় এবং অস্ট্রেলিয়ায় মারসুপিয়াল স্তন্যপায়ীর অস্তিত্ব এই মতবাদকে সমর্থন করে।

সারাংশ

পৃথিবীতে প্রাণীর বিস্তার সর্বত্র একই প্রকার বা অবিচ্ছিন্ন নয়। এক দেশের প্রাণীর সহিত অন্যদেশের প্রাণীর যথেষ্ট পার্থক্য দেখা যায়। একই

জলবায়ু বিশিষ্ট দেশের প্রাণীকুলের মধ্যেও এইরূপ প্রভেদ দেখা যায়। বিজ্ঞানীদের ধারণা কোনো প্রাণীর উদ্ভব একটি বিশেষ স্থানে হয় যাহাকে তাহার সৃষ্টি কেন্দ্র বলা যায়। ক্রমাগত বংশবিস্তার করিয়া ঐ প্রাণীর বংশধরগুলি ধীরে ধীরে চারিদিকে বিস্তৃত হয়। বিভিন্ন ভৌগোলিক অঞ্চলে প্রাণীগুলি ছড়াইয়া পড়িলে উহাদের মধ্যবর্তী অঞ্চলে কোনো প্রকার বাধা (barrier) সৃষ্টি হয় এবং প্রাণীগুলি তাহার কেন্দ্রে ফিরিয়া আসিতে পারে না। এইভাবে বাধা সৃষ্টি হইবার ফলে বিভিন্ন ভৌগোলিক অঞ্চলগুলি পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে এবং সেখানকার প্রাণীর মধ্যেও পার্থক্য দেখা যায়। প্রাণীর ভৌগোলিক বিস্তারে যে সকল বাধা আছে তাহার মধ্যে সুউচ্চ পর্বতমালা, মরুভূমি অঞ্চল, জলবায়ু ঘটিত বাধা, বৃহৎ জলাশয়, লবণাক্ত জলের বাধা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

বিভিন্ন প্রকারের প্রাণীর উপস্থিতির ভিত্তিতে সমগ্র পৃথিবীকে কয়েকটি অঞ্চলে বিভক্ত করা হয়। এই অঞ্চলগুলিকে প্রাণি-ভৌগোলিক অঞ্চল বলে। প্রধানত স্তন্যপায়ী প্রাণীর বিস্তারের ভিত্তিতে পৃথিবীকে ছয়টি অঞ্চলে বিভক্ত করা হয়। যথা—(ক) প্যালি আর্কটিক (খ) ওরিয়েন্টাল (গ) অস্ট্রেলিয়ান (ঘ) ইথিওপিয়ান (ঙ) নিওট্রপিকাল ও (চ) নিয়ার্কটিক অঞ্চল। সকল অঞ্চলগুলি আবার কয়েকটি উপ-অঞ্চলে বিভক্ত। প্রত্যেক অঞ্চলেরই নিজস্ব কিছু প্রাণী আছে। যথা—

ভৌগোলিক অঞ্চল	উল্লেখযোগ্য প্রাণী
১। প্যালিয়ার্কটিক অঞ্চল—	হরিণ, বন্যশূকর, নেকড়ে, ভল্লুক, মেরু ভল্লুক, সীল প্রভৃতি।
২। ওরিয়েন্টাল অঞ্চল—	বাঘ, লেপার্ড, ভারতীয় সিংহ, হাতী, গণ্ডার, ওরাং ওটাং, উল্লুক, ভল্লুক, হরিণ প্রভৃতি।
৩। অস্ট্রেলিয়ান অঞ্চল—	ক্যাঙারু, প্লাটিপাস, একিডনা, কাকাতুয়া, এমু, কিউই, ক্যাসোয়ারী, স্ফেনোডন প্রভৃতি।
৪। ইথিওপিয়ান অঞ্চল—	গরিলা, শিম্পাঞ্জী, চিতা, লেপার্ড, জিরাফ, জলহস্তী, গণ্ডার, জেব্রা, হাতী, সিংহ, উটপাখী প্রভৃতি।

৫। নিওট্রপিকাল অঞ্চল—আলপাকা, লামা, স্লথ, আর্মাডিলো, ভ্যামপায়ার, জাগুয়ার, পুমা, তাপির, রিয়া, ম্যাকো প্রভৃতি।

৬। নিয়ার্কটিক অঞ্চল—অপোসাম, আর্মাডিলো, লিংক্স্, এল্ক্, বীভার, রেকুন, বাইসন, ঈগল, র‍্যাটল সাপ প্রভৃতি।

ভূতাত্ত্বিকগণ অনুমান করেন যে একসময় দক্ষিণ আমেরিকা, আফ্রিকা, ভারত, অস্ট্রেলিয়া এবং অ্যান্টার্কটিকা প্রভৃতি মহাদেশ একত্র হইয়া এক বিশাল মহাদেশ গঠিত হইয়াছিল, বর্তমানে ইহার নাম দেওয়া হইয়াছে 'প্যানজিয়া'। প্রায় 20 কোটি বৎসর পূর্বে এই বিশাল ভূভাগ বিভক্ত হইতে থাকে। প্রায় 10 কোটি বৎসর পূর্বে আমেরিকা, অফ্রিকা এবং ভারত পরস্পর হইতে পৃথক হইয়া পড়ে। ইহাকে মহাদেশীয় সঞ্চরণ বলা হয়।

অনুশীলনী

1. প্রাণীর ভৌগোলিক বিস্তার বলিতে কি বোঝ ?
2. প্রাণীর ভৌগোলিক বিস্তারে প্রধান বাধাগুলি কি ?
3. প্রাণীর ভৌগোলিক অঞ্চল কাহাকে বলে ? প্রধান প্রাণী-ভৌগোলিক অঞ্চলগুলির নাম উল্লেখ কর।
4. প্যালি আর্কটিক এবং নিয়ার্কটিক অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য কি ? এই দুইটি অঞ্চলের উল্লেখযোগ্য প্রাণী কি কি ?
5. ওরিয়েন্টাল অঞ্চল কাহাকে বলে ? এই অঞ্চলের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ প্রাণীগুলির নাম উল্লেখ কর।
6. অস্ট্রেলিয়ান অঞ্চলের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ প্রাণীর উল্লেখ কর এবং এই অঞ্চলে উহাদের উপস্থিতির কারণ নির্দেশ কর।
7. ইথিওপিয়ান অঞ্চলের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ প্রাণীর নাম লিখ। এই অঞ্চলের প্রাণীর সহিত অন্য কোন্ অঞ্চলের প্রাণীর সাদৃশ্য দেখা যায় ?
8. নিওট্রপিকাল অঞ্চল কি ? এই অঞ্চলের উল্লেখযোগ্য প্রাণীর নাম কি ?
9. প্রাণীর মহাদেশীয় বিস্তার বলিতে কি বুঝায় ? কিভাবে ইহা ব্যাখ্যা করা যায় ?
10. বিচ্ছিন্ন ভৌগোলিক বিস্তার কি ? উদাহরণ দিয়া ব্যাখ্যা কর।
11. সংক্ষিপ্ত টীকা লেখ :
    (ক) স্কেলটার (খ) স্থান বিবরণ ঘটিত বাধা (Topographic barrier) (গ) নোটোজিয়া (ঘ) বিচ্ছিন্ন বিস্তার (Discontinous distribution)

(ঙ) প্যানজিয়া (চ) ওয়ালেসের রেখা (Wallaces line) (চ) মহাদেশীয় সঞ্চরণ (Continental drift)।

12. নিম্নলিখিত প্রাণীগুলি কোন্ ভৌগোলিক অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত লিখ।
(ক) টাইলোটোট্রাইটন (খ) হাইলোবেটিস (গ) ক্যাঙ্গারু (ঘ) কিউই (ঙ) স্কেনোডন (চ) জেব্রা (ছ) প্রোটোপটেরাস (জ) সেরাটোডাস (ঝ) ওপোসাম (ঞ) পেঙ্গুইন (ট) ময়ূর ও (ঠ) রাইনোসেরাস।

(কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় 1982)

গ্রন্থপঞ্জী ও নির্দেশিকা (References)

1. Darlington P. J. 1957, Zoogeography, Wiley & sons, New York.
2. Dodson E. O. 1968, Evolution, Process & Product, Reinhold.
3. Ganguly, Sinha and Adhikary 1979, Introduction to Biology of Animals. New Central.
4. Roberts MBV., 1976. Biology—A functional approach.
5. Moody P. A. 1964. Introdution to Evolution. Harper and Row, New York
6. Mukherjee D. 1972. Text Book of Zoology New Book Stall, Calcutta.
7. তারাপদ চট্টোপাধ্যায় ও সুমন্ত মুখোপাধ্যায়, ১৯৮০, প্রাণীবিদ্যা (প্রথম খণ্ড) নিউ বুক স্টল, কলিকাতা।
8. অসীম কুমার চট্টোপাধ্যায় ও অরুণ কুমার চট্টোপাধ্যায়, ১৯৮৩, প্রাণিবিদ্যা, নির্মলা লাইব্রেরী, কলিকাতা।
9. অরূপ কুমার সিংহ ও সীমানন্দ অধিকারী, ১৯৮২, সমকালীন প্রাণিবিদ্যা, নিউ সেন্ট্রাল বুক এজেন্সি, কলিকাতা।

সপ্তম অধ্যায়

ভূতাত্ত্বিক বিস্তার (Geological distribution)

জীবের ক্রমবিকাশ সম্পর্কে সঠিক ধারণা করিতে হইলে উদ্ভিদ এবং প্রাণীর ভৌগোলিক বিস্তারের মত উহাদের ভূতাত্ত্বিক বা সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে বিস্তার লক্ষ্য করা বিশেষ প্রয়োজন। ভূত্বকের বিভিন্ন শিলাস্তরে যে সকল জীবাশ্ম বা ফসিল পাওয়া যায় তাহাদের সাহায্যে পৃথিবীতে জীবের ক্রমবিকাশ সহজেই লক্ষ্য করা যায় (ভূতাত্ত্বিক প্রমাণ, তৃতীয় অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। বিভিন্ন জীবের ক্রমবিকাশের ইতিহাস পৃথিবীর শিলাস্তরে প্রকৃতি কর্তৃক সংরক্ষিত আছে। শিলাস্তরের বয়স নির্ণয় করিয়া এই সকল জীবাশ্ম তথা জীবের উদ্ভবের ইতিহাস পর্যবেক্ষণ করা যায়।

ভূতত্ত্ববিদগণ পৃথিবীর প্রাচীন ইতিহাসকে কয়েকটি বিভাগে বিভক্ত করেন। 1760 খ্রীষ্টাব্দে আভডুইনা (Avduina) নামক এক ইতালীয় বিজ্ঞানী সর্বপ্রথম এই ধরণের সময় সারণী (Time scale) উদ্ভাবন করেন। বর্তমানে শিলাস্তর এবং উহার মধ্যস্থ জীবাশ্মের বয়সের ভিত্তিতে পৃথিবীর বিভিন্ন শিলাস্তর বা ভূত্বককে কয়েকটি যুগ বা ইরা (Era)-তে বিভক্ত করা হয়। প্রত্যেকটি যুগকে আবার কাল বা পিরিয়ড (Periods) এবং 'কাল'কে কয়েকটি নির্দিষ্ট সময়কাল বা ইপক (Epoch)-এ বিভক্ত করা হয়।

যুগ বা ইরা (Era) :

প্রধান জীবাশ্মের ভিত্তিতে ভূত্বককে যে প্রধান বিভাগে বিভক্ত করা হয় তাহাকেই যুগ বা ইরা (Era) বলে। বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন ধরনের উদ্ভিদ ও প্রাণীর ক্রমবিকাশের পরিচয় পাওয়া যায়।

প্রধান যুগগুলির নাম এখানে দেওয়া হইল :

(১) আর্কিয়োজয়িক (Arohaeozoic)—জীবনের আবির্ভাব যুগ

(২) প্রোটেরোজয়িক (Proterozoic)—আদি জীবনের যুগ

(৩) প্যালিওজয়িক (Palaeozoic)—প্রাচীন বা প্রাথমিক জীবনের যুগ

(৪) মেসোজয়িক (Mesozoic)—মধ্যবর্তী জীবনের যুগ
(৫) সিনোজয়িক (Cenozoic)—বর্তমান বা সাম্প্রতিক জীবনের যুগ।

কাল বা পিরিয়ড (Periods) :

প্রতিটি যুগকে জীবাশ্মের বয়সের উপর ভিত্তি করিয়া কয়েকটি কালে বিভক্ত করা হয়। এইভাবে সমগ্র সময় সারণীটিকে ১২টি কাল বা পিরিয়ডে বিভক্ত করা হইয়াছে, যথা—

(ক) প্যালিওজয়িক যুগের কাল বা পিরিয়ড :

(১) কামব্রিয়ান (Cambrian)
(২) ওর্ডোভিসিয়ান (Ordovician)
(৩) সিলুরিয়ান (Silurian)
(৪) ডিভোনিয়ান (Devonian)
(৫) কার্বনিফেরাস (Carboniferous)
(৬) পারমিয়ান (Permian)

(খ) মেসোজয়িক যুগের কাল বা পিরিয়ড :

(১) ট্রায়াসিক (Triassic)
(২) জুরাসিক (Jurassic)
(৩) ক্রিটাসিয়াস (Cretaceous)

(গ) সিনোজয়িক যুগের কাল বা পিরিয়ড :

(১) টারশিয়ারী (Tertiary)
(২) কোয়াটারনারী (Quaternery)

ইপক (Epochs) :

জীবাশ্ম এবং শিলাস্তরের বয়সকালের ভিত্তিতে কয়েকটি কাল বা পিরিয়ডকে আবার নির্দিষ্ট সময়কাল বা ইপক (Epoch)-এ বিভক্ত করা হইয়াছে ; যথা—

(ক) টারশিয়ারী পিরিয়ডের ইপক :

(১) প্যালিওসিন (Palaeocene)
(২) ইওসিন (Eoecne)

(৩) ওলিগোসিন (Oligocene)

(৪) মিওসিন বা মায়োসিন (Miocene)

(৫) প্লিওসিন বা প্লায়োসিন (Pliocene)

(খ) **কোয়াটারনারী পিরিয়ডের ইপক :**

(১) প্লিস্টোসিন (Pleistocene)

(২) রিসেন্ট (Recent)

১। **আর্কিওজয়িক এবং প্রোটেরোজয়িক ইরা** (Archaeozoic and Proterozoic Eras) : ইহাদের একত্রে ক্যামব্রিয়ান-পূর্ব যুগ বা প্রি-ক্যাম্ব্রিয়ান ইরা (Pre-Cambrian Era) বলা হয়। এই যুগের জীবাশ্মের পরিমাণ খুবই অল্প। তবে বিভিন্ন শিলাস্তরের বয়স হিসাব করিয়া ভূতাত্ত্বিকগণ ধারণা করেন যে এই যুগে জীবনের আবির্ভাব হয় এবং এককোষী উদ্ভিদ ও প্রাণী, শৈবাল, অনুন্নত অমেরুদণ্ডী প্রাণী প্রভৃতির উদ্ভব হয়। বিজ্ঞানী হোম্‌স (Holmes, 1954)-এর মতে পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা প্রাচীন জীবাশ্ম শৈবাল জাতীয় উদ্ভিদের যাহা প্রায় 260 কোটি বৎসর পূর্বে সৃষ্টি হইয়াছিল।

২। **প্যালিও জয়িক বা প্রাচীন যুগ** (Palaeozoic Era) :

(ক) **ক্যামব্রিয়ান কাল** (Cambrian Period) : এই সময় হইতেই পৃথিবীর শিলাস্তরে বিভিন্ন উদ্ভিদ এবং প্রাণীর জীবাশ্ম দেখা যায়। প্রাণীদের মধ্যে যাহাদের দেহ ক্যালসিয়াম কার্বনেট দ্বারা আবৃত, এইসময় তাহাদেরই প্রাচুর্য দেখা যায় যথা—মোলাস্কা জাতীয় (Molluscs), একাইনোডারম (Echinoderms), ব্রাকিওপড (Brachiopods) এবং আরথ্রোপোড (Arthropods)। ক্যামব্রিয়ান পিরিয়ডের জীবাশ্মের মধ্যে অধিকাংশই ছিল সন্ধিপদী **ট্রাইলোবাইট** (Trilobites) এবং **ব্রাকিওপড**। অন্যান্য প্রাণীর মধ্যে প্রোটোজোয়া, স্পঞ্জ, গ্যাসট্রোপড প্রভৃতিও ছিল। তবে এই সময় অস্থি বিশিষ্ট কোনো প্রাণীর জীবাশ্ম পাওয়া যায় নাই।

(খ) **ওর্ডোভিসিয়ান কাল** (Ordovician Period) : এই সময় বিভিন্ন সামুদ্রিক অমেরুদণ্ডী প্রাণীর জীবাশ্ম পাওয়া যায়। ট্রাইলোবাইট এবং ব্রাকিওপড-এর সঙ্গে **সেফালোপড** (Cephalopod), **ব্রায়োজোয়া** (Bryozoa), **প্রবাল** (Coral) প্রভৃতি অমেরুদণ্ডী প্রাণীর উদ্ভব হয়। এই সময় প্রথম মেরুদণ্ডী প্রাণীরূপে মৎস্য জাতীয় প্রাণীর উদ্ভব হয়।

(গ) **সিলুরিয়ান কাল** (Silurian Period) : এই সময়কার শিলাস্তরে বিভিন্ন অমেরুদণ্ডী প্রাণীর জীবাশ্ম পাওয়া যায়, যথা—ব্রাকিওপড, প্রবাল, একাইনোডার্ম, ব্রায়োজোয়ান, মোলাস্ক প্রভৃতি। এই সময় ট্রাইলোবাইটের সংখ্যা হ্রাস পায় এবং **ইউরিপটেরিড** (Eurypterids) নামক এক ধরনের জলচর বৃশ্চিক জাতীয় প্রাণীর জীবাশ্ম দেখা যায়। সিলুরিয়ান শিলাস্তরে **অসট্রাকোডার্ম** (Ostracoderm) নামক এক মৎস্য জাতীয় প্রাণী দেখা যায় যাহাদের দেহ কঠিন অস্থি দ্বারা আবৃত ছিল। অন্যান্য মৎস্যও এই সময় বৃদ্ধি পায়।

(ঘ) **ডিভোনিয়ান কাল** (Devonian Period) : ইহাকে মৎস্য যুগও বলা যায় কারণ এই সময়কার শিলাস্তরে প্রচুর মৎসের জীবাশ্ম পাওয়া যায়। তরুণাস্থি বিশিষ্ট মাছ, অস্থি বিশিষ্ট মাছ এবং **ল্যাটিমেরিয়া** (যাহা এখনও জীবিত পাওয়া যায়) এই সময়কার প্রধান প্রাণী। সমুদ্রে খাদ্য ও আশ্রয়ের জন্য প্রবল প্রতিযোগিতা হওয়ায় ধীরে ধীরে স্থলচর প্রাণী এবং স্থলজ উদ্ভিদের উদ্ভব হয়। **ইকথিওস্টেগিড** (Ichthyostegides) নামক প্রথম উভচর এই সময়ই দেখা যায়। এই সময় অমেরুদণ্ডী প্রাণীদের জীবাশ্মের সংখ্যা এবং বৈচিত্র্য হ্রাস পায়।

(ঙ) **কারবোনিফেরাস কাল** (Carboniferous Period) : এই সময় স্থলে উভচর প্রাণীর (Amphibia) প্রাধান্য দেখা যায়। **ইরিওপস** (Eryops) নামক এক প্রকারের উভচর এই সময় বৃদ্ধিলাভ করে ও কিছুকাল পরে পৃথিবী হইতে লুপ্ত হইতে যায়।

(চ) **পারমিয়ান কাল** (Permian Period) : ইহা প্যালিওজয়িক যুগের সমাপ্তিকাল। এই সময়ও উভচরের প্রাধান্য ছিল এবং অনুমান করা হয় যে সেমুরিয়া (Seymouria) নামক উভচর হইতে সরীসৃপের পূর্বপুরুষ বিকাশ লাভ করে।

৩। **মেসোজয়িক বা মধ্যযুগ** (Mesozoic Era) : মেসোজয়িক যুগকে সরীসৃপের যুগ (Age of Reptiles) বলা হয় কারণ এই সময় পৃথিবীতে সরীসৃপেরই প্রাধান্য ছিল। এই যুগকে তিনটি পিরিয়ড বা কালে বিভক্ত করা হয়, যথা—ট্রায়াসিক, জুরাসিক এবং ক্রিটাসিয়াস।

(ক) **ট্রায়াসিক কাল** (Triassic Peeiod) : এই সময় কচ্ছপ, সাপ এবং অন্যান্য সরীসৃপের প্রাধান্য ছিল। এই সময় **ডাইনোসরের** আবির্ভাব

হয় ; তাহারা ক্রমশঃ জলে, স্থলে এবং অন্তরীক্ষে প্রাধান্য লাভ করে। অমেরুদণ্ডী প্রাণীদের মধ্যে বিভিন্ন প্রকারের কম্বোজ প্রাণী (Molluscs) প্রাধান্য লাভ করে, যথা—শামুক জাতীয় গ্যাস্ট্রোপোড্‌স, ঝিনুক জাতীয় বাইভালভ্‌স, সেফালোপড্‌স প্রভৃতি। কাঁকড়া চিংড়ি প্রভৃতি সন্ধিপদী জলজ প্রাণীও এই সময় দেখা যায়। বিভিন্ন প্রকারের অস্থিযুক্ত মাছ এবং তরুণাস্থিযুক্ত মাছ (যথা হাঙর) এই সময় যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়। উভচর প্রাণীর মধ্যে ইরিয়প্‌স ট্রায়াসিক কালে লুপ্ত হয় কিন্তু পরবর্তীকালে স্যালামাণ্ডার, কুনোব্যাঙ, সোনাব্যাঙ প্রভৃতি উভচরের উদ্ভব হয়।

জুরাসিক কালে পালকযুক্ত পাখী এবং **টেরোড্যাকটাইল** (*Pterodactyl*) নামক উড়ন্ত সরীসৃপের আবির্ভাব হয়। যে সকল লুপ্ত পাখীর জীবাশ্ম পাওয়া গিয়াছে তাহাদের মধ্যে **আরকিয়পটেরিক্স** (*Archaeopteryx*), **আর্কিয়রনিস** (*Archaeornis*) এবং **হেসপেরোরনিস** (*Hesperornis*) অন্যতম।

ট্রায়াসিক কালে স্তন্যপায়ী-সদৃশ সরীসৃপ হইতে প্রকৃত স্তন্যপায়ীর আবির্ভাব হয়। **ইকটিডোসর** (*Ictidosaur*) নামক প্রাণীটিতে সরীসৃপ এবং স্তন্যপায়ী উভয়ের বৈশিষ্ট্যই দেখা যায়। সম্ভবতঃ ইহা হইতেই **ট্রাইটাইলোডণ্ট** (*Tritylodonts*) নামক স্তন্যপায়ীর আবির্ভাব হয়। ক্রিটাসিয়াস কালের শেষদিকে প্রকৃত মারসুপিয়াল ও প্লাসেণ্টাযুক্ত স্তন্যপায়ীর আবির্ভাব হয়।

ডাইনোসর (Dinosaurs)

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে মেসোজয়িক যুগকে সরীসৃপ যুগ (Age of Reptiles) বলা হয়। এই সময় বিভিন্ন ধরণের অতিকায় সরীসৃপের আবির্ভাব হয়। এই সকল অধুনালুপ্ত সরীসৃপকে একত্রে **ডাইনোসর** (Dinosaurs) বলা হয়। এই প্রাণীগুলি প্রায় 12 কোটি বৎসর পূর্বে আবির্ভূত হয় এবং প্রায় ৪ কোটি বৎসর পূর্বে তাহারা পৃথিবী হইতে সম্পূর্ণ লুপ্ত হইয়া যায়। এই সকল অতিকায় প্রাণীর কঙ্কাল বা জীবাশ্ম হইতে তাহাদের সম্বন্ধে একটি ধারণা পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে কয়েকটি মাংসাশী ছিল, যথা—**টিরানোসরাস** (*Tyrannosaurus*), কিন্তু অন্যান্যগুলি তৃণভোজী বা শাকাশী ছিল, যথা—**ব্রনটোসরাস** (*Brontosaurus*)। কয়েকটি ডাইনোসরের আকার বিরাট ছিল যথা—**ডিপ্লোডকাস** (*Diplodocus*) প্রায় 30 মিটারের বেশী লম্বা ছিল এবং **ব্রাকিওসরাস** (*Brachiosaurus*) ওজনে ছিল প্রায় 50,000 কিলোগ্রাম।

ইকথিওসরাস (*Ichthyosaurus*) জলে বাস করিত আবার **টেরোডাক্টাইলাস** (*Pterodactylus*) আকাশে উড়িতে পটু ছিল। **টেরানোডন** (*Pteranodon*) নামক বিশাল উড্ডীয়মান সরীসৃপের দুইটি ডানার দূরত্ব ছিল প্রায় 10 মিটার। এই সকল বিরাট আকারের ডাইনোসর কিভাবে তাহাদের দেহের ভার বহন করিত তাহা বলা কঠিন। কেহ কেহ অনুমান করেন সেইসময় উহারা জলাশয়ের নিকটেই বাস করিত এবং অধিকাংশ সময়েই জলের মধ্যে দেহটি ডুবাইয়া দেহের ভার লাঘব করিত।

মেসোজয়িক যুগের শেষদিকে এই অতিকায় ডাইনোসরগুলি পৃথিবী হইতে বিলুপ্ত (Extinct) হইতে থাকে। ইহাদের বিলুপ্তির কারণ সঠিকভাবে জানা যায় নাই কিন্তু কেহ কেহ মনে করেন মেসোজয়িক যুগের শেষদিকে পৃথিবীর জলবায়ুর ঘন ঘন পরিবর্তন এবং ভূ-পৃষ্ঠের ক্রমাগত আন্দোলন ইহাদের বিলুপ্তির অন্যতম কারণ। অনেকের মতে মেসোজয়িক যুগে ফার্ণ, সাইকাড প্রভৃতি উদ্ভিদ ডাইনোসরের খাদ্য ছিল কিন্তু পরবর্তীকালে গুপ্তবীজী উদ্ভিদের আবির্ভাব ঘটায় উহারা খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন করিতে পারেনা এবং লুপ্ত হইয়া যায়। আবার অনেকে বলেন যে মেসোজয়িক যুগের শেষে যে সকল ক্ষুদ্রাকার মাংসাশী স্তন্যপায়ীর আবির্ভাব হয় তাহারা ডাইনোসরের অরক্ষিত ডিমগুলি নষ্ট করিয়া ডাইনোসরের বিলুপ্তির কারণ ঘটায়।

কিন্তু যেভাবেই বিলুপ্তি হউক না কেন, ডাইনোসর তাহার বিশালত্ব ও বৈচিত্র্যের জন্য এখনও আমাদের মনে কৌতূহল ও বিস্ময়ের সঞ্চার করে।

আধুনিক বা সিনোজয়িক যুগ (Cenozoic Era) :

সিনোজয়িক যুগকে স্তন্যপায়ীর যুগ (Age of mammals) বলা হয় কারণ এই যুগে প্রধানতঃ স্তন্যপায়ীর এবং কিছু কিছু পাখীর ক্রমবিকাশ হয়।

সিনোজয়িক যুগকে টারশিয়ারী ও কোয়াটারনারী এই দুইটি কালে বিভক্ত করা হয়।

(ক) **টারশিয়ারী কাল** (Tertiary Period) : ইহা আবার পাঁচটি ইপোক (Epoch)-এ বিভক্ত যথা—প্যালিওসিন, ইওসিন, ওলিগোসিন, মিওসিন ও প্লিওসিন। এই সময়কার উল্লেখযোগ্য অমেরুদণ্ডী প্রাণী (সামুদ্রিক) ফোরামিনিফার, ঝিনুক ও শামুক জাতীয় প্রাণী, ব্রায়োজোয়ান,

চিংড়ি জাতীয় সন্ধিপদী প্রাণী, সী আর্চিন প্রভৃতি। এই সময় নটিলাস, কাট্‌লফিশ, স্কুইড, অক্টোপাস প্রভৃতি সেফালোপডের প্রাধান্য ছিল।

এই সময়ে স্তন্যপায়ী এবং পাখীর ক্রমবিকাশ বিশেষ প্রাধান্য লাভ করে। সমুদ্রে প্রধানতঃ অস্থিযুক্ত মাছ এবং স্থলে স্তন্যপায়ী প্রাধান্য বিস্তার করে। এই হিসাবে সিনোজয়িক যুগকে স্তন্যপায়ী, পাখী এবং মাছের ক্রমবিকাশের যুগ বলা যায়।

টারশিয়ারী পিরিয়ডে প্রধানতঃ স্তন্যপায়ী প্রাণীর ক্রমবিকাশ দেখা যায়। **ইওসিন** দশায় মাংসাশী (Carnivores) এবং খুরযুক্ত (Hoofed) স্তন্যপায়ীর আবির্ভাব হয়। এই সময়েই বিখ্যাত 'ইওহিপ্পাস' (Eohippus) ঘোড়া, টাপির-এর পূর্বপুরুষ, গণ্ডার প্রভৃতি প্রাণী বিস্তার লাভ করে। হরিণ, শূকর, উট প্রভৃতি প্রাণীর পূর্বপুরুষের আবির্ভাবও হয়। এই সময় আকাশে বাদুড় এবং জলে তিমির আবির্ভাব হয়।

অলিগোসিন দশায় বিভার, ইঁদুর প্রভৃতি তীক্ষ্ণদন্ত বিশিষ্ট স্তন্যপায়ীর আবির্ভাব ঘটে এবং ওপোসাম, ছুঁচো প্রভৃতি প্রাণীর ক্রমবিকাশ হয়।

মিওসিন কালে তিন অঙ্গুলিবিশিষ্ট ঘোড়া, গণ্ডার, বৃহৎ শূকর, উট, হরিণ, ম্যাসটোডন (Mastodon) প্রভৃতি প্রাণী বৃদ্ধি পায় এবং বিরাটাকার বিড়াল, ভল্লুক, রেকুন (Raccoons) প্রভৃতি প্রাণীর আবির্ভাব হয়।

প্লিওসিন দশায় স্তন্যপায়ীরা ধীরে ধীরে ঋতু পরিবর্তনের সহিত নিজেদের অভিযোজিত করিতে থাকে। এই সময় লেজহীন বানর এপ-গোষ্ঠী (Apes) গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলে সীমিতভাবে বাস করিত। কয়েকটি নূতন ধরণের স্তন্যপায়ীও এই সময় বিকাশলাভ করে।

(খ) **কোয়াটারনারী কাল** (Quaternery Period) :

এই কালটি আবার দুইটি ইপক বা দশায় বিভক্ত যথা—প্লিস্টোসিন ও সাম্প্রতিক বা রিসেন্ট।

কোয়াটারনারী কালে আধুনিক স্তন্যপায়ী বিকাশলাভ করে এবং অতিকায় স্তন্যপায়ী (যথা—ম্যামথ) প্রাণীর বিলুপ্তি ঘটে। অতি সাম্প্রতিককালে মানুষের আবির্ভাব হয়।

(১) **প্লিস্টোসিন দশা** (Pleistocene)। ইহাকে হিমবাহের যুগ (Ice age) বলা হয়। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের জন্য বহু অতিকায় স্তন্যপায়ীর

বিলুপ্তি ঘটে এবং আধুনিক স্তন্যপায়ী প্রাণীর বিকাশ ঘটে। পশ্চিম ইওরোপের হিমবাহে ম্যামথ, গণ্ডার, মেরু-নেকড়ে প্রভৃতি প্রাণীর দেহাবশেষ পাওয়া যায়। মধ্য ইওরোপেও সিংহ, গণ্ডার, জলহস্তী, হায়েনা প্রভৃতি স্তন্যপায়ীর জীবাশ্ম পাওয়া গিয়াছে (যদিও এখন-এই প্রাণীগুলি প্রধানতঃ আফ্রিকায় বাস করে)।

(২) **রিসেন্ট বা সাম্প্রতিক দশা** (Recent): দ্বিপদী এপ এবং মানুষের আবির্ভাব হয় প্লিস্টোসিন দশায়, কিন্তু তাহার ক্রমবিকাশ হয় রিসেন্ট বা সাম্প্রতিক দশায়। এই সময় বিভিন্ন প্রকারের স্তন্যপায়ীর বিকাশ হয়, প্রাগৈতিহাসিক মানুষের উদ্ভব হয় এবং ধীরে ধীরে তাহারা বিভিন্ন স্থানে বিস্তারলাভ করে। মানুষের চিন্তা, বুদ্ধি এবং ভাষার ক্রমবিকাশের জন্য এই সময়কে সাইকোজয়িক (Psychozoic) যুগ বলা হয়।

গ্রন্থপঞ্জী ও নির্দেশিকা (Reference)

1. Colbert E. H., 1955, Evolution of the vertebrates, John Wiley & Sons, New York.
2. Romer A. S., 19‍59. The vertebrate story, University of Chicago Press.
3. Simpson G. G. 1949. The meaning of Evolution, Yale University Press.
4. Lull R. S. 1945. Organic Evolution, The Macmillan Co. New York.
5. Robert MBV. 1976. Biology A Functional Approach, Nelson.
6. Moody P. A. 1964. Introduction to Evolution, Harper and Row, New York.
7. Mukherjee D. 1972. Text Book of Zoology, New Book Stall, Calcutta.
8. Adhikari S. & Sinha A. 1973. Fundamentals of Biology of Animals. New Central Book Agency, Calcutta.

ইরা (Eras)	পিরিয়ড (Periods)	ইপোক (Epochs)	কত বৎসর পূর্বে	জীবের ক্রমবিকাশ
	ডিভোনিয়ান (Devonion)		35 কোটি বৎসর	মৎস্য যুগ, উভচরের আবির্ভাব।
	সিলুরিয়ান (Silurian)		40 কোটি বৎসর	সন্ধিপদী, ব্রাকিওপোড ও চোয়ালহীন মেরুদণ্ডী প্রাণী।
	ওর্ডোভিসিয়ান (Ordovicean)		48 কোটি বৎসর	মেরুদণ্ডীর আবির্ভাব সেফালোপড ও ব্রাকিওপড।
	ক্যামব্রিয়ান (Cambrean)		55-60 কোটি বৎসর	ট্রাইলোবাইট, ব্রাকিওপড প্রভৃতি অমেরুদণ্ডীর প্রাধান্য।
প্রোটেরোজয়িক (Proterozoic)			60-200 কোটি বৎসর	এককোষী উদ্ভিদ ও প্রাণীর আবির্ভাব ও ক্রমবিকাশ।
আর্কিওজয়িক (Archeozoic)				

অনুশীলনী

1. ভূতাত্ত্বিক বিস্তার কাহাকে বলে ? ইহা কিভাবে জৈব অভিব্যক্তিকে ব্যাখ্যা করে ?
2. যুগ বা ইরা (Era), কাল বা পিরিয়ড (Period) এবং ইপক (Epoch) বলিতে কি বোঝায় ?
3. আর্কিওজয়িক ইরা কাহাকে বলে ?
4. ভূতাত্ত্বিক বিস্তারে প্রাচীন যুগ বা প্যালিওজয়িক ইরার বৈশিষ্ট্য কি ? এই যুগকে কোন্ কোন্ পিরিয়ডে বিভক্ত করা হয় ? প্রতিটি পিরিয়ডে কোন্ কোন্ উল্লেখযোগ্য প্রাণীর ক্রমবিকাশ হয় ?
5. মেসোজয়িক যুগে কোন প্রাণীর প্রাধান্য ছিল ? উহাদের ক্রমবিকাশের সংক্ষিপ্ত আলোচনা কর।
6. ডাইনোসরস্ (Dinosaurs) কাহাকে বলে ? ইহাদের বিলুপ্তির কারণ কি ?
7. আধুনিক যুগকে কয়টি পিরিয়ডে বিভক্ত করা হয় ও কি কি ? এই যুগে কোন কোন প্রাণীর ক্রমবিকাশ হয় সংক্ষেপে লেখ।
8. সংক্ষিপ্ত টীকা লেখ :

   (ক) ওরডোভিসিয়ান (খ) সিলুরিয়ান (গ) ডিভোনিয়ান (ঘ) কারবোনিফেরাস (ঙ) পারমিয়ান (চ) জুরাসিক (ছ) অলিগোসিন (জ) মিওসিন (ঝ) প্লিওসিন ও (ঞ) প্লিস্টোসিন।
9. নিম্নলিখিত প্রাণীগুলির অভিব্যক্তির যুগ বা ইরা এবং কাল বা পিরিয়ড নির্দেশ কর :

   (ক) ট্রাইলোবাইট (খ) ব্রায়োজোয়া (গ) অসট্রাকোডার্ম (ঘ) ইরিওপস্ (ঙ) হেসপেরোরনিস (চ) সেমুরিয়া (ছ) টেরোড্যাকটাইল (জ) ইওহিপ্পাস (ঝ) ম্যাস্টোডন ও (ঞ) মানুষ।

অষ্টম অধ্যায়

ঘোড়ার অভিব্যক্তি বা ক্রমবিকাশ
(Evolution of Horse)

পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলিতে আমরা আলোচনা করিয়াছি যে পৃথিবীতে বিভিন্ন উদ্ভিদ ও প্রাণীর আবির্ভাব এবং ক্রমবিকাশ কিভাবে হইয়াছে। পৃথিবীর শিলাস্তরে সংরক্ষিত বিভিন্ন জীবাশ্মের সাহায্য কোনো একটি বিশেষ প্রাণীর ক্রমবিকাশও সহজেই লক্ষ্য করা যায়। জীবাশ্মের সাহায্যে আজ পর্যন্ত যে সকল প্রাণীর ক্রমবিকাশ সুস্পষ্ট ভাবে লক্ষ্য করা গিয়াছে তাহার মধ্যে 'ঘোড়া' অন্যতম। ঘোড়ার ক্রমবিকাশের ইতিহাস বিভিন্ন শিলাস্তরে সুনির্দিষ্ট পর্যায়ে এবং সুস্পষ্ট ভাবে পাওয়া গিয়াছে।

আধুনিক ঘোড়া বা **ইকুঁয়াস** (*Equus*)-এর পূর্বপুরুষের আবির্ভাব প্রায় ছয়কোটি বৎসর পূর্বে হইয়াছিল। ইহার নাম ছিল **ইওহিপ্পাস** (*Eohippus*)। অনেকে **হাইরাকোথেরিয়াম** (*Hyracotherium*) কে ইহার সমগোত্রীয় মনে করেন। ঘোড়ার এই পূর্বপুরুষ আকারে ক্ষুদ্র ছিল (উচ্চতা 28 সেমি)। ইহাদের সামনের পায়ে চারটি ও পিছনের পায়ে তিনটি করিয়া **আঙুল ছিল।** ইওহিপ্পাসের পরে আসে **মেসোহিপ্পাস** (*Mesohippus*), ইহার উচ্চতা সামান্য বেশী ছিল (প্রায় 55 সেমি) ; ইহার সামনের পায়ে এবং পিছনের পায়ে তিনটি করিয়া আঙুল ছিল এবং পাশের আঙুলগুলি প্রায় মাটির সহিত লাগিয়া থাকিত। পরবর্তী **মেরিচিপ্পাস** (*Merichippus*, উচ্চতা প্রায় 100 সেমি) এবং **প্লিওহিপ্পাস** (*Pliohippus*, উচ্চতা প্রায় 110 সেমি) ; আধুনিক ঘোড়ার পূর্বপুরুষরূপে আবির্ভূত হয়। ইহাদের তিনটি করিয়া আঙুল থাকিলেও পাশের আঙুলগুলি মাটি স্পর্শ করিত না। আধুনিক ঘোড়া **ইকুয়াস** (*Equus*) প্রায় 1·5 মিটার উচ্চ এবং উহার পায়ের পাশের আঙুলগুলি সম্পূর্ণভাবে ক্ষয় হইয়া ক্ষুদ্র হইয়া গিয়াছে। এই ক্ষয়প্রাপ্ত আঙুলের অস্থিকে স্প্লিন্ট্ বোন (Splint bone) বলে। কেবল উচ্চতা এবং আঙুলের পরিবর্তনই নয়, ঘোড়ার ক্রমবিকাশে দেহের অন্যান্য অঙ্গেও বিশেষত দাঁতের গঠনে বিশেষ পরিবর্তন দেখা যায়।

নীচে ঘোড়ার ক্রমবিকাশের ধারাটি বিশদভাবে আলোচনা করা হইল।

আধুনিক ঘোড়া **'ইকুয়াস'** (*Equus*)-এর বৈশিষ্ট্য :

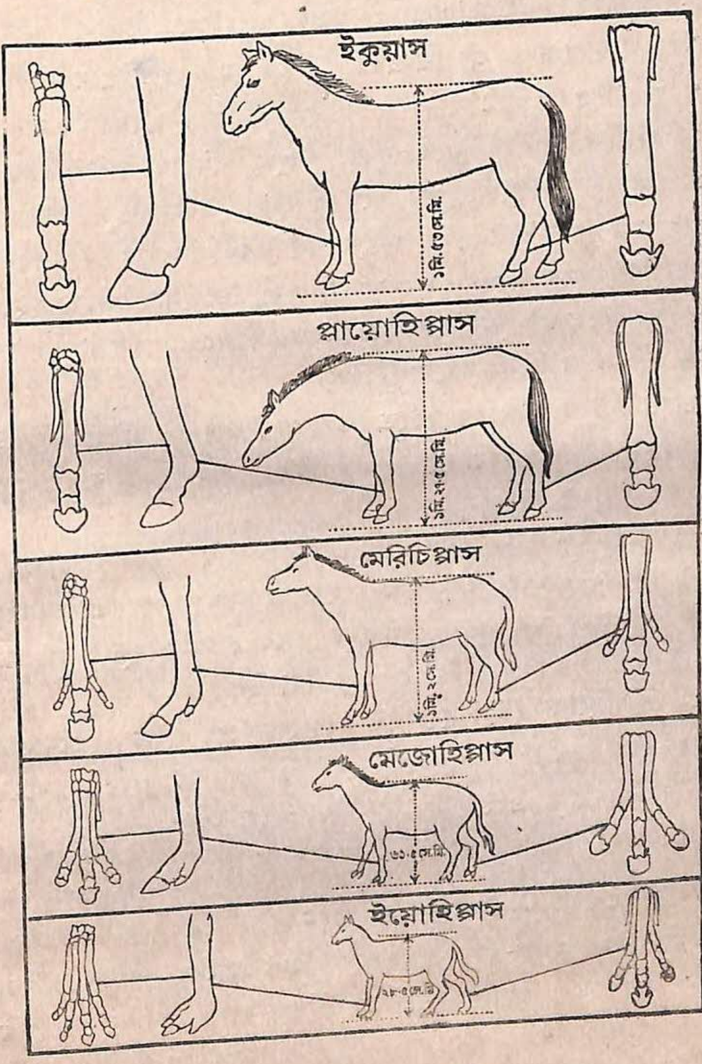
আধুনিক ঘোড়া 'ইকুয়াস'-এর দেহের গঠনে কয়েকটি বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। ইহার মাথা, গলা এবং দেহের গঠন এরূপ যাহাতে দৌড়াইবার সময় ইহাদের কোনো অসুবিধা হয় না। ইহাদের গলা এবং মাথা লম্বা ; করোটি এবং মস্তিষ্ক বৃহৎ। ইহাদের পাগুলি লম্বা, সবল এবং প্রতি পায়ে একটি মাত্র আঙুল থাকে। সামনের দাঁতগুলিতে (ইনসাইজার) লম্বা ক্রাউন থাকে, কৃন্তক বা ক্যানাইন থাকে না, সেই স্থানে একটি লম্বা ডায়াস্টেমা থাকে। ইহাদের উচ্চতা প্রায় 6 ফুট 4 ইঞ্চি এবং ওজন প্রায় 2400 পাউণ্ড। কিন্তু ঘোড়ার পূর্বপুরুষ এইরূপ ছিল না। ঘোড়ার ক্রমবিকাশ লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে তাহাদের কয়েকটি বিষয়ে যথেষ্ট পরিবর্তন হইয়াছে, যথা—আকারে বৃদ্ধি, পায়ে একটি আঙুলের কার্যকরী হওয়া, পায়ের অপর আঙুলগুলি হ্রাস পাওয়া, গলা এবং মাথা লম্বা হওয়া, পত্রভোজী (Browsing) হইতে তৃণভোজী (Grazing) হওয়া—খাদ্যাভ্যাসের এই পরিবর্তনের জন্য প্রিমোলার ও মোলার দন্ত ক্ষুদ্র ক্রাউন হইতে দীর্ঘ ক্রাউন হওয়া, মস্তিষ্কের বৃদ্ধি প্রভৃতি। ঘোড়ার পূর্বপুরুষ হইতে আধুনিক ঘোড়ার ক্রমবিকাশ নীচে আলোচনা করা হইল।

উৎপত্তি-স্থল (Place of Origin) : ঘোড়ার প্রথম পূর্বপুরুষ **'হাইরাকোথেরিয়াম'** (Hyracotherium)-এর জীবাশ্ম ইউরোপের প্রাচীন শিলাস্তরে পাওয়া যায়, আবার উত্তর আমেরিকার শিলাস্তরে **'ইওহিপ্পাস'** (Eohippus)-এর জীবাশ্ম আবিষ্কৃত হয়। উভয়েই স্বগোত্রীয় তবে হাইরোকোথেরিয়ামের প্রিমোলার দন্ত ইওহিপ্পাসের প্রিমোলার দন্ত অপেক্ষা সরল বলিয়া হাইরাকোথেরিয়ামকেই ঘোড়ার প্রথম পূর্বপুরুষ মনে করা হয়। বিজ্ঞানী কুপার (Cooper, 1932)-এর মতে হাইরাকোথেরিয়াম এবং ইওহিপ্পাস স্বগোত্রীয় এবং উভয়কেই হাইরাকোথেরিয়াম নামে অভিহিত করা উচিত।

প্রাচীন ঘোড়ার জীবাশ্ম (ইওসিন হইতে প্লিসটোসিন ইপকে) উত্তর আমেরিকা, ইওরোপ এবং এশিয়ার বিভিন্ন স্থানে পাওয়া গিয়াছে কিন্তু উত্তর আমেরিকায় ঘোড়ার ক্রমবিকাশের ধারাটি সুস্পষ্ট ভাবে লক্ষ্য করা যায়।

ইহা হইতে অনুমান করা হয় যে উত্তর আমেরিকাতেই ঘোড়ার পূর্বপুরুষের

প্রথম আবির্ভাব হয় (ইওসিন ইপক-এ) এবং সেখান হইতে উহা বিভিন্ন দেশে বিস্তার লাভ করে। পরবর্তী প্লিস্টোসিন ইপক-এ উত্তর আমেরিকায় ঘোড়ার বিলুপ্তি ঘটে।



চিত্র 24 : ঘোড়ার ক্রমবিকাশ।

ইওসিন-ঘোড়া (Eocene Horses) :

প্রাচীন ঘোড়ার প্রথম জীবাশ্ম উত্তর আমেরিকায় আবিষ্কৃত হয় এবং উহার নাম দেওয়া হয় ইওহিপ্পাস বা প্রত্যুষের ঘোড়া (Dawn Horse)।

1. **ইওহিপ্পাস (Eohippus) :** উত্তর আমেরিকার ইওসিন দশার শিলাস্তরে ইওহিপ্পাস-এর জীবাশ্ম প্রথম আবিষ্কৃত হয়। ইওহিপ্পাস আকারে অত্যন্ত ক্ষুদ্র ছিল (মাত্র 28 সেমি) এবং ইহাদের পিঠটি ধনুকের মত বাঁকান ছিল। ইহাদের সামনের পায়ে চারটি আঙুল (দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম) ছিল এবং প্রতিটি আঙুলের শেষে খুর ছিল। প্রথম আঙুলটি ছিলনা। পিছনের পায়ে মাত্র তিনটি করিয়া আঙুল ছিল (দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ)। ইহাদের 44টি দাঁত ছিল, ডায়াস্টেমা ছিল না, প্রিমোলার-মোলার হইতে পৃথক ছিল। দাঁতগুলি ছোট ক্রাউনযুক্ত (Low Crowned) ছিল যাহা হইতে অনুমান করা হয় যে উহারা পত্রভোজী ছিল।

ইওহিপ্পাস উত্তর আমেরিকা হইতে ইউরোপে বিস্তারলাভ করিবার পর এই দুইটি মহাদেশ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে এবং প্রাচীন ঘোড়ার পরবর্তী বংশধরেরাও পরস্পর হইতে পৃথক হয়।

2. **ওরোহিপ্পাস (Orohippus) :** ইহার জীবাশ্ম উত্তর আমেরিকার ইওসিন শিলাস্তর হইতে পাওয়া যায়। ইহাদের চতুর্থ বা শেষ প্রিমোলারের আকার মোলারের মত ছিল। সামনের পায়ে চারটি আঙুল ও পিছনের পায়ে তিনটি আঙুল ছিল। ইহারাও পত্রভোজী ছিল।

3. **এপিহিপ্পাস (Epihippus) :** ইহাদের শেষ দুইটি প্রিমোলার (তৃতীয় এবং চতুর্থ) আকারে মোলারের মত ছিল। ইহাদেরও সামনের পায়ে চারটি আঙুল এবং পিছনের পায়ে তিনটি করিয়া আঙুল ছিল, খাদ্যাভ্যাসে ইহারাও পত্রভোজী ছিল।

ওলিগোসিন-ঘোড়া (Oligocene Horses) :

ওলিগোসিন ইপক-এর ঘোড়াগুলি এপিহিপ্পাসের বংশধর বলিয়া অনুমান করা হয়। ইহাদের জীবাশ্ম ওলিগোসিনের প্রাচীন ও মধ্য শিলাস্তরে পাওয়া যায়।

1. **মেসোহিপ্পাস (Mesohippus) :** ইহাদের আকার ইওহিপ্পাস হইতে বেশী ছিল (প্রায় 60 সেমি.) তবে ইহা অপেক্ষা বৃহদাকারের ঘোড়াও

পাওয়া গিয়াছে। ইহাদের মাথাটি বড় এবং গলা ক্ষুদ্র কিন্তু নমনীয় ছিল। পাগুলি লম্বা এবং দৌড়াইবার উপযোগী ছিল। প্রতি পায়ে তিনটি করিয়া আঙুল ছিল এবং মধ্যের আঙুলটি বড় ছিল। দাঁতগুলি ক্ষুদ্র ক্রাউনযুক্ত হওয়ায় ইহারা পত্রভোজী ছিল। ইহাদের তিনটি প্রিমোলার (দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থ) মোলারের মত (Molariform) ছিল।

2. **মায়োহিপ্পাস** (Miohippus) : ইহারা মেসোহিপ্পাস হইতে আকারে বড় ছিল। ইহাদের জীবাশ্ম ওপরদিকের ওলিগোসিন এবং প্রথম দিকের মিওসিন ইপকের শিলাস্তরে পাওয়া যায়। ইহাদেরও পায়ে তিনটি করিয়া আঙুল ছিল এবং ইহারাও পত্রভোজী ছিল।

মিওসিন ঘোড়া (Miocene Horses) :

ইহারা প্রত্যেকেই তিনটি আঙুল বিশিষ্ট (3 toed)।

1. **অ্যাঙ্কিথেরিয়াম** (Anchitherium) : ইহা উত্তর আমেরিকার প্রাথমিক মিওসিন দশায় মায়োহিপ্পাস হইতে উদ্ভূত হয়। ইহারা ইওরোপ এবং এশিয়ায় বিস্তার লাভ করে।

2. **হাইপোহিপ্পাস** (Hypohippus) : ইহারা অ্যাঙ্কিথেরিয়াম হইতে উদ্ভূত কিন্তু আকারে বড় (প্রায় 1 মিটার)। ইহাদের দন্তে ক্ষুদ্র ক্রাউন থাকায় ইহারা পত্রভোজী ছিল। ইহারা ইউরোপ এবং এশিয়ায় বিস্তারলাভ করে কিন্তু পরবর্তী প্লিওসিন ইপক-এ অ্যাঙ্কিথেরিয়ামের সহিত ইহাদেরও বিলুপ্তি ঘটে।

3. **আর্কিওহিপ্পাস** (Archaeohippus) : ইহাদের মায়োসিন ইপক-এর পিগ্‌মি ঘোড়া (Pigmy horses of Miocene) বলা হয়। ইহারাও মায়োহিপাশের বংশধর কিন্তু আকারে অন্যান্য মিওসিন ঘোড়া অপেক্ষা ক্ষুদ্র।

4. **প্যারাহিপ্পাস** (Parahippus) : ইহারা মিওসিনের প্রথমে মায়োহিপ্পাস হইতে উদ্ভূত হয়। ইহাদের প্রিমোলারও কিছুটা পরিবর্তিত কিন্তু ক্ষুদ্র ক্রাউনযুক্ত হওয়ায় ইহারা পত্রভোজী ছিল। ইহাদের পায়েও তিনটি করিয়া আঙুল ছিল।

5. **মেরিচিপ্পাস** (Merychippus) : মধ্য এবং উপরদিকের মিওসিন-এ ইহাদের আবির্ভাব হয়। ইহাদের দুগ্ধদন্ত নীচু ক্রাউনযুক্ত এবং সিমেন্টহীন কিন্তু স্থায়ীদন্ত উচ্চ ক্রাউনযুক্ত ও সিমেন্টযুক্ত ছিল। ইহারা তৃণভোজী ছিল।

ইহারা উচ্চতায় প্রায় 1 মিটার ছিল এবং ইহাদের মাথার গঠন প্রায় আধুনিক ঘোড়া ইকুয়াসের মত ছিল। ইহাদের পায়েও তিনটি আঙুল ছিল কিন্তু মধ্যের আঙুলটি বড় এবং দুই পাশের আঙুলগুলি ছোট ছিল। মধ্যের আঙুলের শেষে একটি খুর ছিল (আধুনিক ঘোড়ার সহিত তুলনীয়)। মেরিচিপ্পাসকে প্রাচীন ঘোড়া এবং আধুনিক ঘোড়ার মধ্যবর্তী বলা হয়।

প্লিওসিন-ঘোড়া (Pliocene Horses) ঃ

মিওসিন ইপক-এর শেষদিকে তৃণভোজী (Grazing) ঘোড়া বিভিন্ন দিকে বিস্তার লাভ করে। প্লিওসিন ইপক-এ যে সকল ঘোড়ার জীবাশ্ম পাওয়া যায় তাহাদের দুইটি প্রধান বিভাগে বিভক্ত করা যায় ঃ

তিন আঙুল বিশিষ্ট (3 tola) তৃণভোজী ঘোড়া।

1. **হিপ্পারিওন** (Hipparion) ঃ হিপ্পারিওন উত্তর আমেরিকায় আবির্ভূত হয় কিন্তু এশিয়া এবং ইওরোপে বিস্তার লাভ করে, হিপ্পারিওনের জীবাশ্ম চীন, ভারত, মধ্য এশিয়া, গ্রীস, পশ্চিম ইউরোপ প্রভৃতি অঞ্চলে পাওয়া যায়।

2. **প্লিওহিপ্পাস** (Pliohippus) ঃ ইহারা মিওসিন-এর শেষদিকে সম্ভবতঃ মেরিচিপ্পাস হইতে উদ্ভূত হয়। প্লিওহিপ্পাস প্রথম এক আঙুল বিশিষ্ট (One toed) ঘোড়া। সামনের পা ও পিছনের পায়ে একটি করিয়া আঙুল থাকে এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থ আঙুল ক্ষুদ্রাকারের স্প্লিণ্ট (Splint)-এ পরিবর্তিত। প্লিওহিপ্পাসের উপরের দাঁতের মোলারগুলি আধুনিক ঘোড়ার মোলার মত, তবে ইহাদের উচ্চতা প্রায় এক মিটারের মত ছিল।

3. **ইকুয়াস** (Equus) ঃ প্লিওসিনের শেষদিকে প্লিওহিপ্পাস হইতে আধুনিক ঘোড়া বা ইকুয়াসের আবির্ভাব হয়। ইকুয়াসের পায়ে প্রথম ও পঞ্চম আঙুল একেবারেই থাকে না এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থ আঙুল স্প্লিণ্ট (Splint) হিসাবে থাকে। কেবল তৃতীয় আঙুলটি সমগ্র দেহের ভার বহন করে। ইহাদের মোলার দাঁতের ক্রাউনগুলি দীর্ঘ হয় এবং এনামেলে প্রচুর খাঁজ দেখা যায়। ইহা তৃণভোজী (Grazing) খাদ্যাভ্যাসের সহায়ক।

আধুনিক ঘোড়ার দেহের গঠন দৌড়াইবার জন্য বিশেষভাবে অভিযোজিত। ঘোড়ার অভিব্যক্তি লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে প্রাচীন ঘোড়া হইতে বর্তমান ঘোড়া ক্রমশঃ আকারে বৃদ্ধি পাইয়াছে, খাদ্যাভাস ও চলনে

পরিবর্তিত হইয়াছে এবং সর্বোপরি একটি বুদ্ধিমান গৃহপালিত প্রাণীতে পরিণত হইয়াছে। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যায় যে উত্তর আমেরিকায় ঘোড়ার উৎপত্তি হইলেও পরবর্তীকালে সেখানে ঘোড়া বিলুপ্ত (Extinct) হইয়া যায়। ইহার প্রকৃত কারণ এখনও জানা যায় নাই।

ঘোড়ার ক্রমবিকাশ—সারাংশ

রিসেন্ট		আধুনিক ঘোড়া	জেব্রা ও গাধা
		↑	
প্লিস্টোসিন		ইকুয়াস	বিলুপ্ত
			↑
প্লিওসিন	হিপ্পারিয়ন	প্লিওহিপ্পাস	হিপ্পিডিওন
মিওসিন	হাইপোহিপ্পাস	মেরিচিপ্পাস	
		প্যারাহিপ্পাস	
ওলিগোসিন		মিওহিপ্পাস	
		মেসোহিপ্পাস	
		এপিহিপ্পাস	
ইওসিন		ওরোহিপ্পাস	
		হাইরেকোথেরিয়াম—ইওহিপ্পাস	
		↑	
		অজ্ঞাত পূর্বপুরুষ	

ঘোড়ার ক্রমবিকাশের রেখাচিত্র

অনুশীলনী

1. আধুনিক ঘোড়ার দেহের গঠনে কি কি বৈশিষ্ট্য দেখা যায়?
2. ঘোড়ার প্রথম পূর্বপুরুষের নাম কি? ইহার জীবাশ্ম কোথায় পাওয়া যায়? ইহার কি কি বৈশিষ্ট্য ছিল?
3. ইওহিপ্পাস, মেসোহিপ্পাস এবং মেরিচিপ্পাস-এর প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি সংক্ষেপে উল্লেখ কর।
4. ইওসিন, ওলিগোসিন ও প্লিওসিন ইপক-এ যে সকল ঘোড়ার জীবাশ্ম পাওয়া গিয়াছে তাহাদের নামোল্লেখ কর।

5. ঘোড়ার ক্রমবিকাশ কিভাবে হইয়াছে, তাহা সংক্ষেপে লিখ।
6. ঘোড়ার ক্রমবিকাশের একটি সংক্ষিপ্ত রেখাচিত্র অঙ্কন কর।
7. সংক্ষিপ্ত টীকা লিখ :

   (ক) হাইরাকোথেরিয়াম (খ) ইওহিপ্পাস (গ) এপিহিপ্পাস (ঘ) মেসোহিপ্পাস (ঙ) আর্কিওহিপ্পাস (চ) মেরিচিপ্পাস (ছ) হিপ্পারিওন ও (জ) ইকুয়াস।

গ্রন্থপঞ্জী ও নির্দেশিকা (References)

1. Colbert E. H. 1955. Evolution of the Vertbrates. John Wiley & Sons.
2. Lull, R. S. 1945. Organic Evolution, The Macmillan Co. New York.
3. Moody P. A. 1964. Introduction to Evolution, Harper and Row, New York.
4. Simpson G. G. 1951. Horses, Oxford University Press, New York.
5. Romer A. S. 1945. Vertebrate Paleontology, University of Chicago Press.

নবম অধ্যায়

হাতী এবং উটের ক্রমবিকাশ (Evolution of Elephant and Camel)

পৃথিবীর বিভিন্ন শিলাস্তরে প্রাপ্ত জীবাশ্মের ভিত্তিতে যেমন ঘোড়ার ক্রমবিকাশ পর্যবেক্ষণ করা যায়, অনুরূপভাবে হাতী এবং উটের ক্রমবিকাশও লক্ষ্য করিতে পারা যায়। এখানে হাতী এবং উটের ক্রমবিকাশ পৃথকভাবে উল্লেখ করা হইল।

হাতীর ক্রমবিকাশ (Evolution of Elephant)

প্রাণিজগতে আধুনিক হাতী একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে। ইহার বিরাট আকার এবং শুঁড়ের বৈশিষ্ট্যের জন্য ইহাকে সহজেই অন্যান্য প্রাণী হইতে পৃথক করা যায়। বিভিন্ন শিলাস্তরে প্রাপ্ত জীবাশ্মের ভিত্তিতে হাতীর ক্রমবিকাশ লক্ষ্য করিলে ইহার পূর্বপুরুষের সরল গঠন হইতে জটিল গঠনের উদ্ভব সহজেই বুঝিতে পারা যায়। শুঁড়বিশিষ্ট হাতীকে প্রোবোসিডিয়া (Proboscidea) বিভাগের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ইহাদের কয়েকটি অনুন্নত বা আদিম (Primitive) বৈশিষ্ট্য এবং কয়েকটি উন্নত ধরণের বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়:

প্রোবোসিডিয়ার আদিম বৈশিষ্ট্য (Primitive characters of Proboscidea):

ইহাদের মস্তিষ্ক উন্নত কিন্তু সেরিব্রাম অংশটি সেরিবেলামকে সম্পূর্ণ আবৃত করে না। ইহাদের পাকস্থলী সরল ধরণের, যকৃতে দুইটি লতি বা খণ্ড আছে কিন্তু পিত্তথলি নাই। ইহাদের ফুসফুস সরল ধরণের এবং প্লাসেন্টা আদি প্রকৃতির। হাতীর প্রতি পায়েই পাঁচটি করিয়া আঙ্গুল থাকে।

বিশেষ বা উন্নত ধরণের বৈশিষ্ট্য (Specialised features):

প্রোবোসিডিয়া বা হাতীর প্রধান বিশেষত্ব উহার বিরাট আকার। এই বিরাট দেহের ভার বহন করিবার জন্য উহার পাগুলিও থামের মত (Pillar

like)। প্রতি পায়ে পাঁচটি করিয়া আঙ্গুল থাকিলেও উহারা মাংস ও চর্মে আবৃত থাকে। সামনের পায়ের রেডিয়াস (Radius) ক্ষয়প্রাপ্ত কিন্তু আলনা (Ulna) অত্যন্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত। ইহাদের গলা স্থূল এবং মাথাটি বিরাট। ইহাদের নাসিকা এবং উপরোষ্ঠ বৃদ্ধি পাইয়া শুঁড় বা প্রোবোসিস (Probosies) গঠন করিয়াছে। শুঁড়ের অগ্রভাগে নাসাছিদ্র এবং ক্ষুদ্র বস্তু ধরিবার জন্য আঙ্গুলের মত প্রবর্ধক (Finger like process) আছে। উপরের চোয়ালের দুটি ইনসাইজর দন্ত পরিবর্তিত হইয়া হাতীর দাঁত বা টাস্ক (Tusk) গঠন করে। ইহাদের দাঁতের সংখ্যা মাত্র 28টি। ইহাদের মস্তিষ্ক আকারে বৃহৎ; মানুষের মস্তিষ্কের প্রায় দ্বিগুণ। ইহাদের দৃষ্টিশক্তি দুর্বল কিন্তু ঘ্রাণশক্তি এবং শ্রবণশক্তি প্রবল।

হাতীর জাতিগত ক্রমবিকাশ (Phylogeny of Elephant):

হাতীর জাতিগত ক্রমবিকাশের ইতিহাস বিভিন্ন জীবাশ্মের মাধ্যমে প্রায় সম্পূর্ণভাবেই পাওয়া গিয়াছে কিন্তু হাতীর প্রথম পূর্বপুরুষ কে তাহা লইয়া মতভেদ দেখা যায়। বিজ্ঞানী লাল (Lull)-এর মতে **মেরিথেরিয়াম** (Moeritherium) সর্বাপেক্ষা প্রাচীন হাতী কিন্তু স্কট (Scott) মনে করেন যে **প্যালিওম্যাসটোডন** (Palaeomastodon) প্রকৃতপক্ষে সকল হাতীর পূর্বপুরুষ।

১। **মেরিথেরিয়াম (Moeritherium):** ইহার জীবাশ্ম মিশরদেশে উপরের ইওসিন এবং নীচের ওলিগোসিন স্তর হইতে পাওয়া যায়। মেরিথেরিয়ামের আকার অন্যান্য প্রোবোসিডিয়ান অপেক্ষা ক্ষুদ্র হইলেও ইহার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্যণীয়। ইহার মাথাটি লম্বা এবং চোখ সামনের দিকে ছিল। ইহাদের শুঁড় বা প্রোবোসিস ছিলনা কিন্তু মুখের সামনের দিক সরু হইয়া গিয়াছিল। উপরের ইনসাইজরের দ্বিতীয় জোড়া বড় দাঁতে পরিণত হইয়াছিল মোলার দাঁতগুলিতে বহু খাঁজ ছিল। ইহার দাঁতের সংখ্যা ছিল মোট 36টি। মেরিথেরিয়াম উচ্চতায় মাত্র 1 মিটার ছিল এবং সম্ভবতঃ ইহা কর্দমাক্তলে বাস করিত।

২। **প্যালিওম্যাসটোডন** (Palaeomastodon): ইহার জীবাশ্ম মশিরদেশের ওলিগোসিন স্তর হইতে পাওয়া গিয়াছে। ইহারা মেরিথেরিয়াম

হইতে আকারে বড় ছিল। ইহাদের প্রোবোসিস বা শুঁড় দীর্ঘ ছিল এবং সম্ভবতঃ প্রসারণশীল ছিল। ইহাদের করোটির অস্থিতে প্রচুর বায়ুগহ্বর দেখা যায় এবং দাঁতের সংখ্যাও হ্রাস পায় (মোট 28টি)।

ইহাকে প্রকৃত ম্যাসটোডনের পূর্বপুরুষ বলিয়া অনুমান করা হয়।

৩। **ফায়োমিয়া** (Phiomia) ঃ ইহার জীবাশ্মও মিশর দেশের ওলি-গোসিন ইপকের নীচের স্তর হইতে আবিষ্কার করা হয়। ফায়োমিয়ার সঠিক অবস্থান লইয়াও মতভেদ দেখা যায়। লাল (Lull) মনে করেন মেরিথেরিয়াম হইতে ফায়োমিয়ার উৎপত্তি হইয়াছে কিন্তু স্কট (Scott) ইহাকে হাতীর



চিত্র 25 : হাতীর ক্রমবিকাশ।

ক্রমবিকাশের প্রধান রেখার পার্শ্বে রাখিতে চান। ইহা মেরিথেরিয়াম হইতে আকারে বড়, ইহার মাথায় একটি ছোট শুঁড় এবং করোটিতে বহু বায়ুগহ্বর দেখা যায়। ইহার দাঁতের সংখ্যাও 28 এবং তাহাতে ক্যানাইন সম্পূর্ণ অনুপস্থিত।

৪। **ট্রাইলোফোডন** (Trilophodon)ঃ ইহার আবির্ভাব ওলিগোসিন এর শেষের দিকে হয় এবং মিওসিন দশায় ইহার প্রাচুর্য্য ঘটে। সম্ভবতঃ প্যালিওম্যাসটোডন হইতে ইহার আবির্ভাব হয় এবং পরে ইহার পরিবর্তন ঘটে। ট্রাইলোফোডন আকারে প্রায় ভারতীয় হাতীর মত ছিল। ইহার উপরের ও নীচের চোয়ালে বড় দাঁত বা টাস্ক ছিল। মাথার সামনের দিকে ছোট শুঁড় এবং মাথার করোটিতে যথেষ্ট বায়ুগহ্বর ছিল। ট্রাইলোফোডন ভৌগোলিক বিস্তার লাভ করে এবং এশিয়া হইতে মিওসিন ইপক-এ উত্তর আমেরিকায় গিয়া পৌছায়।

৫। **ম্যাসটোডন** (Mastodon)ঃ প্যালিপম্যাসটোডন হইতে ম্যাসটোডনের উদ্ভব হয় এবং ইহারা মিওসিন ইপকে প্রাধান্য বিস্তার করে। ইহাকেই আমেরিকার হাতী (American Elephant) বলা হয়। ইহাদের নীচের চোয়াল ছোট ছিল এবং মোলার দাঁতের গঠন সরল ছিল। ইহাদের উপরের চোয়ালে 20টি এবং নীচের চোয়ালে 18টি দাঁত ছিল। ই $\frac{1\ \ 1}{0(1)0(1)}$ ক $\frac{0.0}{0.0}$ প্রি $\frac{1\ \ 1}{1\ \ 1}$, মো $\frac{3\ 3}{3\ 3} = \frac{20}{18}$ (20) ইহাদের পায়ের অস্থিগুলি সুপরিণত এবং করোটির মধ্যে বায়ুথলি বা ডিপলো (Diploe)-এর প্রাচুর্য ছিল। রোমার (Romer)-এর মতে প্যালিওম্যাসটোডন এবং ফায়োমিয়া হইতে মাসটোডনের উৎপত্তি হয়। মাসটোডনের সঠিক বংশধারা ও সম্পর্ক জানা না গেলেও ইহারা যে একসময় পৃথিবীতে প্রাধান্য বিস্তার করিয়াছিল তাহা লক্ষ্য করা যায়।

৬। **স্টিগোডন** (Stegodon)ঃ পরবর্তীকালে (প্লিওসিন ইপক-এ) স্টিগোডন-এর আবির্ভাব হয় এবং উহা ম্যাসটোডনকে স্থানচ্যুত করে। স্টিগোডনের কয়েকটি মধ্যবর্তী বৈশিষ্ট্যের জন্য উহাকে অন্তর্বর্তী বা মধ্যবর্তী হস্তী (Transitional elephant) বলা হয়। ইহাদের মাথার আকার বড় ছিল, শুঁড় যথেষ্ট লম্বা ছিল এবং মোলার দাঁতের আকার আধুনিক যুগের হাতীর মতই ছিল। স্টিগোডন একসময় পৃথিবীর সর্বত্র পাওয়া যাইত এবং সেইজন্য অনেকেই ইহাকে বর্তমান হাতীর প্রকৃত পূর্বপুরুষ বলিয়া মনে করেন। উত্তর আমেরিকায় ম্যাস্টোডন হইতে যে স্টিগোডনের উৎপত্তি হয় রোমার

(Romer) তাহাকে **স্টিগোম্যাস্টোডন** (Stegomastodon) নামে অভিহিত করেন।

স্টিগোডন দক্ষিণ এশিয়ায় প্রচুর বাস করিত এবং ইহা হইতেই বর্তমান হাতীর উৎপত্তি হয়।

৭। **ম্যামথ** (Mammoth) : প্লিওসিনের শেষভাগে অথবা প্লিসটোসিনের প্রথমভাগে ইওরোপ ও এশিয়ায় ম্যামথ দেখা যায়। ইহারা সম্ভবতঃ স্টিগোডন অথবা স্টিগোম্যাস্টোডন-এর বংশধর। ইহাদের আকার বর্তমান হাতীর মতই, কোনো কোনো ম্যামথ বর্তমান হাতী অপেক্ষা আকারে বৃহৎ ছিল। ইহাদের নীচের চোয়ালে বড় দাঁত ছিলনা কিন্তু মোলার দাঁত বহু খাঁজবিশিষ্ট ও জটিল গঠনের ছিল। ইহারা সাধারণতঃ শীতপ্রধান অঞ্চলে বাস করিত এবং উহাদের গায়ে প্রচুর রোম ছিল। সাইবেরিয়া হইতে বরফে জমিয়া যাওয়া ম্যামথের সম্পূর্ণ দেহ পাওয়া গিয়াছে। প্লিস্টোসিনের শেষভাগে পৃথিবী হইতে ম্যামথের বিলুপ্তি ঘটে।

৮। **বর্তমান হাতী** (Living Elephant) : স্টিগোডন পূর্বপুরুষ হইতে প্রকৃত হাতীর সৃষ্টি হয় এবং একসময় উহারা এশিয়া, ইওরোপ এবং আফ্রিকার বিভিন্ন প্রান্তে বাস করিত। এখন প্রায় সকল প্রজাতিগুলির বিলুপ্তি ঘটিয়াছে এবং পৃথিবীতে মাত্র দুইটি প্রজাতি বাঁচিয়া আছে :

(ক) **ভারতীয় হাতী বা এলিফাস ম্যাক্সিমাস** (*Elephas maximus*) এবং

(খ) **আফ্রিকার হাতী বা লোক্সোডন্টা আফ্রিকানা** (*Loxodonta africana*)

ভারতীয় হাতীর উচ্চতা আফ্রিকার হাতী অপেক্ষা কম এবং ইহাদের কানের আকার ছোট। আফ্রিকার হাতীর দাঁতের আকারও বড় হয়। তবে ভারতীয় হাতী সংখ্যায় অধিক, বুদ্ধিমান এবং সহজে পোষ মানে।

হাতীর ক্রমবিকাশ : সারাংশ

রিসেন্ট — এলিফাস — লোক্সোডন্টা
প্লিস্টোসিন — ম্যামথ (বিলুপ্ত)
প্লিওসিন — স্টিগোডন
মিওসিন — ম্যাসটোডন ↑ (বিলুপ্ত)
অলিগোসিন — প্যালিওম্যাসটোডন→ট্রাইলোফোডন →ফায়োমিয়া
ইওসিন — মেরিথেরিয়াম← ↑
অজানা পূর্বপুরুষ

চিত্র : হাতীর ক্রমবিকাশের রেখাচিত্র।

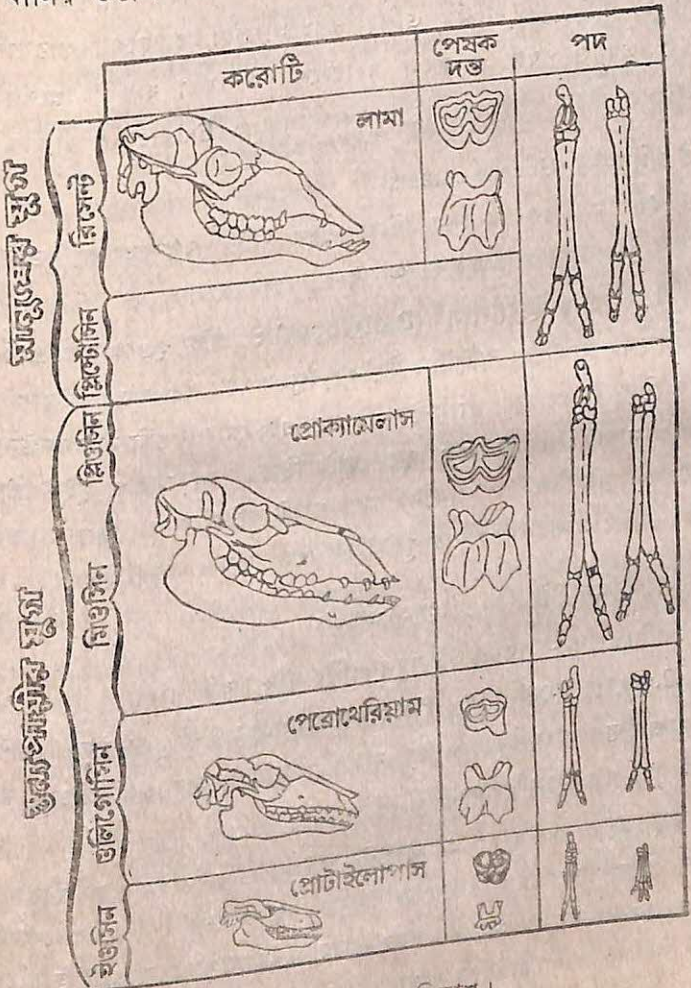
উটের ক্রমবিকাশ (Evolution of Camel)

উটকে মরুভূমি জাহাজ বলা হয় কারণ তাহাদের দেহের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য তাহাদের মরুভূমিতে বাস করিবার উপযোগী করিয়া তুলিয়াছে। বিভিন্ন জীবাশ্মের সাহায্যে উটের ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে জানা যায়। উটের ক্রমবিকাশ লক্ষ্য করিলে দেখা যায় পূর্বে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে নানা জাতির উটের আবির্ভাব হয় কিন্তু বর্তমানে উটের কেবল দুইটি গণ জীবিত আছে, যথা—

(ক) ক্যামেলাস (*Camelus*) : যাহা এশিয়া ও আফ্রিকা বাস করে।
(খ) লামা (*Llama*) : যাহা দক্ষিণ আমেরিকায় বাস করে।

উটের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য (Characteristics) : বর্তমান কালের উটে কয়েকটি বৈশিষ্ট্য দেখা যায়, যথা—উটের পাগুলি লম্বা ও দুটি আঙুল বিশিষ্ট হয়। বালির উপর দিয়া চলার জন্য ইহাদের কয়েকটি অভিযোজন দেখা যায়। ইহাদের পায়ের খুরগুলি ক্ষুদ্রাকার (প্রায় নখের মত)। মেটাপডিয়াল (Metapodial) যুক্ত হইয়া ক্যানন বোন (Cannon bone) গঠন করে। পায়ে একটি বা দুটি কুশনের মত প্যাড থাকে। দাঁতের সংখ্যা কমিয়া 34 হইয়াছে, উপরের চোয়ালে একদিকে একটি করিয়া ইনসাইজর থাকে। মোলার দাঁত উচ্চ ক্রাউন বিশিষ্ট এবং উহাতে চারটি খাঁজ (Cusp) থাকে। উটের পাকস্থলীতে তিনটি প্রকোষ্ঠ এবং রুমেনের প্রাচীরে জলকোষ (Water-

cells) থাকে। উটের কুঁজ তাহার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। কোনো কোনো উটের পিঠে একটি কুঁজ এবং কাহারও দুইটি কুঁজ থাকে। উটের মাথাটি লম্বা গলার প্রান্তে, উপরের দিকে থাকে; ইহার ফলে উহার চোখ, নাক ও কান বালির উত্তাপ হইতে রক্ষা পায়। চোখের উপর বড় চোখের পাতা,



চিত্র 26 : উটের ক্রমবিকাশ।

নাকের ভিতর ভাল্ভ এবং কানের ভিতর প্রচুর রোম থাকায় এই অঙ্গগুলি বালি হইতে রক্ষা পায়।

উৎপত্তিস্থল (Place of origin) : প্রাচীন উটের উৎপত্তিস্থল উত্তর আমেরিকা। ইহাদের পূর্বপুরুষদের জীবাশ্ম উপরের দিকের ইওসিন ইপক-এ পাওয়া যায় কিন্তু নীচের দিকে পাওয়া যায় না। প্লিওসিন-ইপক-এর পূর্বে তাহাদের জীবাশ্ম অন্য কোনো দেশে পাওয়া যায় নাই। প্লিওসিন ইপক-এ ইহারা দক্ষিণ আমেরিকা, এশিয়া এবং আফ্রিকা মহাদেশে বিস্তারলাভ করে এবং এখনও পর্যন্ত ঐ সকল মহাদেশে উট দেখা যায়। প্লিস্টোসিনের মধ্যভাগে উহারা উত্তর আমেরিকা হইতে অবলুপ্ত (Extinct) হইয়া যায়।

ইওসিন-উট (Eocene camels)

ইওসিন ইপক-এর শেষ দিকে প্রথম উটের পূর্বপুরুষের আবির্ভাব হয়। ইহার পূর্বে উটের আবির্ভাবের অস্তিত্ব আমাদের অজ্ঞাত।

1. **প্রোটাইলোপাস** (Protylopus) : এই ক্ষুদ্রাকার, প্রায় বড় খরগোশের আকারের প্রাণীটিকে উটের পূর্বপুরুষ মনে করা হয়। ইহার 44টি দাঁত ছিল, যাহার মধ্যে ক্যানাইনগুলি বড় এবং মোলারগুলি নীচু ক্রাউনযুক্ত। ইহার মাথার করোটি এবং মুখ ছোট ছিল। সামনের পা দুইটি পিছনের অপেক্ষা ছোট ছিল এবং সামনের পায়ে চারটি করিয়া আঙ্গুল ছিল। আলনা এবং রেডিয়াস পরস্পর হইতে পৃথক ছিল এবং ফিবুলা সম্পূর্ণ ছিল।

ওলিগোসিন-উট (Oligocene camels)

ওলিগোসিন-ইপক-এ উট সদৃশ প্রাণীর সংখ্যা বৃদ্ধি পায়।

2. **পেব্রোথেরিয়াম** (Poebrotherium) : এই উট-সদৃশ প্রাণীটির জীবাশ্ম উত্তর আমেরিকায় পাওয়া যায়। ইহার আকার একটি ভেড়ার মত। গলা লম্বা এবং করোটি সরু।

ইহাদের দাঁতের সংখ্যা 44 এবং ইনসাইজর ও ক্যানাইন স্তন্যপায়ীর মত। উপরের চোয়ালের মোলার ক্ষুদ্র ক্রাউনযুক্ত কিন্তু নীচের চোয়ালের মোলার-গুলি লম্বা ধরনের। ইহাদের পাগুলি লম্বা এবং আঙ্গুলের সংখ্যায় হ্রাস দেখা যায়। আলনা ও রেডিয়াস সংযুক্ত থাকে এবং ফিবুলাও উপর দিকে সংযুক্ত হয়। ইহাদের খুরের আকৃতি হরিণের খুরের মত ছিল।

ওলিগোসিন ইপক-এ আরো দুইটি উট সদৃশ প্রাণীর জীবাশ্ম পাওয়া যায় —একটি **প্রোটোমেরিক্স** (*Protomeryx*) যাহার সহিত পেব্রোথেরিয়ামের

সাদৃশ্য দেখা যায় এবং অপরটি **প্যারাটাইলোপাস** (*Paratylopus*)—যাহাকে জিরাফ-উটের পূর্বপুরুষ বলিয়া অনুমান করা হয়।

মিওসিন-উট (Miocene camels) :

মিওসিন ইপক-এ উটের ক্রমবিকাশ এবং বিস্তার লক্ষ্যনীয়. এই সময়ের উটকে দুটি বিভাগে বিভক্ত করা যায়, যথা—প্রোটোমেরিক্স (*Protomeryx* এবং প্রোক্যামেলাস (Procamelus)। অন্যান্য উটের মধ্যে **স্টেনোমাইলাস** (Stenomylus), **অক্সিড্যাকটাইলাস** এবং **অলটিক্যামেলাস** (*Oxydactylus and Alticamelus*) উল্লেখযোগ্য।

1. **প্রোটোমেরিক্স** (*Protomeryx*) : ইহার জীবাশ্ম নীচের মিওসিনে পাওয়া যায়। ইহাদের দাঁতের সংখ্যা 44 ছিল এবং দাঁতের গঠন দেখিয়া মনে হয় ইহারা কঠিন ঘাস চিবাইয়া খাইত। ইহাদের পায়ে দুইটি করিয়া আঙ্গুল এবং হরিণের মত সরু ধরনের খুর ছিল। সম্ভবতঃ ইহা হইতেই দক্ষিণ আমেরিকার লামার উদ্ভব হয়।

2. **প্রোক্যামেলাস** (*Procamelus*) : ইহার জীবাশ্ম উপর দিকের মিওসিনে পাওয়া যায়। প্রোক্যামেলাসকে বর্তমান উটের পূর্বপুরুষ মনে করা হয়। ইহাদের দাঁতের সংখ্যায় হ্রাস দেখা যায়, পরিণত বয়সে প্রথম এবং দ্বিতীয় ইনসাইজর থাকে না। মেটাপোডিয়াল সংযুক্ত হইয়া ক্যানন বোন গঠনের চেষ্টা করে। মরুভূমিতে বাস করিবার জন্য ইহাদের সামনের ও পিছনের পায়ে গদি বা প্যাড দেখা যায়।

স্টেনোমাইলাস (*Stenomylus*), **অক্সিড্যাকটাইলাস** (*Oxydactylus*) এবং **অলটিক্যামেলাস** (*Alticamelus*) প্রভৃতি উট সদৃশ প্রাণীকে বর্তমান উটের পূর্বপুরুষ মনে করা হয় না, ইহাদের স্থায়িত্বকাল কম ছিল এবং ইহারা বিবর্তনে এক পাশে পড়িয়াছিল। ইহাদের মধ্যে স্টেনোমাইলাসকে গ্যাজেল উট (Gazelle camel) এবং অক্সিড্যাকটাইলাস ও অলটিক্যামেলাসকে জিরাফ উট (Griraffe camel) বলা হয়। ইহার অর্থ এই নয় যে ইহারা জিরাফের পূর্বপুরুষ ছিল, কেবল জিরাফের লম্বা গলার মত ইহাদেরও গলা লম্বা ছিল।

প্লিওসিন এবং প্লিস্টোসিন-উট (Pliocene and Pleistocene camels) :

মিওসিন ইপক-এর প্রোক্যামেলাস হইতে প্লিওসিন এবং প্লিস্টোসিন

ইপক-এর উটের ক্রমবিকাশ হয়। প্লিওসিন ও প্লিস্টোসিন ইপক-এর উটের নাম ক্যামেলপ্‌স্ (*Camelops*) এবং এসচাটিয়াস (*Eschatius*)। ইহাদের জীবাশ্মের সংখ্যা বিশেষ পাওয়া যায় নাই সেইজন্য ইহাদের সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না।

তবে এই ইপক-এ প্রকৃত উট **ক্যামেলাস** (*Camelus*)-এর প্রচুর জীবাশ্ম পাওয়া যায়। প্রোক্যামেলাসের সহিত ইহাদের দুইটি বৈসাদৃশ্য দেখা যায়, প্রথমতঃ উপরের চোয়ালে দুইটি ইন্‌সাইজর কম থাকে এবং দ্বিতীয়ত নীচের চোয়ালে দুইটি প্রিমোলার থাকে না। **ক্যামেলাস** আমেরিকা হইতে বিস্তারলাভ করিয়া পুরাতন পৃথিবীতে (Old World) আসে। ভারতের শিবালিক প্রস্তরের মধ্যে ইহার জীবাশ্ম পাওয়া গিয়াছে। কয়েকটি ক্যামেলাসের জীবাশ্ম দক্ষিণ রাশিয়া, রুমানিয়া, আলজিরিয়া প্রভৃতি দেশেও আবিষ্কৃত হইয়াছে।

তবে উত্তর আমেরিকায় উটের বিলুপ্তির কারণ এখনও জানা যায় নাই।

উটের ক্রমবিকাশ : সারাংশ

রিসেন্ট	লামা (অচেনিয়া)	আধুনিক উট (ক্যামেলাস)
প্লিস্টোসিন	↑ ক্যামেলপস্	↑ ক্যামেলাস
প্লিওসিন	↑ লামা প্রোক্যামেলাস →	↑ ক্যামেলাস
মিওসিন	স্টেনোমাইলাস প্রোটো-মেরিক্স	অলটি-ক্যামেলাস
ওলিগোসিন	পেব্রেথেরিয়াম	প্যারাটাইলোপাস
ইওসিন	প্রোটাইলোপাস ↑ অজানা পূর্বপুরুষ	

চিত্র : উটের ক্রমবিকাশের রেখাচিত্র।

[বিঃ দ্রঃ আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে ঘোড়া, হাতী এবং উটের ক্রমবিকাশের বহু শাখা-প্রশাখা দেখা যায়—এখানে তাহার মূলরূপের রেখাচিত্রটি দেওয়া হইল।]

হাতীর ক্রমবিকাশ : অনুশীলনী

1. প্রোবোসিডিয়া কাহাকে বলে ? ইহার কয়েকটি আদিম বৈশিষ্ট্য এবং কয়েকটি উন্নত ধরনের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ কর।
2. হাতীর পূর্বপুরুষ কাহাকে বলা হয় ? ইহার জীবাশ্ম কোথায় পাওয়া গিয়াছে ?
3. মেরিথেরিয়াম এবং প্যালিওম্যাসটোডন-এর মধ্যে কোনটি হাতীর প্রথম পূর্বপুরুষ এবং কেন ?
4. আমেরিকান হাতী কাহাকে বলে ? ইহাদের বৈশিষ্ট্য কি ছিল ?
5. ম্যামথ কি ? ইহাদের কোথায় দেখা যাইত ? ইহাদের বৈশিষ্ট্য কি ছিল ?
6. বর্তমান হাতী কোথায় কোথায় দেখা যায় ? ইহাদের বৈজ্ঞানিক নাম কি ?
7. হাতীর ক্রমবিকাশের রূপটি সংক্ষিপ্তভাবে উল্লেখ কর।

উটের ক্রমবিকাশ : অনুশীলনী

1. বর্তমানে উট কোথায় কোথায় দেখা যায় ? ইহাদের বৈশিষ্ট্য কি ?
2. প্রোটাইলোপাস এবং পেব্রোথেরিয়াম-এর কি কি বৈশিষ্ট্য ছিল ?
3. প্রোটোমেরিক্স এবং প্রোক্যামেলাস কোন ইপক-এ পাওয়া যায় ? ইহাদের গঠনে কি কি বৈশিষ্ট্য ছিল ?
4. উটের ক্রমবিকাশ কিভাবে হয় তাহা সংক্ষেপে লিখ।
5. উটের ক্রমবিকাশের রেখাচিত্রটি অঙ্কন কর।
6. সংক্ষিপ্ত টীকা লিখ :
   (ক) ক্যামেলাস (খ) প্রোটাইলোপাস (গ) প্রোক্যামেলাস (ঘ) জিরাফ-উট ও (ঙ) প্রোটোমেরিক্স।

গ্রন্থপঞ্জী ও নির্দেশিকা (References)

1. Colbert E. H. 1955. Evolution of the Vertebrates, John Wiley and Sons, 1955.
2. Lull R. S, 1945. Organic Evolntion, The Macmillan Co. New York.
3. Moody P. A. 1964. Introduction to Evolution, Harper and Row, New York.

4. Simpson G. G. 1949. The Meaning of Euolution, Yale University Press, New Haven
5. Mukherjee D. 1972. Text Book of Zoology, New Book Stall, Calcutta.
6. Adhikari and Sinha 1973. Fundamentals of Biology of Animals. New Central Book Agency, Calcutta.

দশম অধ্যায়

মানুষের আবির্ভাব ও ক্রমবিকাশ
(Origin and Evolution of Man)

জীবজগতের ক্রমবিকাশের ইতিহাসে মানুষের আবির্ভাব অতি সম্প্রতি হইয়াছে বলা যায়। যদিও বুদ্ধি, বিচার এবং সভ্যতার দ্রুত বিকাশের ফলে মানুষ আজ পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ জীবরূপে প্রকৃতির উপর প্রভুত্ব করিতেছে, কিন্তু এমন একসময় ছিল যখন অন্যান্য প্রাণীর মত মানুষও প্রকৃতির হাতের ক্রীড়নক ছিল।

পূর্বে অনেকের ধারণা ছিল যে বানর হইতে বা বনমানুষ হইতে মানুষের সৃষ্টি হইয়াছে, কিন্তু এইরূপ ধারণা সঠিক নয়। অন্যান্য স্তন্যপায়ী প্রাণীর মত মানুষের ক্রমবিকাশও যথেষ্ট জটিল এবং শাখা-প্রশাখাযুক্ত। বর্তমান বিজ্ঞানীদের মতে বানর বা বনমানুষ হইতে মানুষের আবির্ভাব হয় নাই বরং যে কাণ্ড স্টক (Stock) হইতে বানর (Monkey) এবং বনমানুষ বা এপ (Ape)-এর উদ্ভব হইয়াছে, তাহা হইতেই বর্তমান মানুষের পূর্ব পুরুষের উদ্ভব হয়। অন্যভাবে বলা যায় যে অ্যানথ্রোপয়েড এপ্ (Anthropoid ape) এবং মানুষের পূর্ব পুরুষ একই ছিল। পৃথিবীর বিভিন্ন শিলাস্তরে প্রাপ্ত জীবাশ্ম এই ধারণাকে সমর্থন করে। চার্লস ডারউইন তাঁহার 'ডিসেণ্ট অফ ম্যান' (Descent of man by Charles Darwin) নামক গ্রন্থে এপ্ এবং মানুষের উদ্ভব একই প্রকার পূর্বপুরুষ হইতে হইয়াছে এইরূপ ধারণা সর্বপ্রথম ব্যক্ত করেন, যদিও ডারউইন-এর সময় মানুষের পূর্ব পুরুষের কোনো জীবাশ্ম পাওয়া যায় নাই।

স্তন্যপায়ী প্রাণীর শ্রেণীবিভাগ অনুসারে লেমুর (Lemur), বানর (Monkey), এপ্ (Ape) এবং মানুষ (Man)—এগুলিকে একত্রে বর্গ-প্রাইমেট (Order-Primate)-এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এই সকল প্রাইমেট প্রাণীর পূর্ব পুরুষ ছিল বৃক্ষবাসী এক প্রকারের স্তন্যপায়ী—যাহাকে ট্রি-শ্রু (Tree-Shrew) বলা হয়। ইহারা পতঙ্গভুক প্রাণী এবং বর্গ ইনসেক্টিভোরার (Order-Inseetivora) অন্তর্গত। ইহার জীবাশ্ম প্যালিওসিন (Palaeocene) এবং ইওসিন (Eocene)-এর নীচের স্তর হইতে পাওয়া গিয়াছে যাহা হইতে

বিজ্ঞানীগণ অনুমান করেন যে ইহা প্রায় 7 কোটি বৎসর পূর্বে পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়। অধিকাংশ বিজ্ঞানীর মতে এইরূপ পতঙ্গভুক স্তন্যপায়ী হইতে প্রাইমেট প্রাণীর উদ্ভব হয়। এই প্রাইমেট প্রাণীর পূর্ব পুরুষ হইতেই বর্তমান কালের লেমুর, বানর, অ্যানথ্রোপয়েড এপ্‌স এবং মানুষের পূর্ব পুরুষের উদ্ভব হয়। ক্রমবিকাশের ধারা অনুসারে অ্যানথ্রোপয়েড এপ্‌স (যথা— গরিলা, শিম্পাঞ্জি, ওরাং-ওটান্ প্রভৃতি) মানুষের নিকটতম আত্মীয়।

মানুষ এবং এপ্‌-এর মধ্যে পার্থক্য (Difference between the Man and the Ape) : মানুষ এবং বনমানুষ বা অ্যানথ্রোপয়েড এপ-একই পূর্ব পুরুষ হইতে উদ্ভূত হইলেও উহাদের মধ্যে কয়েকটি বিশেষ পার্থক্য দেখা যায়, যথা—

(i) এপ্‌-এর মস্তিষ্কের গড় আয়তন মাত্র 500 সিসি কিন্তু মানুষের মস্তিষ্কের গড় আয়তন প্রায় 1500 সিসি।

(ii) এপ্‌-এর ক্ষেত্রে চতুষ্পদী গমন এবং মানুষের ক্ষেত্রে দ্বিপদী গমন দেখা যায়।

(iii) এপ্‌-এর ইনসাইজর এবং ক্যানাইন অপেক্ষাকৃত বড়।

(iv) এপ্‌-এর শ্রেণী বা পেলভিস (Pelvis) সরু এবং লম্বা কিন্তু মানুষের শ্রোণী চওড়া এবং বিস্তৃত।

(v) এপ্‌-এর হাত পা ও মুখের কিছু অংশ ছাড়া সমস্ত দেহ রোমে আবৃত, মানুষের দেহে অধিক রোম থাকে না।

(vi) এপ্‌ তাহার প্রয়োজনীয় দ্রব্য বা অস্ত্রশস্ত্র (Tools) প্রস্তুত করিতে পারে না কিন্তু মানুষ পারে।

উপরের আলোচনা হইতে এপ্‌ এবং মানুষের প্রধান কয়েকটি পার্থক্য বুঝিতে পারা যায়। মানুষের ক্রমবিকাশের ইতিহাসে এই পার্থক্যগুলি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কারণ প্রাগৈতিহাসিক যুগে মানুষের অধিকাংশ জীবাশ্মই এপ্‌ এবং মানুষের মধ্যবর্তী।

মানুষের ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে জানিতে হইলে প্রথমে মানুষের বৈশিষ্ট্যগুলি জানা প্রয়োজন। বর্তমান আধুনিক মানুষের বৈজ্ঞানিক নাম—**হোমো স্যাপিয়েনস্** যাহার অর্থ বুদ্ধিমান মানুষ (*Homo sapiens* = Wise man)। ইহার প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি সংক্ষেপে উল্লেখ করা হইল।

মানুষের বৈশিষ্ট্য ঃ

(1) ইহারা দ্বিপদী অর্থাৎ মানুষ দুইটি পায়ের সাহায্যে গমন করে, ফলে হাত দুইটি দিয়া অন্যান্য কাজগুলি করিতে পারে।

(2) নাক উপরদিকে উঠানো বা খাড়া এবং অগ্র প্রান্ত সূচাল।

(3) উপরের ওষ্ঠের মধ্যবর্তী স্থানে একটি চাপা খাঁজ দেখা যায়।

(4) ওষ্ঠের ভিতরের কিছু অংশ বাহিরে আসিয়া পড়ায় উহা রক্তাভ দেখায়।

(5) চিবুক (Chin) এবং গলা (Neck) সুস্পষ্ট।

(6) মস্তিষ্কের আকার এবং আয়তন সুবৃহৎ।

(7) মানুষ তাহার প্রয়োজনীয় অস্ত্রশস্ত্র বা যন্ত্রাদি গঠন করিতে পারে এবং উহাদের ব্যবহার করিতে পারে।

(8) মানুষ তাহার পরিবেশ ও প্রকৃতিকে আপন ইচ্ছানুসারে পরিবর্তিত করিতে সক্ষম।

(9) মানুষ কথাবার্তা, লিপি প্রভৃতির সাহায্যে নিজের ভাব প্রকাশে সক্ষম।

(10) মানুষ জটিল ধরনের সমাজ ব্যবস্থা, সংস্কৃতি, নান্দনিক তত্ত্ব প্রভৃতির ক্রমবিকাশে সক্ষম।

উপরোক্ত প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি ছাড়াও মানুষের মধ্যে গঠনগত, শারীর বৃত্তীয়, মানসিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, সভ্যতা-কেন্দ্রিক—নানা প্রকারের বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। এই সকল বৈশিষ্ট্যের জন্যই মানুষ বর্তমানে সকল প্রাণী হইতে পৃথক। নৃতত্ত্ববিদগণ (Anthropologists) আধুনিক মানুষের চুলের প্রকৃতি, দেহের বর্ণ, উচ্চতা, দেহের আকৃতি—প্রভৃতির ভিত্তিতে মানুষ জাতিকে কয়েকটি প্রধান বিভাগে বিভক্ত করিয়াছেন যথা—ককেসিয়ান (Caucasian), মঙ্গোলিয়ান (Mongolian) এবং নিগ্রো (Negro)। এই সকল প্রধান বিভাগগুলিকে আবার বিভিন্ন উপবিভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। অবশ্য বর্তমানে পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির মধ্যে মেলামেশা, বিবাহ প্রভৃতির ফলে এইরূপ জাতিবিভাগ গুরুত্বহীন হইয়া পড়িয়াছে।

মানুষের পূর্বপুরুষ (Ancestor of Man) :

মানুষের পূর্বপুরুষ কে ?—ইহা লইয়া যথেষ্ট মতভেদ আছে। এখনও পর্যন্ত মানুষ এবং এপ্-এর যে সকল জীবাশ্ম পাওয়া গিয়াছে তাহার ভিত্তিতে আফ্রিকার **প্রোকনসাল** (Proconsul) এবং এশিয়া ও ইউরোপের **ড্রায়োপিথেকাস** (*Dryopithecus*) কে এপ্ এবং মানুষের পূর্বপুরুষ বলিয়া মনে করা হয়। ইহাদের জীবাশ্ম প্রায় 1·5 কোটি বৎসরের প্রাচীন। ভারতের শিবালিক প্রস্তর স্তরে একাধিক এপ্ এবং মানুষের মধ্যবর্তী প্রাণীর জীবাশ্ম পাওয়া গিয়াছে। ইহাদের মধ্যে **শিবপিথেকাস** (*Shivapithecus*)-কে এপ্-এর পূর্বপুরুষ এবং **রামপিথেকাস** (*Ramapithecus*)-কে মানুষের পূর্বপুরুষ বলিয়া অনুমান করা হয়। রামপিথেকাস-এর জীবাশ্মটি প্রায় 1 কোটি বৎসরের প্রাচীন।

পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে প্রাচীন মানুষ ও তাহার পূর্বপুরুষের বহু জীবাশ্ম পাওয়া গিয়াছে। ইহাদের কাহারও কেবলমাত্র করোটি, কাহারও চোয়াল অথবা দাঁত, আবার কাহারও হাত অথবা পা-এর অস্থিগুলি বিক্ষিপ্ত অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে। এই সকল জীবাশ্ম হইতেই বিজ্ঞানীগণ তাহার আকৃতি-প্রকৃতি এবং ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে একটি ধারণা গঠন করিয়াছেন। মানুষের এই সকল সম্ভাব্য পূর্বপুরুষ সম্বন্ধে এখানে সংক্ষেপে আলোচনা করা হইল।

1. **আফ্রিকার এপ্-মানুষ** (African ape-man) : ইহার বৈজ্ঞানিক নাম **অস্ট্রালোপিথেকাস আফ্রিকানাস্** (*Australopithecus africanus*)। 1920 খ্রীষ্টাব্দে বিজ্ঞানী ডার্ট (Dart) ইহার মাথার খুলি, চোয়াল এবং দাঁতগুলি আবিষ্কার করেন। তাহার পর হইতে আফ্রিকায় এই ধরনের বহু জীবাশ্মের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে।

অস্ট্রালোপিথেকাসদের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য মানুষের মত এবং কয়েকটি বৈশিষ্ট্য এপ্-এর মত ছিল। ইহাদের মস্তিষ্কের আয়তন ছিল মাত্র 600 সিসি যাহা বর্তমানকালের গরিলার মস্তিষ্কের আয়তন। ইহাদের কপালের গঠন বহুলাংশে মানুষের মত ছিল। ইহাদের জীবাশ্ম হইতে জানিতে পারা যায় যে ইহারা দুইপায়ে চলাফেরা করিত এবং শিকার করিয়া খাইত। সাধারণতঃ এপ্ জাতীয় প্রাণীরা শাকাহারী হয়, কিন্তু এই প্রাণীটি শিকার করিয়া খাইত বলিয়া অনুমান করা হয় যে অস্ট্রালোপিথেকাসই মানুষের

পূর্বপুরুষ। ইহাদের চোখের ভ্রূ-এর উপর কোনো হাড় উঁচু ছিলনা এবং ইহাদের ক্যানাইন দাঁতও মানুষের দাঁতের মত ছোট ছিল, এপ্-এর মত বড় ছিল না। ইহারা উচ্চতায় প্রায় চার ফুট ছিল।

অস্ট্রালোপিথেকাস-এর বয়স লইয়াও মতভেদ দেখা যায়। ইহাদের প্রাচীন জীবাশ্মগুলি সাধারণতঃ প্লিস্টোসিন (Pleistocene)-যুগে অথবা আরো নীচের শিলাস্তরে পাওয়া যায়। ইহা হইতে অনুমান করা হয় যে ইহাদের আবির্ভাব প্রায় 20 লক্ষ বৎসর পূর্বে হইয়াছিল এবং ইহাদের সাম্প্রতিক জীবাশ্মগুলি প্রায় 9 লক্ষ বৎসর পূর্বের। কিন্তু সম্প্রতি ইথিওপিয়ার ওমোভ্যালিতে অস্ট্রালোপিথেকাসের যে প্রাচীনতম জীবাশ্মটি পাওয়া গিয়াছে তাহা অধ্যাপক হাওয়েল (Howel, 1967)-এর মতে প্রায় 40 লক্ষ বৎসরের পুরাতন।

প্রাপ্ত জীবাশ্মের ভিত্তিতে অস্ট্রালোপিথেকাসকে তিনটি প্রজাতিতে শ্রেণীবিভাগ করা হয়, যথা—

(i) **অস্ট্রালোপিথেকাস** রোবাস্টাস (*Australopithecus robustus*)।

(ii) **অস্ট্রালোপিথেকাস বসেই** (*Australopithecus boisei*) এবং

(iii) **অস্ট্রালোপিথেকাস আফ্রিকানাস** (Australopithecus *africanus*)।

ইহাদের মধ্যে শেষোক্ত প্রজাতিটির সহিত বর্তমান মানুষের অধিক সাদৃশ্য দেখা যায়।

2. **জাভার এপ্ মানুষ** (Java Ape-man) : পূর্বে ইহার বৈজ্ঞানিক নাম ছিল **পিথেকানথ্রোপাস ইরেক্টাস** (*Pithecanthropus erectus*) কিন্তু বর্তমানে ইহা হোমো **ইরেক্টাস** (*Homo erectus*) নামে পরিচিত। 1889 খ্রীষ্টাব্দে ডুবয়েস (Dubois) জাভাদেশের সোলো নদীর নিকট ইহার জীবাশ্ম (মাথার খুলি, দুইটি মোলার দাঁত ও পায়ের হাড়) আবিষ্কার করেন। তিনি ইহাকে এপ্ এবং মানুষের মধ্যবর্তী বলিয়া অনুমান করেন এবং ইহাকে জাভার এপ্-মানুষ নামে অভিহিত করেন।

পিথেক্যানথ্রোপাস-এর মস্তিষ্কের আয়তন ছিল প্রায় 800 সিসি। ইহাদের কপাল চাপা এবং ভ্রূ-দুইটি সামনের দিকে ঝুলিয়া থাকিত। উপরের

চোয়াল হইতে নীচের চোয়াল ভারী ছিল এবং চিবুক স্পষ্ট ছিলনা, ইহাদের দাঁতের আকার এপ্-এর মতই বড় ছিল। ইহারা সাধারণতঃ দুই পায়ে চলাফেরা করিত। ইহাদের উচ্চতা প্রায় পাঁচ ফুট এবং ওজন প্রায় দেড়শত পাউণ্ড ছিল। অনেকে মনে করেন ইহারা কথা বলিতে পারিত।

পিথেক্যানথ্রোপাসের জীবাশ্মগুলি প্লিস্টোসিন (Pleistocene) যুগের মধ্যভাগে পাওয়া যায়। ইহা হইতে অনুমান করা হয় যে ইহাদের আবির্ভাব প্রায় 5 লক্ষ হইতে 10 লক্ষ বৎসর পূর্বে হইয়াছে।

3. **পিকিং মানুষ** (Peking Man) : পূর্বে ইহার বৈজ্ঞানিক নাম ছিল **সিনানথ্রোপাস পিকিনেনসিস** (*Sinanthropus pekinensis*) কিন্তু বর্তমানে ইহাকেও **হোমো ইরেক্টাস** (*Homo erectus*) প্রজাতির অন্তর্ভুক্ত করা হয়। 1922 খ্রীষ্টাব্দে চীনদেশের পিকিং শহরের নিকটবর্তী গুহায় ইহার জীবাশ্ম (মাথার খুলির অংশ, চোয়াল এবং দাঁত) আবিষ্কৃত হয়। পরবর্তীকালে ইহাদের হাত ও পায়ের হাড়গুলিও পাওয়া যায়। ইহাদের মস্তিষ্কের আয়তন ছিল 850 সিসি হইতে 1300 সিসি। ভ্রূ-দুইটি সামনের দিকে ঝুলিয়া থাকিত এবং নীচের চোয়াল এপ্-এর মতই ছিল। তবে মোলার দাঁতগুলি মানুষের মতই ছিল।

পিকিং মানুষের জীবাশ্মগুলি মধ্য প্লিস্টোসিন যুগের এবং ইহারা পিথেকানথ্রোপাস-এর সমসাময়িক বলিয়া মনে করা হয়। ইহারা যে গুহায় বাস করিত তাহার পরিবেশ দেখিয়া অনুমান করা হয় যে উহারা আগুনের ব্যবহার জানিত।

4. **হাইডেলবার্গ মানুষ** (Heidelberg man) : পূর্বে ইহার বৈজ্ঞানিক নাম ছিল **হোমো হাইডেলবার্গেনসিস** (*Homo heidellergensis*) কিন্তু বর্তমানে ইহাকেও **হোমো ইরেক্টাস** (*Homo erectus*)-এর অন্তর্ভুক্ত বলিয়া মনে করা হয়। 1907 খ্রীষ্টাব্দে জার্মানীর হাইডেলবার্গ শহরের নিকট ইহার জীবাশ্ম (একটি নীচের চোয়াল এবং দাঁত) পাওয়া যায়। ইহার চোয়ালটি বড় এবং ভারী (massive), প্রায় এপ্-এর মত, কিন্তু দাঁতগুলি মানুষের মত। ইহাদের মস্তিষ্কের আয়তন ছিল প্রায় 800 সিসি হইতে 1200 সিসি। অনেকে ইহাকে পরবর্তী মানুষ (নিয়ানডারথাল মানুষ)-এর পূর্বপুরুষ বলিয়া মনে করেন। হাইডেলবার্গ মানুষের জীবাশ্মটি মধ্য-

প্লিস্টোসিন যুগের, সম্ভবতঃ প্রথম অন্তঃহিমবাহ সময়কার (First inter-glacial period)। সেই হিসাবে ইহা প্রায় 5 লক্ষ বৎসর পূর্বে আবির্ভূত হইয়াছিল বলিয়া মনে করা হয়।

5. **নিয়ানডারথাল মানুষ** (Neanderthal man) : ইহার বৈজ্ঞানিক নাম **হোমো নিয়ানডারথেলনিস** (*Homo neanderthelnis*)। 1861 খ্রীষ্টাব্দে জার্মানীতে এবং তাহার পর অন্যান্য স্থানে ইহার জীবাশ্ম পাওয়া যায়। ইহাদের মাথার খুলি ও চোয়াল ভারী, কপাল ছোট, ভ্রূ-দুইটি সামনের দিকে ঝোলা, নাক চওড়া এবং চক্ষু কোটর বড় ছিল। ইহাদের মস্তিষ্কের আয়তন ছিল প্রায় 1400 সিসি।

নিয়ানডারথাল মানুষ গুহাতে বাস করিত। ইহারা পাথরের অস্ত্র-শস্ত্র ব্যবহার করিত, আগুনের ব্যবহার করিত এবং সম্ভবতঃ মৃতদেহের সমাধি দিত। ইহাদের উচ্চতা ছিল পাঁচ হইতে সাড়ে পাঁচফুট, কিন্তু ইহাদের বাঁকানো পায়ের হাড় (ফিমার) দেখিয়া অনুমান করা হয় যে ইহারা সম্পূর্ণ দ্বিপদী ছিল না। দ্রুতগতির জন্য ইহারা চারটি পা (অর্থাৎ দুইটি হাত ও দুইটি পা) ব্যবহার করিত। জীবাশ্মের বয়স নির্ণয় করিয়া বিজ্ঞানীগণ অনুমান করেন যে ইহারা আনুমানিক এক লক্ষ বৎসর পূর্বে শেষ হিমবাহের সময় আবির্ভূত হয়।

6. **ক্রো-ম্যানয়ঁ** (Cro-magnon man) : ইহার বৈজ্ঞানিক নাম **হোমো স্যাপিয়েনস্** (*Homo sapiens*) ; 1968 খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সে সর্বপ্রথম ইহার জীবাশ্ম আবিষ্কৃত হয়। পরবর্তীকালে এশিয়া এবং ইওরোপের বিভিন্ন প্রান্তে ইহার জীবাশ্ম পাওয়া যায়। ক্রোম্যানয়ঁ মানুষকে বর্তমান মানুষের বিলুপ্ত (Extinct) প্রতিনিধি বলা যায়। ইহারা শেষ হিমবাহের সময় পর্যন্ত (Ice age) প্রাধান্য লাভ করে।

ইহাদের কঙ্কাল দেখিয়া মনে হয় ইহারা যথেষ্ট উচ্চতাবিশিষ্ট এবং সম্পূর্ণ দ্বিপদী ছিল। ইহাদের মস্তিষ্কের আয়তন ছিল প্রায় 1600 সিসি। ইহাদের ভ্রূ-এর উপর খাঁজ ছিলনা এবং সুস্পষ্ট চিবুক ছিল।

ক্রোম্যানয়ঁ মানুষ গুহায় বাস করিত। ইহারা পাথরের অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করিত, এমনকি গুহায় বিভিন্ন প্রাণীর এবং শিকারের ছবি আঁকিত। ফ্রান্স ও জার্মানীর কয়েকটি গুহায় ইহাদের অঙ্কিত চিত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে।

বিজ্ঞানীদের অনুমান প্রায় 40,000 পূর্বে ইহাদের আবির্ভাব হয় এবং প্রায় 15,000 বৎসর পূর্বে ইহারা বিলুপ্ত হইয়া যায়।



চিত্র 27 : প্রাগৈতিহাসিক মানুষের আঁকা গুহাচিত্র।

7. **প্রাচীন মানুষের অন্যান্য জীবাশ্ম :** 1959 খ্রীষ্টাব্দে ডঃ লিকী (Dr. L.S.B. Leaky) আফ্রিকার টাঙ্গানাইকা প্রদেশে একটি মানুষের খুলির জীবাশ্ম আবিষ্কার করেন এবং তিনি ঐ প্রাচীন মানুষটির নাম দেন **'জিনজ্যানথ্রোপাস'** (*Zinjanthropus*)। এই জীবাশ্মটি প্রায় 17 লক্ষ বৎসরের প্রাচীন। ইহার পাশে একটি পাথরের কুড়াল (Hand axe) পাওয়া গিয়াছে যাহা হইতে অনুমান করা হয় যে ইহারা অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করিত।

সম্প্রতি ডঃ লিকী (Dr. Leaky, 1972) আফ্রিকার অন্তর্গত কেনিয়ার রুডল্‌ফ হ্রদের নিকট একটি প্রাচীন মানুষের করোটি আবিষ্কার করিয়াছেন। ইহার মস্তিষ্কের আয়তন মাত্র 800 সিসি এবং ইহার ভ্রূ-শিরা (Eye brow ridge) উন্নত নয়। ইহার নাম দেওয়া হইয়াছে **হোমো হ্যাবিলিস্‌** (*Homo habilis*)। ডঃ লিকীর মতে ইহাই দ্বিপদী মানুষের সর্বাপেক্ষা প্রাচীন জীবাশ্ম।

8. **আধুনিক মানুষ** (Modern man) : ইহার বৈজ্ঞানিক নাম **হোমো স্যাপিয়েনস্‌ স্যাপিয়েনস্‌** (*Homo sapiens sapiens*)। আধুনিক মানুষের প্রধান বৈশিষ্ট্য তাহার বুদ্ধি এবং মনের বিকাশ। যে বিজ্ঞানের সাহায্যে মানুষের বৈশিষ্ট্য, শ্রেণীবিভাগ, তাহার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশ প্রভৃতি জানা যায় তাহাকে **নৃতত্ত্ব** বা **অ্যানথ্রোপলজি** (Anthro-

pology) বলে। নৃতত্ত্ববিদ্‌দের মতে আধুনিক মানুষের ক্রমবিকাশ তাহার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্রমবিকাশ। নৃতত্ত্ববিদগণ মানুষের সভ্যতার আদিম যুগকে প্রস্তরযুগ (Stone age) নাম দেন কারণ ঐ সময় মানুষ কেবল প্রস্তর নির্মিত অস্ত্র শস্ত্র ব্যবহার করিত। এই প্রস্তর যুগকে আবার তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত করা হয়, যথা—প্রাচীন প্রস্তর যুগ বা প্যালিওলিথিক (Palaeolithic), মধ্য প্রস্তর যুগ বা মেসোলিথিক (Mesolithic) এবং নূতন প্রস্তর যুগ বা নিওলিথিক (Neolithic)। এই সময় কেবল অস্ত্র শস্ত্র ব্যবহারই নয়, মানুষ শস্যবপন করিয়া কৃষিকার্য করিতে শেখে এবং পশুপালন করিতে শেখে।

প্রস্তর যুগের পর আসে যথাক্রমে তাম্র যুগ (Copper age), ব্রোঞ্জ যুগ (Bronze age) এবং লৌহ যুগ (Iron age)। ইতিমধ্যে মানুষ তাহার প্রয়োজন অনুযায়ী বাসন পত্র, বস্ত্র প্রভৃতি তৈয়ারী করিতে শেখে। মানুষ পূর্বেই কথা বলিতে এবং আঁকিতে শিখিয়াছিল, এখন সেইগুলিকে একটি ভাষার রূপ দিয়া লিখিতে শিখিল, এইভাবে পৃথিবীতে মানুষের ইতিহাস রচিত হইল। পরবর্তীকালে মানুষ বিজ্ঞানের সাহায্যে নূতন নূতন বস্তু আবিষ্কার করিতে লাগিল, একদিকে বিজ্ঞানের সাহায্যে বিজ্ঞানীগণ নানা প্রকার প্রয়োজনীয় বস্তু উৎপাদন করিয়া মানুষের কল্যাণ সাধন করিতে লাগিলেন, অন্যদিকে কিছু বিজ্ঞানী আধুনিক অস্ত্র শস্ত্র নির্মাণ করিয়া মানুষ জাতিকে ধ্বংসের মুখে ঠেলিয়া দিলেন।

যাহাই হউক আধুনিক মানুষ আজ নিজের বুদ্ধি এবং চিন্তার ফলে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ জীবে পরিণত হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। সে প্রকৃতি এবং অন্যান্য প্রাণীর উপর সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব করিতেছে এবং নিজের জীবন যাত্রাকে ক্রমশ জটিল করিয়া তুলিতেছে।

মানুষের ভবিষ্যৎ (The future of man) :

আধুনিক মানুষের ক্রমবিকাশ কিভাবে হইবে এবং তাহার ফলে ভবিষ্যৎ মানুষের আকৃতি প্রকৃতিতে কিরূপ পরিবর্তন আসিবে—তাহা লইয়া জল্পনা-কল্পনার অন্ত নাই। পূর্বে বহু বিজ্ঞানীর ধারণা ছিল যে আধুনিক মানুষের মানসিক কার্য বৃদ্ধি পাইতেছে কিন্তু দৈহিক কার্য হ্রাস পাইতেছে। ইহার ফলে সুদূর ভবিষ্যতে মানুষের দেহের অব্যবহৃত অংশগুলি ক্ষুদ্র হইয়া আসিবে কিন্তু

মস্তকটি ক্রমশই বৃহৎ হইতে বৃহত্তর হইয়া উঠিবে। ভবিষ্যতের এই মানুষগুলির হাত ও পা সরু হইবে এবং চোখ, কান, নাক, মুখ প্রভৃতি ছোট হইয়া আসিবে এবং মাথায় একেবারেই চুল থাকিবে না।

অবশ্য বর্তমান বিজ্ঞানীগণ আধুনিক মানুষের এই ধরণের ক্রমবিকাশে বিশ্বাস করেন না। মানুষ এখন পরিবেশ এবং প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে। ইহার ফলে প্রকৃতির প্রভাব বর্তমান মানুষের উপর যথেষ্ট কম, এতই কম যে আগামী কয়েক সহস্র বৎসরে মানুষের শারীরিক এবং মানসিক পরিবর্তন ঠিক কতটা হইবে বলা কঠিন।

তবে মানুষের মানসিক বিকাশ, বুদ্ধির বিকাশ ও সভ্যতার বিকাশ মানুষকে কয়েকটি সমস্যার সন্মুখীন করিয়া তুলিয়াছে। এই সমস্যাগুলি অদূর ভবিষ্যতে মানুষের বিপদ ডাকিয়া আনিতে পারে। মানুষের এই সমস্যাগুলিকে তিনটি প্রধান বিভাগে বিভক্ত করা যায় :—

(ক) **জনসংখ্যা বিস্ফোরণ** (Population explosion) : বিজ্ঞানের অগ্রগতির ফলে মানুষের রোগ এবং মৃত্যুর হার হ্রাস পাইতেছে। ইহার ফলে সমগ্র পৃথিবীতে জনসংখ্যা অতি দ্রুতহারে বৃদ্ধি পাইতেছে। সময়মত এই সমস্যার সমাধান না করিলে পৃথিবীতে মানুষের পক্ষে বসবাস করাই কঠিন হইয়া পড়িবে।

(খ) **জনসংখ্যা বিলুপ্তি** (Population extinction) : বিভিন্ন দেশের মধ্যে প্রতিনিয়ত যুদ্ধ-বিগ্রহ সমগ্র মানব জাতিকে সন্ত্রস্ত করিয়া রাখিয়াছে। দুইটি বিশ্বযুদ্ধে অসংখ্য মানুষের মৃত্যুর পরেও এখন কয়েকটি দেশ পারমাণবিক অস্ত্র নির্মাণ করিতেছে যাহার ফলে যে কোনো সময়ে মানব জাতির ধ্বংস আসন্ন।

(গ) **দূষণ** (Pollution) : সভ্যতার বিকাশের সহিত মানুষ প্রাকৃতিক সম্পদকে যথেচ্ছভাবে ব্যবহার করিতেছে। ইহার ফলে একদিকে মিঠাজল, অরণ্য, কয়লা, খনিজ তেল প্রভৃতির পরিমাণ হ্রাস পাইতেছে, অপরদিকে শহরের বায়ু, জল এবং সমগ্র পরিবেশই বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্যের প্রভাবে দূষিত। পরিবেশ দূষণের ফলে মানব জাতির ভবিষ্যৎ ভয়াবহ বিপদের সম্মুখীন।*

---

* আমাদের সৌভাগ্যের বিষয়—মানুষ এখন হইতেই এ বিষয়ে সচেতন হইতেছে।

মানুষের ক্রমবিকাশ ঃ সারাংশ

আধুনিক মানুষ
(হোমো স্যাপিয়েনস্ স্যাপিয়েনস্)

↑

ক্রোম্যানয়ঁ মানুষ
(হোমো স্যাপিয়েনস)

নিয়ানডারথাল মানুষ ←
(1 লক্ষ বৎসর পূর্বে)

↑ → হাইডেল বার্গ মানুষ
(5 লক্ষ বৎসর পূর্বে)

পিকিং মানুষ
(7 লক্ষ বৎসর পূর্বে) ← ↑

→ জাভা মানুষ
(10 লক্ষ বৎসর পূর্বে)

↑

হোমো ইরেকটাস (15 লক্ষ বৎসর পূর্বে)

↑

হোমো হ্যাবিলিস (25 লক্ষ বৎসর পূর্বে)

↑

অস্ট্রালোপিথেকাস (40 লক্ষ বৎসর পূর্বে)

↑

রামপিথেকাস (1 কোটি বৎসর পূর্বে)

↑

প্রোকনসাল
বা
ড্রায়োপিথেকাস (1·5 কোটি বৎসর পূর্বে)

চিত্র—মানুষের ক্রমবিকাশের রেখাচিত্র।

সারাংশ

মানুষের ক্রমবিকাশ পৃথিবীতে কিভাবে হইল তাহা লইয়া কেবল বিজ্ঞানী মহলই নয়, সাধারণ মানুষও কৌতূহলান্বিত। ডারউইন সর্বপ্রথম মানুষের ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে তাঁহার ধারণা 'ডিসেন্ট অফ ম্যান' (**Descent of man**) নামক পুস্তকে ব্যক্ত করেন, কিন্তু সেইজন্য তাঁহাকে বহু সমালোচনার সম্মুখীন হইতে হয়। তাঁহার ধারণা ছিল আধুনিক মানুষ এবং এপ-এর পূর্বপুরুষ একই। সাম্প্রতিক কালে মানুষের পূর্বপুরুষের যে সকল জীবাশ্ম পাওয়া গিয়াছে তাহা এই মতবাদকেই সমর্থন করে। অবশ্য অন্যান্য প্রাণীর মত মানুষের ক্রমবিকাশও যথেষ্ট জটিল এবং তাহার জীবাশ্মও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত। তাহা সত্ত্বেও বিজ্ঞানীগণ বহু কষ্ট স্বীকার করিয়া এই সকল জীবাশ্ম আবিষ্কার করিয়াছেন, উহাদের বয়স নির্ণয় করিয়াছেন এবং সর্বোপরি উহাদের গঠন বৈচিত্র্যের ভিত্তিতে উহাদের শ্রেণীবিন্যাসও করিয়াছেন। ইহার ফলে মানুষের ক্রমবিকাশের চিত্রটি আমাদের নিকট ধীরে ধীরে সুস্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে।

মানুষের ক্রমবিকাশ : অনুশীলনী

1. মানুষের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি কি কি ?
2. এপ-এর সহিত মানুষের সাদৃশ্য ও পার্থক্যগুলি উল্লেখ কর।
3. আফ্রিকাতে মানুষের পূর্বপুরুষের কি কি জীবাশ্ম পাওয়া গিয়াছে ?
4. জাভা ও পিকিং-এর এপ-মানুষদের কি কি বৈশিষ্ট্য ছিল ?
5. হাইডেলবার্গ মানুষ ও নিয়ানডারথাল মানুষের সম্বন্ধে কি জান ?
6. ক্রোম্যানয় মানুষ কাহাদের বলা হয় ?
7. মানুষের ক্রমবিকাশ সংক্ষেপে উল্লেখ কর।
8. মানুষের ক্রমবিকাশের একটি সংক্ষিপ্ত রেখাচিত্র অঙ্কন কর।
9. আধুনিক মানুষের সভ্যতার ক্রমবিকাশের ধারাটি সংক্ষেপে উল্লেখ কর।
10. আধুনিক মানুষের ভবিষ্যৎ কি ? সংক্ষেপে লেখ।
11. আধুনিক মানুষের বর্তমান সমস্যাগুলি কি ?
12. সংক্ষিপ্ত টীকা লিখ :

    (ক) অ্যানথ্রোপয়েড এপ (খ) হোমো ইরেক্টাস (গ) অস্ট্রালোপিথেকাস (ঘ) জিনজ্যানথ্রোপাস ও (ঙ) ক্রোম্যানয়।

গ্রন্থপঞ্জী ও নির্দেশিকা (References)

1. Colbert E. H. 1955. Evolution of the Vertebrates, John Wiley & Sons. New York.
2. Darwin Charles, 1871. The Descent of Man, Modern Library Series, New York.
3. Dodson E. O. 1968. Evolution Process and Product, Reinhold Publishing, New York.
4. B. S. C. S. 1963. Molecules to Man (Blue Version) (Biological Sciences Curriculum Sudy), Houghton Mifflin Co., Boston.
5. Moody P. A. 1964. Introduction to Evolution. 2nd ed. Harper and Row, New York.
6. Lull R. S. 1976. Organic Evolution, Macmillan Co., New York.
7. Storer and Usinger. General Zoology, (4th-ed)-Mc Graw Hill-Kogakusha.
8. Hegner and Stiles 1959, College Zoology, 7th ed. Macmillan, New York.
9. Romer A. S. 1959, The Vertebrate Story, University of Chicago Press.

একাদশ অধ্যায়

প্রাণীর অভিযোজন
(Adaptation in Animals)

এই পৃথিবীতে বিভিন্ন ধরনের পরিবেশ আছে এবং প্রত্যেক পরিবেশেই কিছু না কিছু জীব বাস করে। জল, স্থল এবং অন্তরীক্ষ যাহাই হউক না কেন সকল পরিবেশেই জীব বাস করে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, মাছ জলে বাস করে, মানুষ স্থলে বাস করে, আবার পাখী আকাশে উড়িয়া বেড়ায়। ইহা ছাড়াও অনেক প্রাণী সমুদ্রের নীচে, মাটির নীচে অথবা বৃক্ষের উপর বাস করে। অর্থাৎ প্রতিটি জীবেরই একটি নিজস্ব পরিবেশ থাকে। কোনও বিশেষ পরিবেশে বাস করিবার জন্য জীবকে পরিবেশের সহিত সামঞ্জস্যবিধান করিতে হয় বা পরিবেশের সহিত নিজেকে মানাইয়া লইতে হয়। ইহাকে **অভিযোজন বা অ্যাডাপ্‌টেশন** (Adaptation) বলে। কোনও বিশেষ পরিবেশের সহিত মানাইয়া লইতে গেলে জীবের আকৃতি এবং প্রকৃতিতে কয়েকটি পরিবর্তন দেখা যায়। এই সকল পরিবর্তন স্থায়ী এবং বংশানুক্রমিক। ইহার ফলে জীবের দেহে নূতন বৈশিষ্ট্যের আবির্ভাব হয়। এই নূতন বৈশিষ্ট্যগুলিকে অভিযোজনগত বৈশিষ্ট্য (Adaptive features) বলে। অতএব দেখা যাইতেছে যে জীব এবং তাহার পরিবেশের মধ্যে যে ক্রিয়া-বিক্রিয়া ঘটে তাহারই ফলে জীবদেহে অভিযোজন দেখা যায়। অনেকের মতে জীবজগতে ক্রমবিকাশ বা অভিব্যক্তির ফলেই জীবের মধ্যে অভিযোজন দেখা যায়।

উপরের আলোচনা হইতে আমরা দুইটি সিদ্ধান্ত করিতে পারি।

(ক) কোন বিশেষ পরিবেশে সামঞ্জস্য বিধানের জন্য জীবদেহে যে পরিবর্তন হয় এবং নূতন বৈশিষ্ট্যের উদ্ভব হয় তাহাকে অভিযোজন বলে।

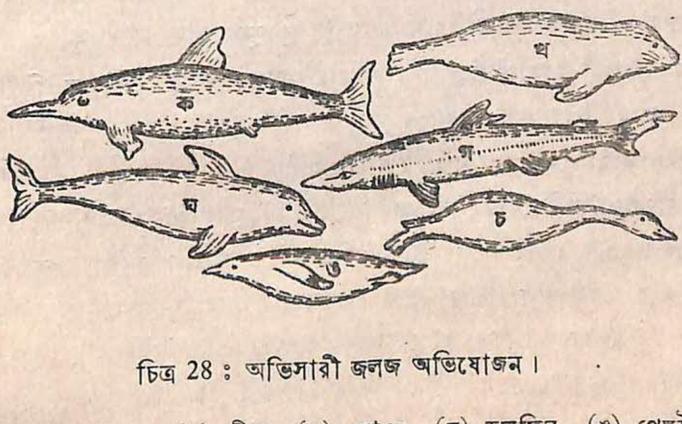
(খ) জীব এবং পরিবেশের মধ্যে ক্রিয়া-বিক্রিয়া এবং জৈব অভিব্যক্তির ফলশ্রুতি এই অভিযোজন।

অবশ্য সকল জীবকেই জীবনধারণ করিবার জন্য পরিবেশের সহিত সামঞ্জস্য-বিধান করিতে হয়। সেই হিসাবে সকল জীবকেই কয়েকটি অভিযোজনের সমষ্টি (Bundle of adaptations) বলা হয়। কয়েকটি প্রাণী আবার

একাধিক পরিবেশে নিজেদের মানাইয়া লইতে পারে, যথা—উভচর প্রাণী ব্যাঙ জলে এবং স্থলে বাস করিতে পারে।

অভিযোজনের উদ্ভব (Origin of Adaptation) : খাদ্য এবং আশ্রয়ের জন্য জীব বিভিন্ন পরিবেশে ছড়াইয়া পড়ে। বিভিন্ন পরিবেশের সহিত সামঞ্জস্যবিধান করিতে গিয়া নানারূপ দৈহিক পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। ইহা হইতে জৈব অভিব্যক্তির সূত্রপাত হয়। জৈব অভিব্যক্তির ফলশ্রুতি হিসাবে জীব নূতন অঙ্গ বা বৈশিষ্ট্য লাভ করে। বংশগতির মাধ্যমে এই অঙ্গ বা বৈশিষ্ট্যটি আরও উপযুক্ত (Perfect) হইয়া ওঠে। এইভাবে জীবটি ঐ পরিবেশের সহিত অভিযোজিত (Adapted) হইয়া পড়ে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় অভিব্যক্তির ফলে প্রাণিদেহে যে ফুসফুসের সৃষ্টি হইয়াছে তাহা স্থলচর প্রাণীর একটি অন্যতম অভিযোজন এবং উহা পরিবেশের প্রভাবেই সম্ভব হইয়াছে।

অপসারী ও অভিসারী অভিযোজন : অভিযোজন বিভিন্ন প্রকারের হইতে পারে। জলে, স্থলে, আকাশে, মাটির নীচে, সর্বত্রই জীবের বাস এবং সব জীবই তাহার নিজস্ব পরিবেশের সহিত অভিযোজিত। কিন্তু যখন একই গোষ্ঠীর বিভিন্ন জীব খাদ্য এবং আশ্রয়ের জন্য বিভিন্ন পরিবেশে বাস করে, তাহাকে **অপসারী অভিযোজন** (Divergent adaptation) বলা হয়। যেমন—স্তন্যপায়ী প্রাণীর মধ্যে ছুঁচো গর্তে বাস করে। হরিণ মাঠে



চিত্র 28 : অভিসারী জলজ অভিযোজন।

(ক) ইক্‌থিওসর (খ) সীল (গ) হাঙর (ঘ) ডলফিন (ঙ) পেঙ্গুইন (চ) হেসপেররনিস।

দৌড়াইতে পারে, ক্যাঙারু লাফ দিতে পারে, বাদুড় উড়িতে পারে আবার তিমি জলে বাস করে। বিজ্ঞানী ওসবর্ণ (Osborn) এই ধরনের অভিযোজনকে **অভিযোজিত বিকিরণ** (Adaptive rediation) নামে অভিহিত করেন।

অন্যদিকে যখন বিভিন্ন গোষ্ঠীর জীব আসিয়া একটি বিশেষ পরিবেশে বাস করে তাহাকে **অভিসারী অভিযোজন** (Convergent adaptation) বলে। যেমন—মেরুদণ্ডী প্রাণীদের মধ্যে মাছ মুখ্যতঃ জলচর প্রাণী, কিন্তু খাদ্য এবং আশ্রয়ের জন্য ব্যাঙ, কুমীর, কচ্ছপ, তিমি প্রভৃতি প্রাণীও জলে বাস করিতে থাকে এবং এই পরিবেশে অভিযোজিত হইয়া পড়ে।

মুখ্য অভিযোজন ও গৌণ অভিযোজন ঃ

যখন কোন জীব তাহার আবির্ভাবের সময় হইতে একই পরিবেশে বাস করে তখন তাহাকে মুখ্য অভিযোজন বা প্রাথমিক অভিযোজন (Primary adaptation) বলে। যেমন মেরুদণ্ডী প্রাণীর মধ্যে মাছ তাহার আবির্ভাবের সময় হইতে জলে বাস করে অর্থাৎ মাছের পূর্বপুরুষও একই পরিবেশে বাস করিত সেইজন্য মাছকে মুখ্য জলচর প্রাণী বলে।

আবার যখন কোন জীবের পূর্বপুরুষ এক পরিবেশে বাস করে কিন্তু তাহার বংশধরেরা পুরাতন পরিবেশ ছাড়িয়া নূতন পরিবেশে বাস করিতে আরম্ভ করে, তাহাকে গৌণ অভিযোজন (Secondary adaptation) বা দ্বিতীয় পর্যায়ের অভিযোজন বলে। যেমন তিমির পূর্বপুরুষ স্থলে বাস করিত কিন্তু তিমি স্তন্যপায়ী হইয়াও জলে বাস করিতে আরম্ভ করে। সেইজন্য তিমিকে গৌণ জলচর জীব বলা হয়। তবে প্রাথমিক অভিযোজনের বৈশিষ্ট্যগুলি গৌণ অভিযোজনের ফলে লুপ্ত হইয়া যায় না।

প্রাণীর অভিযোজনের প্রকারভেদ (Types of adaptations in animals) ঃ বিভিন্ন ধরনের প্রাণী বিভিন্ন পরিবেশে বাস করে। কেহ জলে বাস করে, কেহ স্থলে। কেহ বৃক্ষে বাস করে আবার কেহ আকাশে উড়িতে পারে। এইভাবে প্রাণীর অভিযোজনের অসংখ্য দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে তবে পরিবেশের ভিত্তিতে প্রাণীর অভিযোজন প্রধানতঃ নিম্নরূপ।

(ক) জলজ অভিযোজন বা জলে বাস করিবার জন্য অভিযোজন।

(খ) খেচর অভিযোজন বা উড়িবার জন্য অভিযোজন।

(গ) মরু অভিযোজন বা মরুভূমিতে বাস করিবার জন্য অভিযোজন।

(ঘ) আরোহী অভিযোজন বা বৃক্ষে বাস করিবার জন্য অভিযোজন।

(ঙ) দৌড় অভিযোজন বা দৌড়াইবার জন্য অভিযোজন।

(চ) গর্তবাসীর অভিযোজন বা গর্তে বাস করিবার জন্য অভিযোজন

(ছ) গুহাবাসীর অভিযোজন বা অন্ধকার গুহায় বাস করিবার জন্য অভিযোজন।

(জ) গভীর সমুদ্র অভিযোজন বা গভীর সমুদ্রে বাস করিবার জন্য অভিযোজন।

এখানে প্রাণীর কয়েকটি প্রধান অভিযোজন বর্ণনা করা হইল।

(ক) জলজ অভিযোজন (Aquatic adaptation):

জলে বাস করিবার জন্য জীবদেহে যে অভিযোজন হয় তাহাকে জলজ অভিযোজন বলে। পৃথিবীতে জলেই জীবনের আবির্ভাব হয় এবং এখনও অধিকাংশ জীবই জলে বাস করে। আবার পৃথিবীর অধিকাংশ স্থানই জলে পূর্ণ সেইজন্য জীবের মধ্যে জলজ অভিযোজন অধিক দেখা যায়।

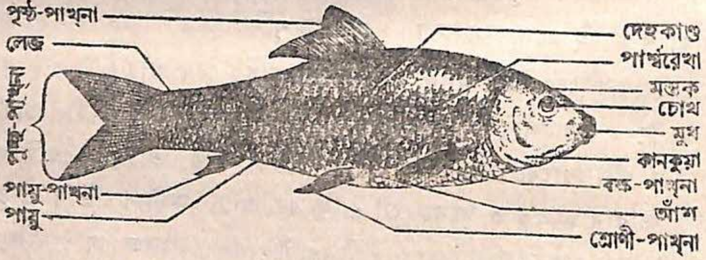
প্রাণীদের মধ্যে অধিকাংশই জলচর। আণুবীক্ষনিক এককোষী প্রাণী—অ্যামিবা ও প্যারামেসিয়াম হইতে আরম্ভ করিয়া স্পঞ্জ, হাইড্রা, জেলিফিশ, চিংড়ি, তারামাছ প্রভৃতি অমেরুদণ্ডী প্রাণী এবং মাছ, কুমীর, তিমি প্রভৃতি মেরুদণ্ডী জলে বাস করে। অমেরুদণ্ডী প্রাণীর মধ্যে জলজ অভিযোজনের অসংখ্য বৈশিষ্ট্য দেখা যায় এবং বিভিন্ন প্রাণীর বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য থাকায় বিষয়টি অত্যন্ত জটিল হইয়া পড়ে। যেমন অ্যামিবা জলে ক্ষণপদের সাহায্যে গমন করে কিন্তু প্যারামেসিয়াম সিলিয়ারসাহায্যে গমন করে। হাইড্রা তাহারা দীর্ঘ কর্ষিকার সাহায্যে সাঁতার কাটিতে পারে অথবা ডিগবাজী দিয়া চলিতে পারে। স্পঞ্জ জলের ভিতর কোনো বস্তুর দেহে দৃঢ়ভাবে আটকাইয়া থাকে আবার চিংড়ি জলের মধ্যে সাঁতার কাটিতে পারে এবং জলের নীচে হাঁটিতে পারে। গমনাঙ্গ ছাড়াও দেহের অন্যান্য অঙ্গগুলি জলে বাস করিবার জন্য অভিযোজিত।

মেরুদণ্ডী প্রাণীর জলজ অভিযোজন অপেক্ষাকৃত সরল। জলচর মেরুদণ্ডী প্রাণীকে দুইভাগে বিভক্ত করা হয়, যথা—(১) মুখ্য জলচর প্রাণী (মাছ) এবং (২) গৌণ জলচর প্রাণী (তিমি)।

মুখ্য জলচর প্রাণী—মাছ (Primary aquatic animal-fish) ঃ

মাছকে মুখ্য জলচর প্রাণী বলা হয় কারণ মাছের পূর্বপুরুষও জলেই বাস করিত এবং উহারা কখনও জল ছাড়িয়া স্থলে আসে নাই। মাছের দেহ সম্পূর্ণভাবে জলে বাস করিবার উপযুক্ত। এখানে মাছের অভিযোজনগত বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখ করা হইল ঃ

(১) **দেহের আকৃতি (Body contour) ঃ** মাছের দেহের আকৃতি মাকুসদৃশ বা স্পিন্ড্‌ল-আকৃতি, মাথা ও লেজের দিকে সরু এবং দেহের মধ্যভাগ চওড়া। এই ধরনের দেহাকৃতির জন্য মাছ জলে সাঁতার কাটিবার সময় সহজেই জলের বাধা অতিক্রম করিতে পারে। অধিকাংশ মাছের দেহ দুইপাশ দিয়া সামান্য চাপা। ইহাও মাছকে জলের ভিতর দ্রুত সাঁতার কাটিতে সাহায্য করে।



চিত্র 29 ঃ মাছের বহির্গঠন।

(২) **গমনাঙ্গ (Organs of locomotion) ঃ** মাছের প্রধান গমনাঙ্গ উহার পাখনা। মাছের পাখ্‌নাগুলি রশ্মি বা ফিন-রে (Finray) বিশিষ্ট। পাখনাগুলি দুই প্রকারের—যুগ্মপাখনা বা জোড় পাখনা (Paired fins) এবং অযুগ্ম পাখনা বা বিজোড় পাখনা (Unpaired fins)। বক্ষ ও শ্রোণী পাখনা দুইটি যুগ্ম পাখনা এবং পৃষ্ঠ, পায়ু ও লেজের পাখনাগুলি অযুগ্ম পাখনা। পৃষ্ঠ পাখনা সামনের দিকে অগ্রসর হইতে ও দেহের আয়তন বাড়াইতে সাহায্য করে। বক্ষ পাখ্‌না জলের বিভিন্ন তলে মাছের দেহের ভারসাম্য বজায় রাখে, শ্রোণী পাখনার সাহায্যে মাছ জলের উপরের দিকে ভাসিয়া ওঠে এবং লেজের পাখনার সাহায্যে মাছ দিক পরিবর্তন করিতে পারে। অবশ্য

প্রধানতঃ মাছের দেহের পেশীগুলির সাহায্যেই মাছ সাঁতার কাটিতে পারে।

(৩) **চক্ষু ও নাসারন্ধ্র** (Eyes and nostrils) : মাছের মাথার দুইপাশে একজোড়া গোলাকার চক্ষু থাকে। প্রত্যেকটি চক্ষু একটি স্বচ্ছ পাতলা পর্দায় আবৃত থাকে যাহার ফলে মাছের জলের মধ্যে দেখিতে অসুবিধা হয় না। মাথার সামনের দিকে একজোড়া ছোট নাসারন্ধ্র থাকে যাহা কেবল ঘ্রাণকার্যে ব্যবহৃত হয় কিন্তু শ্বাসকার্যে ব্যবহৃত হয় না।

(৪) **ফুলকা** (Gills) : মাছের শ্বাসঅঙ্গ কয়েক জোড়া ফুলকা। রুই, কাতলা প্রভৃতি মাছে ইহারা মাথার দুপাশে কানকো দিয়া ঢাকা থাকে কিন্তু হাঙর, শঙ্কর মাছ প্রভৃতির ফুলকাছিদ্র সরাসরি বাহিরে উন্মুক্ত হয়। ফুলকার মধ্যে প্রচুর রক্তজালক থাকায় ইহা জল হইতে অক্সিজেন গ্রহণ করিতে এবং জলে কার্বন-ডাইঅক্সাইড ত্যাগ করিতে পারে। [কই, মাগুর, শিঙি প্রভৃতি কয়েকটি মাছে অতিরিক্ত শ্বাসঅঙ্গ থাকায় উহারা জলের বাহিরেও কিছুক্ষণ বাঁচিয়া থাকে। ইহা অবশ্য স্থলজ অভিযোজন।]

আঁশ বা স্কেল্ (Scales) : মাছের দেহ শক্ত আঁশ দিয়া ঢাকা থাকে। আঁশগুলি ছাদের টালির মত একটির উপর একটি—এইভাবে সাজানো থাকে। রুই ও কাতলা মাছের দেহে গোলাকার আঁশ (Cycloid scale), কইমাছে কাঁটাযুক্ত আঁশ (Ctenoid scale) এবং হাঙরের দেহে ছোট ছোট প্ল্যাকয়েড আঁশ (Placoid scale) দেখা যায়।

(৬) **ত্বক** (Skin) : মাছের ত্বক পাতলা ও গ্রন্থিযুক্ত। এই সকল গ্রন্থি হইতে মিউকাস বাহির হইয়া মাছের দেহকে সর্বদা পিচ্ছিল (Slimy) রাখে। ইহা মাছের গমনে ও আত্মরক্ষায় সাহায্য করে।

(৭) **পার্শ্বরেখা** (Lateral lines) : মাছের দেহের দুইপাশে দুইটি রেখা মাথা হইতে লেজ পর্যন্ত বিস্তৃত থাকে। ইহারা প্রকৃতপক্ষে মাছের স্পর্শেন্দ্রিয় এবং ইহার সাহায্যে মাছ জলের মধ্যে সামান্য কম্পন বা আলোড়ন অনুভব করিতে পারে।

(৮) **বায়ুথলি** বা পট্কা (Swimbladder) : কোন কোন মাছের দেহে বায়ুপূর্ণ সাদা থলির মত অংশ দেখা যায়। ইহা মাছের প্লবতা এবং ভারসাম্য বজায় রাখে। মাছ জলের মধ্যে বিভিন্ন গভীরতায় বাস করে এবং

এই থলি হইতে বায়ু বাহির করিয়া অথবা থলিতে বায়ু পূর্ণ করিয়া জলে নির্দিষ্ট গভীরতায় ভাসিয়া থাকে।

(৯) **ঠোঁট** (Lips) **:** বিভিন্ন মাছের ঠোঁট তাহার খাদ্যাভ্যাস অনুসারে অভিযোজিত। যে সকল মাছ জলের নীচে হইতে খাদ্য সংগ্রহ করে তাহাদের ঠোঁট নীচের দিকে বাঁকান থাকে এবং যে সকল মাছ জলের উপরদিক হইতে খাদ্যগ্রহণ করে তাহাদের ঠোঁট উপরদিকে বাঁকান থাকে।

গৌণ জলচর প্রাণী : তিমি (Secondary aquatic animal : Whale) :

যে সকল প্রাণীর স্বজাতীয় বা পূর্বপুরুষ স্থলে বাস করিত কিন্তু খাদ্য ও আশ্রয়ের জন্য তাহার বংশধরেরা দ্বিতীয়বার জলে বাস করিতে লাগিল তাহাদের গৌণ জলচর প্রাণী বলে। কুমীর, ডলফিন, সীল, তিমি প্রভৃতি প্রাণীকে গৌণ জলচর প্রাণী বলে। ইহাদের মধ্যে গঠনগত এবং কার্যগত দিক দিয়া তিমির অভিযোজন* জলে বাস করিবার উপযুক্ত। এখানে তিমির কয়েকটি অভিযোজন উল্লেখ করা হইল :

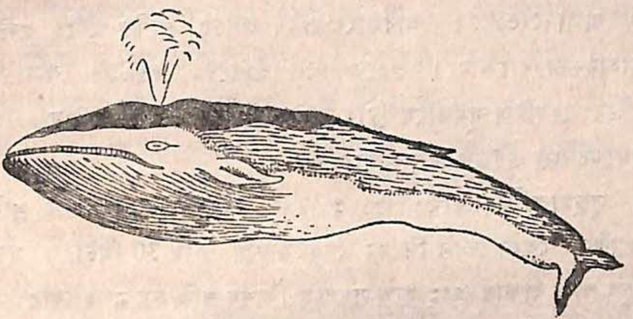
(১) **দেহের আকৃতি** (Body contour) **:** গৌণ জলচর প্রাণীর দেহ মাকু-সদৃশ্য (Streamlined) বা মাছের মত। এইরূপ আকারের জন্য ইহারা জলের মধ্যে সহজেই অগ্রসর হইতে পারে। শুশুক, ডলফিন, তিমি প্রভৃতি গৌণ জলচর প্রাণীর দেহ এই প্রকারের। মাছের মত আকৃতি হইবার জন্য তিমিকে তিমিমাছ বলা হয়।

(২) **ত্বক** (Skin) **:** গৌণ জলচর প্রাণীর দেহত্বক সাধারণতঃ মসৃণ এবং পিচ্ছিল হয়। ইহাদের ত্বকে আঁশ বা লোম থাকে না। ঘর্মগ্রন্থি এবং তৈলগ্রন্থিও অনুপস্থিত থাকে। জলচর স্তন্যপায়ী প্রাণীর ত্বকের নীচে একটি পুরু চর্বিস্তর থাকে, ইহাকে ব্লাবার (Blubber) বলে। ইহা দেহের আপেক্ষিক গুরুত্ব এবং তাপ সংরক্ষণ বজায় রাখে।

(৩) **পাখনা** (Fins, paddles and flippers) **:** গৌণ জলচর প্রাণীর দেহে প্রকৃত পাখনা থাকে না। ইহাদের দেহের অগ্রপদ ও পশ্চাৎপদ পাখনার মত অঙ্গ সৃষ্টি করে। সামনের ও পিছনের পায়ের আঙ্গুলগুলি চর্মে আবৃত

* তিমি (**Whale**), ডলফিন (**Dolphin**), পরপয়েজ (**Porpoise**) প্রভৃতি জলচর স্তন্যপায়ী প্রাণী সিটেসিয়া (**Cetacea**) বর্গের অন্তর্গত। সেইজন্য ইহাদের সিটেসিয়ান বলা হয়।

হইয়া ফ্লিপার (Flipper) সৃষ্টি করে যাহা বাহির হইতে মাছের পাখনার মত দেখায়। তিমির অগ্রপদ দুইটি প্যাডেলে (Paddle) পরিবর্তিত কিন্তু পশ্চাৎ-



চিত্র 30 : গৌণ জলচর প্রাণী—তিমি।

পদ সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। তিমি, ডলফিন প্রভৃতি গৌণ জলচর প্রাণীর পিছনের অংশটি লেজে পরিবর্তিত এবং ইহাদের লেজ আনুভূমিক (Horizontal)। প্যাড্‌ল এবং লেজের সাহায্যে ইহারা সহজেই জলে সাঁতার কাটিতে পারে।

(৪) **শ্বসন** (Respiration) : গৌণ জলচর প্রাণীর শ্বসন অঙ্গ ফুসফুস। ইহা স্থলচর জীবের প্রধান শ্বসন অঙ্গ। কিন্তু তিমি, ডলফিন প্রভৃতি জলচর প্রাণীর ফুসফুস বড় এবং স্থিতিস্থাপক। ফলে ইহারা অনেক পরিমাণ বায়ু বহুক্ষণ ফুসফুসে জমা করিয়া রাখিতে পারে। আবার বহিঃনাসারন্ধ্রে পেশীময় কপাটিকা থাকার ফলে জল ভিতরে প্রবেশ করে না।

(৫) **চক্ষু এবং কর্ণ** (Eye and ear) : গৌণ জলচর প্রাণীর চক্ষু, কর্ণ এবং বহিঃনাসারন্ধ্র সাধারণতঃ মাথার উপরের দিকে থাকে। সেইজন্য সমস্ত দেহ জলের নীচে ডুবিয়া থাকিলেও ইহাদের মাথা জলে ভাসিয়া থাকে। তিমি, সীল প্রভৃতি স্তন্যপায়ী জলচর প্রাণীর বহিঃকর্ণ বা কর্ণছত্র (Pinna) থাকে না। ইহাদের কর্ণপটহ স্থূল এবং কর্ণছিদ্র সঙ্কুচিত। চক্ষুর কর্নিয়া চাপা এবং লেনস্‌ গোলাকার।

(৬) **করোটি** (Skull) : করোটির প্রকোষ্ঠ অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র। ইহার মুখের সামনের অংশটি সরু হইয়া তুণ্ড বা স্নাউট (Snout) গঠন করিয়াছে। চোয়ালের ব্যবহার কম হওয়ায় ইহাদের চোয়াল দুর্বল এবং দাঁত সরল অথবা অবলুপ্ত।

ব্যালিন তিমির চোয়ালে দাঁতের পরিবর্তে অস্থি ঝিল্লী বা ব্যালিন (Baleen) দেখা যায়। ইহার সাহায্যে এই তিমি জল হইতে বিভিন্ন শৈবাল এবং উদ্ভিদ ছাঁকিয়া লয় ও খাদ্যরূপে গ্রহণ করে।

(৭) **গলা** (Neck) : অধিকাংশ গৌণ জলচর প্রাণীর দেহে গলা বা গ্রীবা সাধারণতঃ থাকে না। ইহার ফলে ইহাদের দেহটিতে কোন খাঁজ থাকেনা এবং দেহটি সম্পূর্ণভাবে স্ট্রীম লাইন্‌ড (Streamlined) হয়। জলজ অভিযোজনের জন্য এইরূপ দেহ অত্যাবশ্যক।

(৮) **বৃহদাকৃতি** (Large size) : গৌণ জলচর প্রাণী তিমি পৃথিবীর বৃহত্তম প্রাণী। কোন কোন তিমির দেহ লম্বায় প্রায় 30 মিটার। সম্ভবতঃ জলে প্রচুর খাদ্য থাকায় এবং খাদ্য সংগ্রহে বিশেষ শক্তিক্ষয় না হইবার ফলেই ইহাদের আকৃতি বিশাল হয়।

উপরের আলোচনা হইতে দেখা যায় যে একমাত্র ফুসফুস শ্বসন ছাড়া অন্যান্য বৈশিষ্ট্যগুলি গৌণ জলচর প্রাণীর জলজ অভিযোজনের সহায়ক। কেবল স্তন্যপায়ী এবং সরীসৃপই নয়, পাখীর মধ্যে পেঙ্গুইন জলজ অভিযোজনে অভ্যস্ত। লুপ্ত প্রাণীদের মধ্যে হেসপেররনিস (Hesperorins) এবং ইকথিও-সর (Ichthyosaur) গৌণ জলচর প্রাণী ছিল।

খেচর অভিযোজন বা বায়বীয় অভিযোজন (Volant adaptation or Aerial adaptation) :

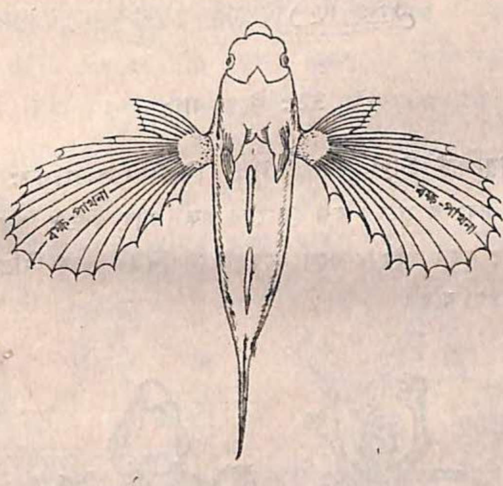
উড়িবার জন্য জীবের অভিযোজনকে বায়বীয় অভিযোজন বলে। অমেরু-দণ্ডী প্রাণীদের মধ্যে কীট পতঙ্গ (Insects) এবং মেরুদণ্ডী প্রাণীদের মধ্যে পাখী সহজেই উড়িতে পারে। তবে কেবল পাখী নয় কোনো কোনো স্তন্যপায়ী প্রাণী (বাদুড়), সরীসৃপ (ড্রাকো), উভচর (র‍্যাকোফোরাস), এমনকি মাছ (এক্সোসিটাস) পর্যন্ত কিছুদূর পর্যন্ত বায়ুতে ভাসিয়া থাকিতে পারে।

উড্ডয়নের ভিত্তিতে বায়বীয় অভিযোজন দুই প্রকার যথা—নিষ্ক্রিয় উড্ডয়ন এবং সক্রিয় উড্ডয়ন।

(ক) **নিষ্ক্রিয় উড্ডয়ন** (Passive flight) : কোন কোন প্রাণী সঠিক-ভাবে উড়িতে পারেনা—ইহারা কেবল দেহের কোন প্রসারিত অংশের সাহায্যে কিছুক্ষণ বাতাসে ভাসিয়া থাকিতে পারে। এই ধরনের ওড়াকে

নিষ্ক্রিয় উড্ডয়ন বা গ্লাইডিং (Gliding) বলে। মাছ, ব্যাঙ, গিরগিটি, কাঠবিড়ালী, লেমুর প্রভৃতি বিভিন্ন প্রাণীর মধ্যে এই ধরনের অভিযোজন দেখা যায়। নীচে এই সকল প্রাণীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ উল্লেখ করা হইল :

(১) **উড়ো মাছ** (Flying fish) : কয়েকটি সামুদ্রিক মাছের বক্ষ-পাখনা দুটি যথেষ্ট বড় এবং উহারা কিছু সময় মাছকে বাতাসে ভাসিয়া থাকিতে সাহায্য করে। সমুদ্রের ঢেউ যখন উপরের দিকে আসে তখন ইহারা ঝাঁকে ঝাঁকে বক্ষপাখনার সাহায্যে বাতাসে ভাসিয়া কিছুদূর (200-



চিত্র 31 : উড়ো মাছ।

300 মিটার) যায় এবং জলের মধ্যে পড়ে। উদাহরণ : এক্সোসিটাস (*Exocoetus*), প্যাণ্টাডন (*Pantadon*), ড্যাক্‌টাইলোপটেরাস (*Dactylopterus*)।

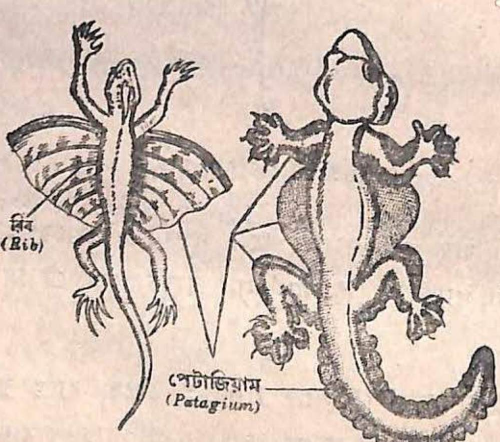
(২) **উড়ো ব্যাঙ** (Flying frog) : গেছো ব্যাঙ **র‍্যাকোফোরাস** (*Rhacophorus*)-এর মধ্যে বাতাসে ভাসিয়া থাকিবার সামান্য প্রয়াস দেখা যায়। ইহাদের আঙ্গুলগুলির মধ্যকার চামড়া (লিপ্তপদ) যথেষ্ট বিস্তৃত হওয়ায় ইহারা কিছুক্ষণ বাতাসে ভাসিয়া থাকিতে পারে। ইহাদের অগ্রপদ ও পশ্চাৎপদের মধ্যখানে একটি পাতলা চামড়ার মত অংশ দেখা যায়—ইহাকে প্যাটাজিয়ার (Patagia) সমান মনে করা হয় কিন্তু ইহা অত্যন্ত ক্ষুদ্র এবং

বিশেষ কার্যকরী নয়। বৃক্ষে বাস করিবার জন্য ইহাদের আঙ্গুলের প্রান্তে প্যাড দেখা যায়।



চিত্র 32 : উড়ো ব্যাঙ।

উড়ো গিরগিটি (Flying lizard) : গিরগিটি সাধারণতঃ গাছে বাস করে। খাদ্য এবং আশ্রয়ের জন্য ইহাদের একটি ডাল হইতে অন্য ডালে দ্রুত গতিতে যাইতে হয়। ইহার ফলে কয়েকটি গিরগিটির দেহে নিষ্ক্রিয় উড্ডয়নের অভিযোজন দেখা যায়।



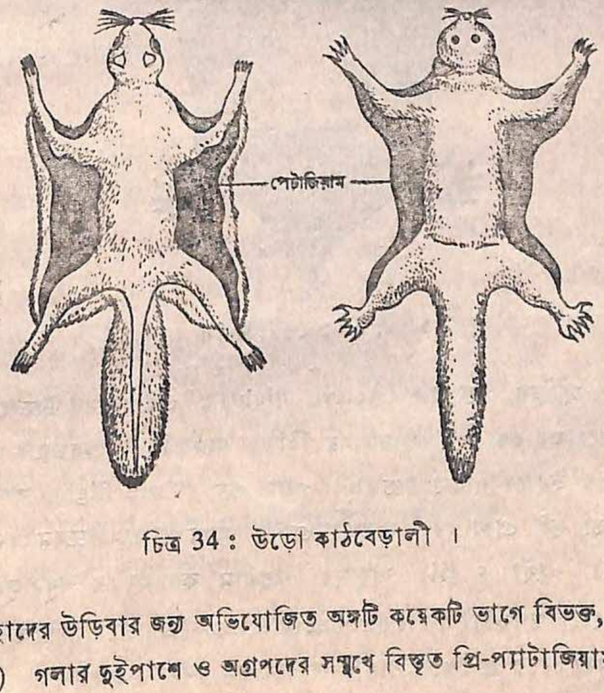
চিত্র 33 : ড্রাকো ও টাইকোজুন।

'ড্রাকো' (Draco) নামক গিরগিটিতে নিষ্ক্রিয় উড্ডয়নের অভিযোজন সুস্পষ্টভাবে দেখা যায়। ইহাদের অগ্রপদ ও পশ্চাৎপদের মধ্যে দেহের দুই

পাশের দুইটি প্রসারিত অংশ বা **প্যাটাজিয়া** (Patagia) থাকে। গাছে চলাফেরার সময় উহা গুটানো থাকে এবং বাতাসে ভাসিবার সময় প্রসারিত হয়। ড্রাকোর প্যাটাজিয়ার ভিতর পাঁজরের কিছু অংশ দেখিতে পাওয়া যায়।

উড়ো তক্ষক বা **টাইকোজুন** (Ptychozoon) এবং **উড়ো সাপ** বা **ক্রাইসোপিলিয়া** (Chrysopelea) প্রভৃতি সরীসৃপ কিছুক্ষণ বাতাসে ভাসিয়া থাকিতে পারে।

(৪) **উড়ো লেমুর** (Flying lemer) : গ্যালিও পিথেকাস (Galeo-pithecus) নামক লেমুরের দেহে নিষ্ক্রিয় উড্ডয়নের অভিযোজন সুন্দরভাবে দেখা যায়। ইহারা বৃক্ষবাসী এবং এক বৃক্ষ হইতে অন্য বৃক্ষে যাইবার সময় উড়িয়া (?) যায়। ইহাদের প্যাটাজিয়া অত্যন্ত সুগঠিত। কেবল অগ্রপদ এবং পশ্চাদপদের মধ্যের অংশেই নয়, মাথা হইতে লেজ পর্যন্ত ইহাদের প্যাটাজিয়া বিস্তৃত থাকায় ইহারা বহুক্ষণ বাতাসে ভাসিতে পারে।



চিত্র 34 : উড়ো কাঠবেড়ালী ।

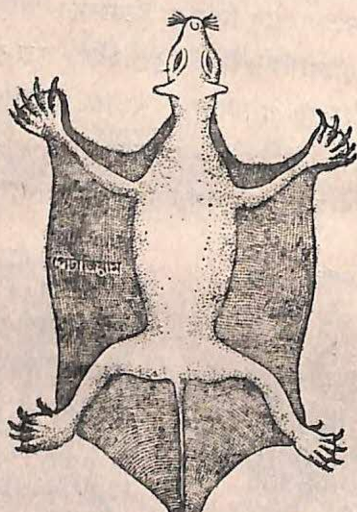
ইহাদের উড়িবার জন্য অভিযোজিত অঙ্গটি কয়েকটি ভাগে বিভক্ত, যথা—

(i) গলার দুইপাশে ও অগ্রপদের সম্মুখে বিস্তৃত প্রি-প্যাটাজিয়াম।

(ii) দেহের দুই পাশে অগ্রপদ ও পশ্চাদপদের মধ্যবর্তী প্যাটাজিয়াম এবং

(iii) পশ্চাদপদের পিছন হইতে লেজ পর্যন্ত বিস্তৃত ইন্টারফিমোরাল পর্দা।

উড়ো লেমুর ছাড়াও উড়ো ক্যালেঙ্গার ; উড়ো কাঠবিড়ালী (Flying squirrel), পেটাউরাস (*Petaurus*), স্কাইউরপটেরাস (*Sciuropterus*), টেরোমিস (*Pteromys*) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। স্তন্যপায়ী প্রাণীর মধ্যে বাদুড়ে যে উড্ডয়ন দেখা যায় তাহাকে সক্রিয় উড্ডয়ন বলা যায়।



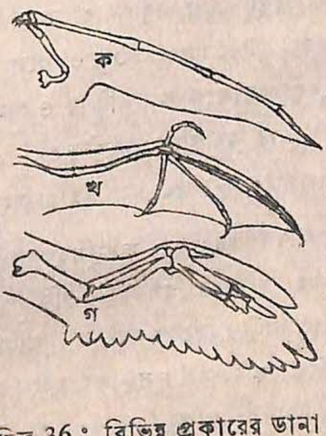
চিত্র 35 : পেটাউরাস

(খ) **সক্রিয় উড্ডয়ন** (Active flight) : এই ধরনের উড্ডয়নের জন্য শক্তির প্রয়োজন হয় এবং ওড়ার সময় বিভিন্ন অঙ্গগুলি সক্রিয়ভাবে সাহায্য করে বলিয়া ইহাকে সক্রিয় উড্ডয়ন বা প্রকৃত ওড়া (True flight) বলা হয়। সাধারণতঃ দুই প্রকারের মেরুদণ্ডী প্রাণীর মধ্যে সক্রিয় উড্ডয়ন দেখা যায়, যথা—(i) পাখী ও (ii) বাদুড়। অনুমান করা হয় যে অধুনালুপ্ত উড়ন্ত সরীসৃপ টেরোড্যাকটাইলস (Pterodactyles) ও সক্রিয়ভাবে উড়িতে পারিত। এখানে মুখ্য খেচর প্রাণীরূপে পাখীর অভিযোজন বর্ণনা করা হইল।

(i) **পাখীর উড়িবার অভিযোজন** (Volant adaptation of birds) :

(1) **দেহরূপ** (Body contour) : পাখীর দেহের আকৃতি নৌকার মত অর্থাৎ সামনে ও পেছনে সরু, মধ্যস্থল মোটা। এইরূপ দেহাকৃতি হইবার ফলে ইহারা সহজেই বাতাসের বাধা দূর করিয়া অগ্রসর হইতে পারে। উড়িবার সময় ইহারা গলা লম্বা করে এবং পা দুটিকে গুটাইয়া লয়, এই ধরনের দেহরূপকে স্ট্রীম লাইন্ড (Stream lined) বলে। উড়িবার জন্য এই ধরনের দেহরূপ অত্যন্ত প্রয়োজন।

(2) **পালক** (Feathers) : একমাত্র পাখীর দেহই পালকে আবৃত। পালকগুলি পাখীর দেহকে রক্ষা করে, দেহের তাপ নিয়ন্ত্রণ করে এবং উড়িতে সাহায্য করে। প্রধান পালকগুলির মধ্যভাগে একটি দণ্ড বা র‍্যাচিস (Rachis) থাকে, ইহার নীচের দিকের অংশটিকে ক্যালামাস (Calamus) বলে। মধ্য দণ্ডের দুই পাশের প্রসারিত অংশকে ভেন (Vane) বলে। ইহার মধ্যে সরু সরু সুতার মত অংশ বা বার্ব (Barbs) থাকে; বার্ব-এর মধ্যে বারবিউল (Barbule) ও তাহাতে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম হুক (Hooks) থাকে। এই হুকগুলি উপরে নীচে আটকাইয়া পালকের ভিতর দিয়া বাতাস যাইতে দেয় না। ডানার পালকগুলি প্রসারিত হইয়া উড়িতে সাহায্য করে।



চিত্র 36 : বিভিন্ন প্রকারের ডানা।
(ক) টেরোড্যাকটাইল (খ) আরকিয়পটেরিস (গ) পাখী।

(3) **ডানা** (Wings) : পাখীর সামনের পা দুইটি ডানায় রূপান্তরিত হইয়াছে। পাখীর ডানার বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহা সামনের দিকে চওড়া কিন্তু

পিছনের দিকে ক্রমশ সরু হইয়াছে ফলে উপর হইতে নীচে বাতাসের চাপ বেশী পড়ে এবং ডানার সাহায্যে পাখী বাতাসে ভাসিয়া থাকিতে পারে। সামনের পায়ের অস্থিগুলি পরিবর্তিত হইয়া একটি চামড়ার সাহায্যে ঢাকা থাকে—ইহাকে প্যাটাজিয়াম বলে। পালকগুলি এই প্যাটাজিয়ামের সহিত আটকাইয়া থাকে ও ডানা গঠন করে। পাখীর ডানা যে কেবল পাখীকে বাতাসে ভাসিয়া থাকিতে সাহায্য করে তাহা নয়, ইহা সামনে-পিছনে উপর-নীচে এবং সঙ্কুচিত-প্রসারিত হইয়া পাখীকে বিভিন্নভাবে উড়িতে সাহায্য করে।

(4) **উড়িবার পেশী** (Flight muscles) **ঃ** পাখীর দেহে বিশেষতঃ বক্ষদেশে কয়েকজোড়া পেশী আছে যাহা পাখীর ডানা উঠাইতে-নামাইতে অথবা সঙ্কুচিত-প্রসারিত হইতে সাহায্য করে। ইহাদের উড্ডয়ন পেশী বা উড়িবার পেশী বলে। পেকটোরালিস মেজর (Pectoralis major) এবং পেকটোরালিস মাইনর (Pectoralis minor) পাখীর দুইটি উল্লেখযোগ্য উড়িবার পেশী। বক্ষদেহের অস্থির উপর একটি কীল (Keel)-এর সহিত এই পেশীগুলি আটকাইয়া থাকে।

(5) **অস্থি** (Bones) **ঃ** পাখীর দেহে অস্থি বা হাড়গুলি নরম এবং হাল্‌কা। এই সকল অস্থির মধ্যে বায়ু পূর্ণ থাকে বলিয়া ইহাদের স্পঞ্জের মত অস্থি বা নিউম্যাটিক বোন (Pneumatic bone) বলে। বহু অস্থি পরস্পরের সহিত যুক্ত হইয়া দেহ কঙ্কালকে স্বল্প পরিসর ও হালকা করিয়া তুলিয়াছে। দেহের ওজনও দুইটি ডানার মধ্যস্থানে কেন্দ্রীভূত। এই সকল পরিবর্তনের ফলে পাখীর ওজন হালকা অনুভূত হয় এবং উহারা সহজে উড়িতে পারে।

(6) **বায়ু থলি** (Air sacs) **ঃ** ফুসফুসদ্বয় পাখীর প্রধান শ্বসন অঙ্গ হইলেও উড়িবার সময় ইহাদের শ্বসনহার বৃদ্ধি পায় এবং অধিক বায়ুর প্রয়োজন হয়। এই বায়ু পাখীর দেহের নয়টি **বায়ু থলি** (Air sac)-তে সঞ্চিত থাকে। বায়ু থলিগুলির একটি অংশ ফুসফুসের সহিত যুক্ত থাকে অন্য অংশটি দেহের বিভিন্ন স্থানে, এমন কি অস্থির ভিতরেও প্রবেশ করে। বায়ু থলির উপস্থিতি পাখীর উড়িবার জন্য একটি উল্লেখযোগ্য অভিযোজন।

(7) **ঠোঁট এবং পা** (Beak and legs) **ঃ** পাখীর সামনের পা দুইটি ডানায় পরিবর্তিত হওয়ায় উহার ঠোঁট দুইটি বিভিন্ন প্রকার খাদ্য সংগ্রহের জন্য

এবং পিছনের পা দুইটি বিভিন্ন প্রকারের বৃক্ষে বা ডালে বসিবার জন্য অভিযোজিত। অনেক পাখী উড়িতে উড়িতে কীটপতঙ্গ খায়—উহাদের ঠোঁট সেইভাবে পরিবর্তিত। পাখী কেবল উড়িয়া বেড়ায় না, বিশ্রামকালে উহারা গাছের উপর, ছাদে অথবা মাটির উপর থাকে সেইজন্য উহাদের পাগুলি ও সেইভাবে পরিবর্তিত।

(8) **অন্যান্য অঙ্গ** (Other organs)ঃ পাখীর দেহের সকল অঙ্গই উহাকে উড়িতে সাহায্য করে এবং অঙ্গগুলি সেইভাবে অভিযোজিত। সাধারণতঃ ভারী অঙ্গগুলি দেহের পিছনের দিকে এবং অপেক্ষাকৃত হালকা অঙ্গগুলি সামনের দিকে থাকে। ইহাদের হৃৎপিণ্ডটি অন্যান্য অঙ্গের তুলনায় বড় এবং রক্ত সংবহন তন্ত্রটি সুগঠিত। মস্তিষ্ক এবং জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলিও সুপরিণত। পাখীর দেহে বিভিন্ন অঙ্গের সুপরিকল্পিত সংস্থান উহার উড়িবার জন্য বিশেষভাবে দায়ী।

(ii) বাদুড়ের অভিযোজন (Adaptation of bat)

বাদুড় স্তন্যপায়ী প্রাণী হইলেও পাখীর মত সহজেই উড়িতে পারে। ইহাদেরও সামনের পা দুইটি ডানায় রূপান্তরিত তবে উহাদের ডানার সহিত পাখীর ডানার পার্থক্য আছে। ইহাদের সামনের পায়ের আঙ্গুলগুলি লম্বা এবং পাতলা চামড়ার দ্বারা যুক্ত। এই পাতলা চামড়াকে প্যাটাজিয়াম (Patagium) বলে এবং ইহাই বাদুড়ের ডানা। বাদুড়ের প্যাটাজিয়াম দেহের ঘাড় হইতে পিছনের পা পর্যন্ত বিস্তৃত। চামচিকের প্যাটাজিয়াম উপর হইতে নীচের লেজ পর্যন্ত বিস্তৃত। বাদুড়ের সামনের পায়ের প্রথম আঙ্গুলটি স্বাধীন এবং নখর যুক্ত। ইহার সাহায্যে উহারা গাছের ফল ধরিয়া খাইতে পারে। ইহারা পিছনের পায়ের নখরগুলি গাছের ডালে আটকাইয়া পা উপরে এবং মাথা নীচে করিয়া ঝুলিতে থাকে।

চামচিকে এবং বাদুড় রাত্রি বেলায় বাহির হয় সেইজন্য উহাদের নিশাচর প্রাণী বলে। রাত্রিকালে গভীর অন্ধকারে ইহারা এক প্রকার দ্রুতগতি সম্পন্ন শব্দতরঙ্গ (Ultrasonic sound waves) বাতাসে ছড়াইয়া দেয়। সামনের বস্তুতে সেই তরঙ্গ প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া আসিলে ইহারা সেই প্রতিহত শব্দ তরঙ্গের দ্বারা ঐ বস্তুর অবস্থান বুঝিতে পারে। কোন বিশেষ অঙ্গের সাহায্যে ইহারা ঐ শব্দতরঙ্গ গ্রহণ করে তাহা এখনও জানা যায় নাই।

পাখী এবং বাদুড় প্রকৃত উড়িবার জন্য অভিযোজিত হইলেও উহারা সকল সময় উড়িতে পারে না। বিশ্রামকালে উহাদের মাটিতে নামিয়া আসিতে হয়। ইহাদের মধ্যে কেহ বাস করে বৃক্ষে (যথা—কাক ও বাদুড়), কেহ জলে (হাঁস) কেহ পুরাতন ও অন্ধকার ঘরে (যথা—চামচিকে) প্রভৃতি। অতএব ইহাদের ক্ষেত্রে দুইটি অভিযোজন দেখা যায়—ইহাকে দ্বি-অভিযোজন (Double adaptation) বলে।

মরু অভিযোজন (Desert Adaptation)

পৃথিবীর কোন কোন অঞ্চলে বৃষ্টিপাত এত কম হয় যে সমগ্র অঞ্চলটি শুষ্ক বালুকণায় পূর্ণ হইয়া যায়, ইহাকে মরুভূমি বলে। এই অঞ্চলে মরুদ্যান ছাড়া জল পাওয়া যায় না, উদ্ভিদ ও প্রাণীর সংখ্যাও অত্যন্ত কম হয়। যে সকল উদ্ভিদ ও প্রাণী এই সকল অঞ্চলে বাস করে তাহাদের দেহে কয়েকটি বিশেষ পরিবর্তন দেখা যায়—ইহাদের মরু অভিযোজন বলে।

মরুভূমির বৈশিষ্ট্য ঃ মরুভূমি বিশাল বালুকা রাশি পূর্ণ স্থান। ইহার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য আছে, যথা—

(ক) অল্প বৃষ্টিপাত (সাধারণতঃ বৎসরে দশইঞ্চিরও কম)।

(খ) দিনে অতিরিক্ত গরম এবং রাত্রে অতিরিক্ত ঠাণ্ডা (চরম তাপমাত্রা)।

(গ) বাতাসে আর্দ্রতার প্রভাব।

(ঘ) বাতাসের গতির ফলে প্রায়ই বালুঝড় বা ধূলি ঝড় ওঠে।

(ঙ) উদ্ভিদ এবং প্রাণীর স্বল্পতা।

(চ) জলের অভাব।

উপরে মরুভূমির বৈশিষ্ট্যগুলি লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে মরুবাসী জীবের প্রধান সমস্যা দুইটি, যথা—জল সংগ্রহ এবং জল সংরক্ষণ। ইহা ব্যতীত প্রতিকূল পরিবেশের সহিত কঠিন সংগ্রাম করিয়া ইহাদের জীবন ধারণ করিতে হয়। সেইজন্য মরুবাসী প্রাণীদের গঠনে কয়েকটি বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। ইহাকে মরুবাসী প্রাণীর অভিযোজন বলা হয়।

1. **জল-সংগ্রহ** (Moisture getting) ঃ মরুভূমিতে জলের অত্যন্ত অভাব বলিয়া জল সংগ্রহই মরুবাসী প্রাণীদের একটি বড় সমস্যা। মরুভূমির বাতাসে যে সামান্য পরিমাণ আর্দ্রতা থাকে তাহা হইতে বৃষ্টিপাত হয় না তবে

কোন কোন সময় দুই একটি গাছের পাতায় শিশির বিন্দুর আকারে থাকিতে পারে। মরুভূমির প্রাণী প্রধানতঃ এই সকল গাছের রস হইতে জল সংগ্রহ



চিত্র 37 : মলখ হরাইডাস।

করে; কোন কোন প্রাণী অন্য প্রাণীর রক্ত পান করে। উট, যাহাকে মরুভূমির জাহাজ বলা হয়, অল্প পরিমাণ জল গ্রহণ করিয়া বহুক্ষণ থাকিতে পারে। **মলখ হরাইডাস** (*Moloch horridus*) নামক এক ধরনের মরুবাসী গিরগিটি ব্লটিং কাগজের মত পরিবেশ হইতে দেহত্বকের সাহায্যে জল শোষণ করিতে পারে।

2. **জল-সংরক্ষণ** (Water conservation) : জল সংগ্রহ করিবার পর মরুবাসী প্রাণী তাহাকে সংরক্ষণ করিবার চেষ্টা করে। অধিকাংশ মরুজীব দেহের বিপাক হার কমাইয়া এই জল সংরক্ষণ করে। মরুভূমির স্তন্যপায়ী প্রাণীর দেহে ঘর্মের উৎপত্তি প্রায় হয় না বলিলেই চলে। এই ঘর্মের আকারে দেহের যে অতিরিক্ত জল বাহির হইয়া যাইত তাহাকে ইহারা সংরক্ষণ করে।

পূর্বে ধারণা ছিল যে উটের পাকস্থলীতে বহু জলকোষ (Water cells) থাকে যাহার ভিতর উট অতিরিক্ত জল সংগ্রহ করিয়া রাখে, কিন্তু বর্তমানে এই ধারণা ভ্রান্ত প্রমাণিত হইয়াছে।

3. **আত্মরক্ষা** (Defence) : যে সকল প্রাণী মরুভূমিতে বাস করে তাহাদের সর্বদাই প্রতিকূল পরিবেশের সহিত সংগ্রাম করিতে হয়। মরুভূমির তাপ, শৈত্য, বালি এবং বিভিন্ন শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিবার জন্য তাহাদের দেহে বিভিন্ন পরিবর্তন দেখা যায়।

(i) **তাপ হইতে রক্ষা :** মরুভূমিতে দিনের তাপমাত্রা অত্যন্ত বেশী আবার রাত্রের তাপমাত্রা অত্যন্ত কম। দিনের তাপ কখনও কখনও ১৮০° ফারেনহাইট ছাড়াইয়া যায়। দিনের প্রচণ্ড তাপে অধিকাংশ প্রাণী পাথরের ছায়ায় অথবা গর্তের মধ্যে বাস করে।

(ii) **বালি হইতে রক্ষা :** মরুভূমির ভয়ঙ্কর বালি এবং বালি ঝড় হইতে রক্ষা পাইবার জন্য মরু প্রাণীর মধ্যে বিভিন্ন অভিযোজন দেখা যায় :

1. **চোখ :** 'মরুভূমির জাহাজ' উটের চোখ দুইটি বড় কিন্তু বড় বড় পল্লবে আবৃত। উটের গলা লম্বা হওয়ায় সহজে চোখে বালি লাগে না। ধূলি-ঝড় বা বালি-ঝড়ের সময় ইহারা বালিতে মুখ গুঁজিয়া বসিয়া পড়ে। **টিফ্‌লপ্‌স** (Typhlops) নামক মরুভূমিতে এক ধরনের সাপ পাওয়া যায় যাহা গর্তের বাস করে। ইহাদের চোখ দুইটি ছোট ছোট এবং মাথার উপরকার আবরণী দিয়া আবৃত থাকে। মাবুইয়া (*Mabuia)* নামক গিরগিটির চোখের নীচের পাতায় একটি স্বচ্ছ অংশ থাকে যাহাতে চোখ বন্ধ করিয়াও ইহারা অল্প দেখিতে পায়। তবে অ্যাবলিফারাস (*Ablepharus*) নামক প্রাণীর চোখে নীচের পাতাটি সম্পূর্ণ স্বচ্ছ এবং উপরের পাতার সহিত যুক্ত। ইহার ফলে বালিতে বা ধূলিতে ইহাদের চোখের কোন ক্ষতি হয় না।

নাসারন্ধ্র (Nostrils) : অধিকাংশ মরুভূমির সরীসৃপের নাসারন্ধ্র দুইটি উপরের দিকে থাকে। কোন কোন মরুবাসী সাপের নাসারন্ধ্রের পথ অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ হয় অথবা কপাটিকা দ্বারা বন্ধ করা যায়। উটের নাসারন্ধ্রগুলি উট ইচ্ছানুসারে খুলিতে ও বন্ধ করিতে পারে।

3. **কান** (Ears) : মরুবাসী সরীসৃপদের কানের ছিদ্র অত্যন্ত ক্ষুদ্র হয় এবং আঁশ দ্বারা আবৃত থাকে। কোন কোন ক্ষেত্রে কান লুপ্ত হইয়া যায়। উটের কানের ছিদ্র দীর্ঘাকার রোম দিয়া ঢাকা থাকে।

4. **গলা** (Neck) : উট এইং উট পাখীর লম্বা গলা মরুভূমির অভিযোজন। লম্বা গলা থাকার ফলে ইহাদের মাথা বালি হইতে অনেক উপরে থাকে, ফলে চোখ, নাক, কান প্রভৃতি জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলি সুরক্ষিত থাকে।

শত্রু হইতে রক্ষা (Protection against enemies) : মরুবাসী প্রাণীরা বিভিন্ন উপায়ে শত্রু হইতে রক্ষা পাইবার চেষ্টা করে। সাধারণতঃ অধিকাংশ প্রাণীদের দেহের বর্ণ এরূপ হয় যাহাতে উহারা সহজেই পরিবেশের সহিত মিশিয়া যাইতে পারে। উদাহরণস্বরূপ উট এবং উট পাখীর কথা বলা যায়।

গাজেল (*Gazelle*) নামক প্রাণীর বর্ণ প্রায় বালির মত এবং মরুভূমিতে ইহাকে খুঁজিয়া বাহির করা কঠিন। অপরদিকে বিষাক্ত গিরগিটি '**গিলা মনস্টার** (Gila monster)-এর দেহ হলুদ এবং কালো বর্ণে মিশ্রিত যাহাতে উহার দেহ পরিবেশ হইতে প্রকট হইয়া পড়ে। সম্ভবতঃ ইহার বর্ণ বৈচিত্র্য অন্য প্রাণীকে ভয় পাওয়াইবার জন্য।

মরুভূমির কোন কোন গিরগিটির দেহ কঠিন, শুষ্ক এবং কাঁটাযুক্ত আঁশে আবৃত থাকে। যথা—মোলথ হরাইডাস (*Moloch horridus*) এবং ফ্রাইনোসোমা (*Phrynosoma*)। মরুবাসী প্রাণীদের মধ্যে বহু বিষাক্ত প্রাণী দেখা যায়,যথা—সাপ, বিষাক্ত গিরগিটি, পিঁপীলিকা, মাকড়সা প্রভৃতি। মরুভূমির মাকড়সার মধ্যে বিষাক্ত টারানটুলা (Tarantula) উল্লেখযোগ্য। বিষাক্ত কাঁকড়া বিছাও মরুভূমিতে পাওয়া যায়।

খাদ্য, পানীয় এবং আত্মরক্ষার জন্য মরুভূমির প্রাণীদের বহুদূরে গমন করিতে হয় সেইজন্য উহাদের দেহে কয়েকটি অভিযোজন দেখা যায়। মরুবাসী উটের পাগুলি লম্বা এবং গদির মত প্যাডযুক্ত থাকায় উহারা তপ্ত বালির উপর দিয়া বহুদূর যাইতে পারে। উটপাখীও বালির উপর ভাল দৌড়াতে পারে।

উটের অভিযোজন (Adaptation of camel) ঃ উট মরুভূমিতে বাস করিবার উপযুক্ত এবং ইহা বালির উপর দিয়া বহুদূর চলিতে পারে। সেইজন্য ইহাকে মরুভূমির জাহাজ (Ship of the desert) বলা হয়। উটের দেহে কয়েকটি মরু-অভিযোজন দেখা যায় তাহার মধ্যে প্রধান কয়েকটি উল্লেখ করা হইল ঃ

(i) উটের দেহের বর্ণ ধূসর হওয়ায় উহা বালির পরিবেশে মিশিয়া যাইতে পারে এবং শত্রুর হাত হইতে রক্ষা পায়।

(ii) উটের পায়ে গদির মত প্যাড থাকায় ইহাদের তপ্ত বালির উপর দিয়া চলিতে কষ্ট কম হয়। উটের খুরটিও বালির উপর দিয়া হাঁটিবার জন্য দ্বিখণ্ডিত।

(iii) উটের গলা লম্বা হওয়ায় চলিবার সময় উহার মাথাটি বালির অনেক উপরের দিকে থাকে যাহার ফলে চক্ষু, কর্ণ, নাসারন্ধ্র প্রভৃতি বালি হইতে রক্ষা পায়।

(iv) উটের চক্ষুর উপরে দীর্ঘ চক্ষু পল্লব থাকে, কর্ণের ভিতর বড় বড়

রোম থাকে এবং নাসারন্ধ্রটি সঙ্কুচিত হইতে পারে। ইহার ফলে এই অঙ্গগুলিতে সহসা বালি প্রবেশ করিতে পারে না।

(v) উটের পিঠের উপর যে কুঁজ থাকে তাহাতে চর্বি সঞ্চিত থাকে। প্রয়োজন হইলে উট তাহার সঞ্চিত চর্বি দেহের বিপাক ক্রিয়ায় ব্যবহার করিতে পারে। তবে এই প্রক্রিয়াটির সম্পর্কে মতভেদ আছে।

(vi) উটের দেহে জলের অপচয় কম হয়। সারাদিনে মূত্রের আকারে মাত্র অর্ধলিটার জলীয় পদার্থ নিষ্কাশিত হয়। 40°c তাপ না উঠা পর্যন্ত ইহাদের ঘাম হয় না।

(vii) উট একবারে প্রচুর জল পান করিতে পারে (প্রায় ২৭ গ্যালন)। উটের দেহে লোহিত কণিকার সংখ্যা বেশী থাকায় অতিরিক্ত জল দেহের মধ্যেই থাকিয়া যায়।

(viii) উটের দেহের ওজন হ্রাস পাইলেও কোনরূপ দুর্বলতার লক্ষণ প্রকাশ পায় না।

(ix) প্রয়োজন হইলে উট দ্রুত দৌড়াইতে পারে।

(x) উটের দৃষ্টি-শক্তি, শ্রবণশক্তি এবং ঘ্রাণশক্তি প্রবল।

উপরোক্ত অভিযোজনগুলি থাকিবার জন্য উট মরুভূমিতে অনায়াসে দীর্ঘপথ অতিক্রম করিতে পারে। সেইজন্য উটের অভিযোজনকে মরু-অভিযোজনের আদর্শ বলা যাইতে পারে।

সারাংশ

এই পৃথিবীতে বিভিন্ন ধরনের পরিবেশে বিভিন্ন প্রকারের প্রাণী বাস করে। কোনো বিশেষ পরিবেশে সামঞ্জস্য বিধানের জন্য জীবদেহে যে পরিবর্তন হয় তাহাকে অভিযোজন বলে। অভিযোজনকে জীব এবং পরিবেশের ক্রিয়া বিক্রিয়া এবং জৈব অভিব্যক্তির ফল বলা যায়। খাদ্য এবং আশ্রয়ের জন্য প্রাণী বিভিন্ন পরিবেশে ছড়াইয়া পড়ে এবং বিভিন্ন পরিবেশের সহিত সামঞ্জস্য বিধান করিতে তাহাদের দেহে বিভিন্ন প্রকারের অভিযোজন দেখা যায়। যখন একই গোষ্ঠীর জীব বিভিন্ন পরিবেশে অভিযোজিত হয় তাহাকে অপসারী অভিযোজন বা অভিযোজিত বিকিরণ বলে। আবার যখন বিভিন্ন গোষ্ঠীর জীব একই পরিবেশে অভিযোজিত হয় তাহাকে অভিসারী অভিযোজন বলে।

প্রাণীর অভিযোজনের অসংখ্য দৃষ্টান্ত দেখা যায় কিন্তু তাহার মধ্যে জলজ অভিযোজন, অন্তরীক্ষীয় বা খেচর অভিযোজন এবং মরু-অভিযোজন অন্যতম। জলজ অভিযোজনে মাছকে মুখ্য জলচর প্রাণীরূপে গণ্য করা হয় কারণ ইহাদের পূর্বপুরুষও জলে বাস করিত। অন্যদিকে তিমিকে গৌণ জলচর প্রাণী বলা হয় কারণ উহার পূর্বপুরুষ স্থলচর প্রাণী ছিল। ইহাদের দেহে কয়েকটি বৈশিষ্ট্য দেখা যায় যাহার ফলে ইহারা স্বচ্ছন্দে জলে বাস করে। আবার খেচর অভিযোজনে পাখীদের মধ্যে সক্রিয় উড্ডয়ন দেখা যায় কিন্তু উড়ো মাছ, উড়ো ব্যাঙ, উড়ো গিরগিটি প্রভৃতি প্রাণীতে নিষ্ক্রিয় উড্ডয়ন দেখা যায়। মরুভূমিতে যে সকল প্রাণী বাস করে তাহাদের দেহে মরু-অভিযোজন দেখা যায় যাহার ফলে তাহারা স্বচ্ছন্দে মরুভূমিতে বাস করিতে পারে। উটের অভিযোজনকে মরু-অভিযোজনের আদর্শ বলিয়া মনে করা হয়।

অনুশীলনী

1. অভিযোজন কাহাকে বলে? অপসারী ও অভিসারী অভিযোজন বলিতে কি বোঝায়?
2. মুখ্য অভিযোজন ও গৌন অভিযোজন কাহাকে বলে?
3. প্রাণীর অভিযোজনের বিভিন্ন প্রকারভেদ উল্লেখ কর।
4. জলজ অভিযোজন কি? একটি মুখ্য জলচর প্রাণীর অভিযোজনগুলি সংক্ষেপে আলোচনা কর।
5. গৌণ জলচর প্রাণী কি? ইহার প্রধান অভিযোজনগত বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখ কর।
6. নিষ্ক্রিয় উড্ডয়ন ও সক্রিয় উড্ডয়ন কাহাকে বলে? কয়েকটি খেচর প্রাণীর নিষ্ক্রিয় উড্ডয়ন ব্যাখ্যা কর।
7. পাখীর খেচর অভিযোজনগুলি সংক্ষেপে আলোচনা কর।
8. পাখী এবং বাদুড়ের অভিযোজনের মধ্যে কি কি পার্থক্য দেখা যায়?
9. মরুবাসী প্রাণীদের অভিযোজনগুলি সংক্ষেপে বর্ণনা কর।
10. উটের অভিযোজনকে মরু-অভিযোজনের আদর্শ বলা হয় কেন?
11. সংক্ষিপ্ত টীকা লিখ:
   (ক) অভিযোজিত বিকিরণ (খ) গৌণ অভিযোজন (গ) মুখ্য জলচর প্রাণী (ঘ) পার্শ্বরেখা (ঙ) নিষ্ক্রিয় উড্ডয়ন (চ) ড্রাকো (ছ) বায়ুথলি (জ) প্যাটাজিয়াম (ঝ) জল সংরক্ষণ (ঞ) দ্বি-অভিযোজন।

গ্রন্থপঞ্জী ও নির্দেশিকা (References)

1. Lull R. S. 1976. Organic Evolution, Macmillan, New York.
2. Mukherjee D. 1972. Text Book of Zoology, New Book Stall, Calcutta.
3. Ganguly, Sinha and Adhikari. 1979. Introduction to Biology of Animals. New Central Book Ageney Calcutta.
4. তারাপদ চট্টোপাধ্যায় ও সুমন্ত মুখোপাধ্যায় ১৯৮০, প্রাণিবিদ্যা, নিউ বুক স্টল, কলিকাতা
5. অসীম চট্টোপাধ্যায় ও অরুণ চট্টোপাধ্যায় ১৯৮১, প্রাণিবিদ্যা, নির্মলা লাইব্রেরী, কলিকাতা
6. মুখোপাধ্যায়, মেদ্দা, মেদ্দা, মুখোপাধ্যায়—১৯৮০, জীববিজ্ঞান নিউবুক স্টল, কলিকাতা

দ্বাদশ অধ্যায়

বর্ণবৈচিত্র্য ও অনুকৃতি (Colouration and Mimicry)

প্রাণীজগতে বিচিত্র বর্ণের প্রকাশ সত্যই আমাদের অভিভূত করে। জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে সকল পরিবেশেই বিভিন্ন বর্ণের সমাবেশ প্রকৃতিকে নানাভাবে সাজাইয়া তোলে। জীববিজ্ঞানীদের নিকট প্রাণিদের এই বর্ণবৈচিত্র্য সর্বদাই আগ্রহ ও কৌতুহল সৃষ্টি করে। যদিও অধিকাংশ বর্ণবৈচিত্র্য অভি-যোজনের দৃষ্টান্ত তবুও কিছু কিছু জটিল বর্ণবৈচিত্র্য এখনও ব্যাখ্যা করা সম্ভব হয় নাই।

বর্ণের উৎপত্তি (Colour Production) : প্রকৃতিতে বর্ণের উৎপত্তি দুইভাবে হইতে পারে। প্রথমত আলোক কোনো বস্তুর উপর পড়িলে তাহার কয়েকটি কিরণ শোষিত এবং কয়েকটি কিরণ প্রতিফলিত হইয়া বস্তুটির বর্ণ প্রকাশ করে। দ্বিতীয়ত কোনো বস্তুর দেহ ত্রিপার্শ্ব বা প্রিজম-এর মত আলোক কিরণকে প্রতিসারিত করিয়া বিভিন্ন বর্ণ উৎপন্ন করে। প্রথম পদ্ধতিটি একটি রাসায়নিক প্রক্রিয়া যাহা একপ্রকারের বর্ণ কণিকা বা মেলানিন (Melanin)-এর উপস্থিতিতে সম্ভব হয়। দ্বিতীয় পদ্ধতিটি ভৌত প্রক্রিয়া যাহা বিভিন্ন ঝিনুক বা শঙ্খের খোলকে দেখা যায়।

রাসায়নিক বর্ণ (Chemical Colours) : প্রাণিদেহের প্রায় সর্বত্রই বর্ণ কণিকার উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। কেবল দেহের উপরেই নয়, দেহের ভিতরেও এমনকি অঙ্গের মধ্যেও বিচিত্র বর্ণের উপস্থিতি বিস্ময়কর। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এই বর্ণ কোনো রাসায়নিক পদার্থের উপস্থিতির জন্য উৎপন্ন হয়। যেমন মানুষের লোহিত রক্ত কণিকায় হিমোগ্লোবিন (Haemoglobin) নামক লৌহ গঠিত পদার্থের উপস্থিতির জন্য রক্তের বর্ণ লাল হয়। আবার চিংড়ির রক্তে তাম্রগঠিত পদার্থ হিমোসায়ানিন (Haemocyanin)-এর উপস্থিতির জন্য উহার বর্ণ নীলাভ হয়। এই রাসায়নিক পদার্থগুলি প্রাণিদেহে কেবল অক্সিজেন বহন করিতে ব্যবহৃত হয়। সম্ভবতঃ প্রাণির বর্ণবৈচিত্র্যে ইহাদের কোনো তাৎপর্য নাই।

তবে প্রাণিজগতের অধিকাংশ বর্ণই বিশেষ তাৎপর্য পূর্ণ এবং ইহা প্রাণিদের জীবন সংগ্রামে অন্যতম ভূমিকা পালন করে।

সাধারণত প্রাণিদেহের বর্ণবিকাশগুলি দুই প্রকারের। এক প্রকারের বর্ণকণিকা অপরিবর্তিত অবস্থায় থাকে তাহার ফলে ইহাদের উপস্থিতি ঐ প্রানিদেহের বা তাহার বিশেষ অঙ্গের স্থায়ী বর্ণ সৃষ্টি করে। প্রাণিজগতে অধিকাংশ বর্ণকণিকাই এই প্রকারের। তবে কোনো কোনো বর্ণকণিকা পরিবর্তনশীল বর্ণস্থান বা ক্রোম্যাটোফোরস (Chromatophores) সৃষ্টি করে। **বহুরূপী বা ক্যামেলিয়ন** (Chameleon) নামক গিরগিটি জাতীয় প্রাণীর দেহে এই বর্ণ পরিবর্তন সহজেই লক্ষ্য করা যায়। ইহাদের দেহে বাদামী এবং সবুজ এই দুই প্রকারের ক্রোম্যাটোফোর দেখা যায় এবং পরিবেশের পরিবর্তনে ইহাদের বর্ণেরও পরিবর্তন ঘটে। দেহের পেশীতন্তুর সংকোচন ও প্রসারণের ফলে এক প্রকারের ক্রোম্যাটোফোর উপরের দিকে (চর্মের নীচে) উঠিয়া আসে ও অন্য প্রকারের ক্রোম্যাটোফোর নীচের দিকে নামিয়া যায়। এইভাবে প্রাণীর বর্ণ পরিবর্তন ঘটে। সম্ভবতঃ ক্রোম্যাটোফোরের পরিবর্তন চক্ষু ও চর্মের মাধ্যমে পিটুইটারি গ্রন্থির প্রভাবে সম্পন্ন হয়।

ভৌত বর্ণ (Physical Colours) ঃ অন্য একভাবেও প্রাণিদেহে বর্ণ পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। আলোর কিরণগুলি সমান্তরাল ভাবে কোনো বস্তুর উপর প্রতিফলিত হইয়া রামধনুর মত বিভিন্ন বর্ণে বিভক্ত হইয়া পড়ে এবং তথায় একাধিক বর্ণের সমাবেশ দেখা যায়, বিট্‌ল (Beetle) জাতীয় পতঙ্গের ডানায়, প্রজাপতির ডানায় অথবা পাখীর পালকে এইরূপ বর্ণের প্রকাশ দেখা যায়। উদাহরণ স্বরূপ ময়ূরের কণ্ঠের বর্ণ কখনও নীল, সবুজ আবার কখনও লালাভ দেখায়। ইহাকে ময়ূরকণ্ঠী বর্ণ বলে।

উদাসীন বর্ণ (Indifferent colours) ঃ জৈব অভিব্যক্তি ও অভি-যোজনের ভিত্তিতে কয়েকটি প্রাণীর বর্ণবৈচিত্র্য তাৎপর্য্যহীন বলিয়া উহাদের উদাসীন বর্ণ বলা হয়। উদাহরণ স্বরূপ সমুদ্রের গভীরে কোনো মাছের পাখনায় বিচিত্র বর্ণের সমাবেশ দেখা যায়। এই সকল মাছ যেখানে বাস করে সেখানে সূর্যালোক প্রবেশ করে না যাহার ফলে এই বর্ণের প্রকাশ ঐ পরিবেশে অর্থহীন। সম্ভবতঃ উহাদের পূর্বপুরুষ কম গভীর জলে বাস করিত এবং তথা হইতে ঐ বর্ণের প্রকাশ পরবর্তী প্রজন্মে সঞ্চারিত হইয়াছে।

বর্ণাভাব বা অ্যালবিনিজম (Albinism) : ইহার অর্থ দেহের রোম, পালক অথবা চর্মে সম্পূর্ণভাবে বর্ণের অভাব। ইহার ফলে এই ধরণের প্রাণী সাধারণতঃ সম্পূর্ণ সাদা হয়। ইহাদের চোখ লাল বা গোলাপী হয় কারণ বাহির হইতে ইহাদের চোখের ভিতরকার রক্তবাহকের উপস্থিতি বুঝিতে পারা যায়। আবার ইহাদের লোম বা পালকের মধ্যে সূক্ষ্ম ফাঁকগুলি বাতাসে পূর্ণ থাকে এবং তাহা সম্পূর্ণভাবে আলোকে প্রতিফলিত করে বলিয়া উহাদের সাদা দেখায় (সমুদ্রের ফেনাও একই কারণে সাদা দেখায়)। সাদা কাক, সাদা ময়ূর, সাদা ইঁদুর, সাদা খরগোশ, সাদা বাঘ, সাদা হাতী প্রভৃতি এইরূপ অ্যালবিনোর উদাহরণ।

বর্ণাধিক্য বা মেলানিজম (Melanism) : ইহা বর্ণাভাবের ঠিক বিপরীত কারণ চর্মে কৃষ্ণ বর্ণের মেলানিন (Melanin) নামক বর্ণ কণিকার আধিক্যের ফলে সমগ্র প্রাণীটিই কৃষ্ণবর্ণের হইয়া পড়ে, কৃষ্ণবর্ণের লেপার্ড (Black leopard) এইরূপ মেলানিজম এর উদাহরণ। শ্বেতবর্ণ এবং কৃষ্ণ বর্ণযুক্ত প্রাণীদের যথাক্রমে অ্যালবিনো (Albino) এবং মিলানো (Melano) বলে। ইহারা সম্ভবতঃ প্রকৃতিতে মিউটেশন এর ফলে উৎপন্ন হয় এবং বংশগতিতে মেণ্ডেলের সূত্র অনুসরণ করে। ইহার ফলে পোষা প্রাণীর মধ্যেও অ্যালবিনো প্রাণী সৃষ্টি করা সম্ভব হইয়াছে।

প্রাণিজগতে অধিকতর তাৎপর্য্যপূর্ণ বা প্রয়োজনীয় বর্ণ তাহাই যাহা প্রত্যক্ষভাবে কোনো শারীরবৃত্তীয় প্রয়োজন সম্পন্ন করে। এই ধরণের প্রয়োজনীয় বর্ণকে নিম্নলিখিত কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করা যায়—

(ক) গুপ্ত বা অপ্রকাশিত বর্ণ (Concealing Colour)
(খ) সতর্কতা মূলক বা প্রকাশিত বর্ণ (Warning Colour)
(গ) নির্দেশক চিহ্ন (Signal marks)
(ঘ) বিশৃঙ্খল বর্ণ (Confursing Colour)
(ঙ) যৌন বর্ণ (Sexual Colour)
(চ) অনুকরণীয় বর্ণ (Mimetic Colour)

1. **গুপ্তবর্ণ** (Concealing Colour) : অধিকাংশ প্রাণীর বর্ণ এইরূপ হয় যে তাহা পরিবেশের বর্ণের সহিত সম্পূর্ণভাবে মিশিয়া যায় যাহার ফলে ঐ পরিবেশে প্রাণীটির উপস্থিতি বোঝা যায় না। এই ধরণের বর্ণবৈচিত্র্য

প্রাণীটিকে তাহার শত্রুর হাত হইতে রক্ষা করিতে পারে, ইহাকে রক্ষণাত্মক (Protective) বর্ণবৈচিত্র্য বলে। যথা—মরুবাসী খরগোশ (Arctic hare)। আবার ইহা প্রাণীটিকে তাহার শিকার ধরিতেও সাহায্য করে, ইহাকে আক্রমণাত্মক (Agressive) বর্ণবৈচিত্র্য বলে, যথা মরুবাসী ফক্স (Arctic fox)। অবশ্য এক হিসাবে মরু-খরগোশ ও মরু ফক্স উভয়কেই রক্ষণাত্মক বর্ণ বলা যাইতে পারে কারণ মরু খরগোশকে যেমন শত্রুর হাত হইতে নিজেকে রক্ষা করিতে হয় অন্যদিকে মরু ফক্সকে ক্ষুধার নিবৃত্তি করিয়া নিজেকে বাঁচাইতে হয়।

একই প্রজাতির প্রাণী অথবা একই প্রাণীর বর্ণ ভিন্ন পরিবেশে বিভিন্ন প্রকারের হইতে পারে। এই ধরণের বর্ণবৈচিত্র্যকে স্থানীয় বর্ণ (Local Colour) বলা হয়। মরু অঞ্চলের স্তন্যপায়ী গ্যাজেল (Gazelle) নামক মৃগজাতীয় প্রাণীর দেহের বর্ণ সাদা হইতে গাঢ় ধূসর পর্যন্ত বিভিন্ন বর্ণের হয়। যে সকল গ্যাজেল বালির পরিবেশে বাস করে তাহাদের বর্ণ হালকা ধূসর হয় কিন্তু যাহারা আগ্নেয় শিলার পরিবেশে বাস করে তাহাদের বর্ণ গাঢ় ধূসর হয়। কখনও কখনও একই প্রজাতির প্রাণীর দেহবর্ণ বিভিন্ন ঋতুর পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হয়। বিভিন্ন প্রকারের স্তন্যপায়ী ও পাখীর দেহে এইরূপ ঋতুকালীন (Seasonal) বর্ণবৈচিত্র্য দেখা যায়। মেরুশৃগাল (Arctic fox), মেরু খরগোশ (Arctic hare) প্রভৃতি প্রাণীর ক্ষেত্রে এইরূপ বর্ণ পরিবর্তন দেখা যায়।

সাধারণভাবে বলা যায় অভিযোজনের ফলে এই সকল প্রাণীর দেহ উহাদের পরিবেশের সহিত সম্পূর্ণভাবে মিশিয়া যাইতে পারে। মরুবাসী প্রাণী সাধারণত ধূসর বর্ণের হয় যেমন—গ্যাজেল, উট, সিংহ প্রভৃতি। সবুজ অরণ্যে বসবাসকারী কীটপতঙ্গ সাধারণত সবুজ হয় যাহাতে সবুজ বৃক্ষের উপর তাহাদের উপস্থিতি সহজে বোঝা যায় না। মেরু প্রদেশের অধিকাংশ প্রাণীর দেহই সাদা যাহাতে উহারা সাদা রঙের পটভূমিতে সহজেই মিশিয়া যায়। সী-গাল (Sea gull) নামক সামুদ্রিক পাখীর ডানার উপর দিক নীলাভ বা ধূসর এবং নীচের দিক সাদা থাকে যাহাতে জল এবং আকাশ উভয় পরিবেশেই উহারা মিশিয়া যাইতে পারে। আমাদের চারিদিকে এইরূপ অসংখ্য প্রাণী আছে যাহাদের বর্ণ পরিবেশের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ। সবুজ

গঙ্গাফড়িং, লাউডগা সাপ, টিয়াপাখী প্রভৃতি প্রাণী সবুজ গাছপালার মধ্যে সহজেই অদৃশ্য হইয়া যায়।

সতর্কতা মূলক বা প্রকাশিত বর্ণ (Warning or revealing colour) ঃ কোনো কোনো প্রাণীর দেহে সুস্পষ্ট লাল ও হলুদ দাগ থাকে যেমন দেখা যায় বোলতা, কোরাল সাপ, টাইগার স্যালাম্যাণ্ডার, গিলা মনস্টার এবং বিভিন্ন শূককীট ও প্রজাপতির বর্ণে। সম্ভবতঃ এইরূপ বর্ণের সাহায্যে ইহারা নিজেদের বিষাক্ত বা অখাদ্য (Unpalatable) বলিয়া বিজ্ঞাপিত করে। বোলতা, কোরাল সাপ ও গিলা মনস্টার এর ক্ষেত্রে এইরূপ ভয়ঙ্কর বর্ণ সম্ভবতঃ তাহাদের দেহে বিষের উপস্থিতি শত্রুকে জানাইবার জন্য। আবার পতঙ্গের শূককীট ও প্রজাপতির বর্ণ প্রধানতঃ উহাদের শত্রুদের জানাইয়া দিবার জন্য যে উহারা অখাদ্য (Unpalatable)। এইরূপ বর্ণের উপস্থিতির জন্য ইহাদের শত্রু (প্রধানত পাখী) এই প্রাণীদের সাধারণতঃ পরিহার করে। গোখুরা (Cobra) সাপের ফণার উপর এক ধরণের সতর্ক-চিহ্ন দেখা যায়। স্মেরিনথাস (Smerinthus) নামক এক প্রকার মথের পিছনের ডানার উপর দুইটি বড় চোখের মত দাগ দেখা যায়, বিশ্রামরত অবস্থায় এই দাগ দুইটি সামনের ডানা দিয়া ঢাকা থাকে।

নির্দেশক চিহ্ন (Signal marks) ঃ কোনো কোনো প্রজাতির প্রাণী তাহার অন্যান্য সদস্যদের একরূপ নির্দেশক চিহ্নের সাহায্যে শত্রু হইতে সাবধান করিয়া দেয়। এইরূপ প্রাণীরা সাধারণতঃ দলবদ্ধ ভাবে বাস করে। বিপদের সম্ভাবনা দেখিলেই দলের অন্যান্য সদস্যদের শত্রুর উপস্থিতি সম্পর্কে সাবধান করিয়া দেয়। **ভার্জিনিয় মৃগের** (Virginia deer) লেজের তলার দিকে সাদা অংশ থাকে। বিপদের সম্ভাবনা দেখিলেই এই মৃগ লেজটি তুলিয়া দলের অন্যান্য সদস্যদের সাবধান করিয়া দেয় এবং সমগ্র দলটি লুকাইয়া পড়ে। আমেরিকার **অ্যান্টিলোক্যাপরা** (Antelocapra) নামক মৃগের নিতম্বদেশে এক ধরণের সাদা দাগ দেখা যায়। এইখানকার ত্বক কুঞ্চিত করিয়া ইহারা অন্যান্য মৃগকে সাবধান করে। **লেপাস সিলভ্যাটিকাস** (*Lepus sylvaticus*) নামক খরগোশের সাদা তুলার মত লেজ (Cotton tail) থাকে যাহা উপরে তুলিয়া ইহারা শাবকদের সঠিক পথ নির্দেশ করে। এই ধরণের নির্দেশক চিহ্ন কোনো কোনো মাছ এবং বহু কীটপতঙ্গেও দেখা যায়।

বিশৃঙ্খল বর্ণ (Confusing colouration) : বহু প্রজাপতি এবং মথ যখন উড়িয়া বেড়ায় তখন তাহাদের সুন্দর বর্ণের জন্য সহজেই চোখে পড়ে। কিন্তু উড়িতে উড়িতে যখন সহসা তাহারা কোথাও বসে তখন আর তাহাদের দেখিতে পাওয়া যায় না। প্রকৃত পক্ষে এই সকল প্রজাপতি বা মথের উপরের দিকটি বহুবর্ণ রঞ্জিত কিন্তু নীচের দিকের বর্ণ ধূসর অথবা বাদামী। সেইজন্য উড়িবার সময় ইহাদের বর্ণবৈচিত্র্য দৃষ্টি আকর্ষণ করে কিন্তু গাছের ডালের উপর বসিলেই ইহাদের বহুবর্ণ সহসা অন্তর্নিহিত হয় এবং সহজেই ইহারা আত্ম-গোপন করিতে পারে।

যৌন বর্ণ বৈচিত্র্য (Sexual Colouration) : প্রাণিদের যৌন নির্বাচনে বর্ণবৈচিত্র্য কখনও কখনও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পাখী ও স্তন্যপায়ী প্রাণীর ক্ষেত্রে পুরুষ প্রাণীগুলিতে অধিকতর বর্ণবৈচিত্র্য দেখা যায়। ময়ূরের বর্ণময় পেখম, মোরগের ঝুঁটি এবং লেজে এই ধরণের বর্ণবৈচিত্র্য দেখা যায়। স্ত্রী প্রাণীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্য সম্ভবতঃ এইরূপ বর্ণবৈচিত্র্যের উদ্ভব হইয়াছিল। অন্য দিকে স্ত্রী প্রাণীর ডিম্ব বা বাচ্চা প্রসবের সময় গোপনীয়তার প্রয়োজন হয় এবং উহাদের দেহে অপেক্ষাকৃত কম বর্ণবৈচিত্র্য দেখা যায়।

অনুকৃতি বা মিমিক্রি (Mimicry) :

কোনো কোনো উদ্ভিদ বা প্রাণীর সহিত অপর কোনো সজীব বস্তু বা নির্জীব বস্তুর বর্ণ, আকার বা ব্যবহারে আশ্চর্যজনক সাদৃশ্য দেখা যায় যাহার ফলে প্রথমোক্ত উদ্ভিদ বা প্রাণীটি শত্রুর নিকট হইতে আত্মগোপন করে অথবা এমন আক্রমণাত্মক ব্যবহার প্রদর্শন করে যাহা প্রকৃত (real) নয়। ইহাকে অনুকৃতি বা মিমিক্রি বলে যাহা প্রকৃতির একটি বিস্ময়কর আত্মরক্ষামূলক পদ্ধতি। যে সকল উদ্ভিদ বা প্রাণী অনুকরণ করে তাহাদের অনুকরণকারী বা মিমিক (Mimic) বলে এবং উহারা যাহাদের অনুকরণ করে তাহাদের আদর্শ বা মডেল (Model) বলে। জীবজগতে অনুকরণকারীরা একটি পাথরের নুড়ি হইতে আরম্ভ করিয়া গাছের পাতা, অপর প্রাণী বা মৃত প্রাণীর ন্যায় আচরণ করে। অতএব প্রকৃতির সকল বস্তুই মিমিক-এর মডেল হইতে পারে।

বর্ণবৈচিত্র্যের মত অনুকৃতিকেও দুইভাগে বিভক্ত করা যায়, যথা—আত্মরক্ষামূলক অনুকৃতি ও আক্রমণাত্মক অনুকৃতি।

1. আত্মরক্ষামূলক অনুকৃতি (Protective mimicry) :

অধিকাংশ অনুকৃতিই আত্মরক্ষামূলক। ইহাকে আবার দুইভাগে ভাগ করা যায় যথা—গুপ্ত বা অপ্রকাশিত অনুকৃতি এবং সতর্কতামূলক অনুকৃতি।

A. গুপ্ত বা অপ্রকাশিত অনুকৃতি (Concealing mimicry) :

অধিকাংশ অনুকরণকারী শত্রুদের হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য আত্মরক্ষামূলক অনুকৃতির আশ্রয় গ্রহণ করে।

(i) **ক্রিপ্টোলিথোডিস** (Cryptolithodes) নামক এক প্রকারের কাঁকড়ার দেহ মসৃণ এবং গোলাকার। ইহারা যখন সমুদ্রোপকূলে পাথরের নুড়ির সঙ্গে মিশিয়া থাকে তখন খুব নিকট হইতেও ইহাদের চিনিতে পারা যায় না। যাঁহারা এই প্রাণীটিকে লক্ষ্য করিয়াছেন তাঁহারা বলেন যে ইহাদের অনুকরণ এতই সুন্দর যে ইহাদের অঙ্কীয়দেশে অবস্থিত পদগুলি না দেখিলে বুঝিতে পারা যায়না ইহারা সত্য সত্যই পাথরের নুড়ি অথবা প্রাণী। অপর এক ধরণের কাঁকড়া প্রবাল-খণ্ডকে অনুকরণ করে। সম্ভবতঃ ইহারা এইভাবে দুইটি কার্যই সম্পন্ন করে—প্রথমত, নিজেকে শত্রুর নিকট হইতে গোপন রাখা এবং দ্বিতীয়ত ইহাদের শিকার করিবার সময় শিকারকে নিজের উপস্থিতি বুঝিতে না দেওয়া।

(ii) **জিওমট্রিড মথ** (Geomotrid moth)-এর লার্ভা বা শূককীট (Caterpillar) বর্ণবৈচিত্র্যে, আকারে এবং আচরণে সম্পূর্ণভাবে গাছের ক্ষুদ্র শাখাকে অনুকরণ করে। **সেলেনিয়া টেট্রালুনেরিয়া** (*Selenia tetralunaria*) নামক মথের শূককীট বার্চ গাছে বাস করে এবং উহা গাছের শাখায় এমনভাবে কোন সৃষ্টি করিয়া আটকাইয়া থাকে উহাকে গাছের ক্ষুদ্র শাখা বলিয়া ভ্রম হয়। উহার মস্তক ও সামনের পা দুটি এমনভাবে থাকে যে তাহাকে শাখার অগ্রমুকুল (terminal bud) বলিয়া মনে হয়।

(iii) **কাঠি পতঙ্গ** (Stick insect) আমাদের দেশে প্রচুর দেখা যায়। ইহাদের বর্ণ ও আকার সরু শাখা বা কাঠির মত। ইহারা অত্যন্ত ধীরে ধীরে চলে বলিয়া পরিবেশের সহিত সহজেই মিশিয়া যায়। কোনো কাঠি পতঙ্গের বর্ণ শুষ্ক কাঠির মত হাল্কা বর্ণের আবার কোনো কাঠি পতঙ্গ সতেজ শাখার মত সবুজ।

(iv) **পত্রাকৃতি পতঙ্গ** (Leaf insect) বা **ফাইলিয়াম** (Phyllium) এক ধরণের পতঙ্গ যাহার আকার এবং বর্ণ সবুজ পাতার মত। ইহাদের

ডানা এবং দেহটি সবুজ বর্ণের ও চ্যাপ্টা পাতার মত। ডানার উপর যে শিরা-উপশিরা থাকে তাহার সহিত পাতার শিরাবিন্যাসের (Venation) সাদৃশ্য দেখা যায়। আশ্চর্য্যের বিষয় ইহাদের দেহে যে হলুদ বর্ণের দাগ থাকে তাহা পাতার উপর ছত্রাকের দাগের মত দেখায়। সেইজন্য ইহাদের অনুকৃতিকে নিভুর্ল (Perfect) বলা যায়।

(v) **মৃত পত্র প্রজাপতি** (Dead leaf butterfly)ঃ কালিমা প্যারালেক্টা (*Kallima paralecta*) নামক একপ্রকার প্রজাপতি ভারতে



চিত্র 36 : বিভিন্ন প্রকারের অনুকৃতি।
(ক) মৃতপত্র প্রজাপতি (খ) জিওমট্রিড মথের লার্ভা
(গ) পত্রাকৃতি পতঙ্গ

দেখা যায়। ইহাদের পিছনের ডানা দুটি বর্ণে ও আকারে শুষ্ক পাতার মত। ইহারা যখন উড়িয়া বেড়ায় তখন উহাদের প্রজাতির নীল-কালো ও হলুদ-লাল বর্ণবৈচিত্র্যটি সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কিন্তু ইহারা কোথাও বসিলেই পরিবেশের সহিত সম্পূর্ণ মিশিয়া যায়। ইহাদের ডানা দুটি এইসময় শুষ্ক পাতার বর্ণ ও আকার ধারণ করে। ডানার মধ্যখানে মধ্যশিরা ও তাহার দুইদিকে শিরা উপশিরা দেখা যায়। ডানার উপর বাদামী ও হলুদ বর্ণের দাগ থাকায় উহাকে মৃত পত্রের মত দেখায়। পাতার মধ্যে কয়েকটি সাদা ছাপ শিশির বিন্দুর মত লাগিয়া থাকে। মৃতপত্র প্রজাতি বা কালিমা আত্ম-রক্ষামূলক অনুকৃতির একটি বিস্ময়কর উদাহরণ।

B. **সতর্কতামূলক অনুকৃতি** (Warning mimicry) : কোনো
কোনো প্রাণী তাহাদের বর্ণবৈচিত্র্য এরূপভাবে প্রকাশ করে যাহাতে উহাদের
শত্রু বা খাদক (Predator) সহজেই উহাদের চিহ্নিত করিতে পারে। এইরূপ
অনুকরণকারীগণ সাধারণতঃ কোনো বিষধর বা স্বাদহীন প্রাণীকে অনুকরণ
করে কিন্তু নিজেরা বিষহীন বা স্বাদযুক্ত হয়।

(i) **প্রবাল সাপ** (Coral snakes) নামক কয়েক ধরণের মারাত্মক
বিষধর সাপ দেখা যায়। ইহারা অধিকাংশই ইলাপিডি (Elapidae) গোত্রের
অন্তর্গত। ইহাদের দেহে লাল-কালো ডোরাকাটা দাগ দেখা যায়। এই
সাপগুলি বিষধর হইলেও মানুষকে কামড়াইতে পারে না; কারণ উহাদের
মুখের বিবর যথেষ্ট ছোট। ঐ অঞ্চলের বহু বিষহীন সাপ বর্ণবৈচিত্র্যে এই
সকল বিষধর সাপকে অনুকরণ করে এবং এইভাবে নিজের শত্রুকে প্রতারণ
করিয়া আত্মরক্ষা করে।

(ii) **হেটেরোডন** (Heterodon) নামক এক ধরণের বিষহীন সাপ
বর্ণবৈচিত্র্যে না হইলেও আচরণে বিষধর সাপকে অনুকরণ করে। ইহারা
বিষধর সাপের মত ফণা তুলিয়া হিস্ হিস্ শব্দ করে এবং ছোবল দিতে উদ্যত
হয় যদিও ইহাদের বিষদন্ত থাকে না। এই ধরণের অনুকৃতির ফলে ইহারা
শত্রুর নিকট হইতে রক্ষা পাইলেও মানুষের হাতে অকারণে প্রাণ হারায়।

(iii) কোনো কোনো পতঙ্গের মধ্যেও সতর্কতামূলক অনুকৃতি দেখা
যায়। এক ধরণের ফুলের পতঙ্গ (Flower fly) বর্ণবৈচিত্র্যে ও আচরণে
হুলযুক্ত (Stinging) মৌমাছি বা বোলতাকে অনুকরণ করে। কোনো কোনো
প্রজাপতি নিজেরা স্বাদযুক্ত (Palatable) হইয়াও অন্য স্বাদহীন (unpala-
table) প্রজাপতির বর্ণ অনুকরণ করে যাহার ফলে ইহাদের খাদকরা ইহাদের
বর্জন করে।

(iv) **মনার্ক** (Monarch) **প্রজাপতি** এক ধরণের স্বাদহীন প্রজাপতি
যাহাকে পতঙ্গভুক (insectivorous) পাখী খাদ্য হিসাবে পছন্দ করে না।
ভাইসেরয় প্রজাপতি (Viceroy butterfly) নামক এক ধরণের স্বাদযুক্ত
প্রজাপতি বর্ণবৈচিত্র্যে মোনার্ক প্রজাপতিকে সম্পূর্ণভাবে অনুকরণ করে যাহার
ফলে তাহাদেরও পতঙ্গভুক পাখীরা পরিহার করে।

2. **আক্রমণাত্মক অনুকৃতি (Agressive Mimicry)**ঃ কয়েকটি পতঙ্গভূক মাকড়সার মধ্যে আক্রমণাত্মক অনুকৃতি দেখা যায়। ইহারা সাধারণতঃ হলুদ বর্ণের হয় এবং সোনালী বর্ণ ফুলের উপর এমনভাবে নিশ্চল হইয়া বসিয়া থাকে যে পরিবেশের সহিত ইহারা সম্পূর্ণভাবে মিশিয়া যায়। যখন কোনো ক্ষুদ্রাকার পতঙ্গ ফুলের উপর বসে তখন এই মাকড়সা সহজেই তাহাকে আক্রমণ করিতে পারে।

অনুরূপভাবে যে সকল মাকড়সা অর্কিড ফুলের উপর বসে তাহারাও বর্ণে ও আকারে ফুলের বর্ণের সহিত মিশিয়া যায় এবং ঐ ফুলে যে সকল পতঙ্গ বসে তাহাদের ধরিয়া ফেলে।

আফ্রিকায় এক ধরণের গিরগিটি দেখা যায় যাহারা বর্ণবৈচিত্র্যে পরিবেশের সহিত সম্পূর্ণভাবে মিশিয়া যায় কিন্তু তাহাদের মুখের দুইপাশে দুইটি লাল রেখা থাকে। এই লালবর্ণ সম্ভবতঃ অন্যান্য কীটপতঙ্গকে প্রলুব্ধ করে যাহার ফলে ঐ পতঙ্গগুলি গিরগিটির নিকটে আসে এবং অচিরেই তাহার খাদ্যে পরিণত হয়।

3. **মৃতের মত ভান করিয়া থাকা (Simulation of Death)**ঃ

আমেরিকার **অপোসাম** (Opossum) বা **ডাইডেলফিস ভার্জিনিয়ানা** (*Didelphis virginiana*) শত্রুর দ্বারা আক্রান্ত হইলেই মূর্চ্ছা যায় বা মৃতের মত ভান করিয়া পড়িয়া থাকে। ইহারা প্রকৃতই মূর্চ্ছা যায় অথবা মৃতের মত ভান করিয়া থাকে তাহা সম্পূর্ণভাবে না জানা গেলেও এই ধরণের অভিযোজন ইহাদের শত্রুর হাত হইতে রক্ষা করে বিশেষতঃ যে সকল শত্রু মৃত প্রাণীকে খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে না।

অনুরূপভাবে বিভিন্ন ধরণের শক্তদেহী গুবরে পোকা বা **বিট্‌ল** (Beetle) শত্রুর দ্বারা আক্রান্ত হইলে কঠিন পাথরের খণ্ডের মত মাটিতে, ঘাসের উপর বা ঝোপের মধ্যে পড়িয়া যায় এবং কিছুক্ষণ নিশ্চল থাকে। এইভাবে ইহারা শত্রুর আক্রমণ হইতে রক্ষা পায়।

বেটেসিয়ান অনুকৃতি এবং মূলেরিয়ান অনুকৃতি (Batesian mimicry and Mullerian mimicry)ঃ

প্রকৃতি বিজ্ঞানী **বেট্‌স** (Bates) বিভিন্ন ধরণের প্রজাপতির মধ্যে অনুকৃতি পর্যবেক্ষণ করেন। তাঁহার মতে কয়েকটি স্বাদযুক্ত (Palatable) প্রজাতির

প্রজাপতি পতঙ্গভূক পাখীর আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য একটি স্বাদহীন (Unpalatable) প্রজাতির প্রজাপতিকে বর্ণে এবং আকারে সম্পূর্ণভাবে অনুকরণ করে। এই ধরণের অনুকৃতিকে **বেটেসিয়ান অনুকৃতি** বলা হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে স্বাদযুক্ত ভাইসেরয় প্রজাপতি বা **ব্যাসিলার্চিয়া আর্চিপ্পাস** (*Basilarchia archippus*) অপর এক স্বাদহীন প্রজাতি মোনার্ক প্রজাপতি বা **অ্যানোসিয়া প্লেকসিপ্পাস** (*Anosia plexippus*)-কে বর্ণে ও আকারে হুবহু অনুকরণ করে। পতঙ্গভূক পাখীরা ভাইসরয় প্রজাপতিকেও মনার্ক প্রজাপতির মত স্বাদহীন মনে করিয়া পরিহার করে।

অন্যদিকে প্রকৃতি বিজ্ঞানী **মূলার** (Muller) কয়েকটি স্বাদহীন প্রজাতির প্রজাপতির মধ্যে বিস্ময়কর সাদৃশ্য লক্ষ্য করেন। তাঁহার মতে এই সকল প্রজাতির প্রজাপতিগুলি একই বর্ণ ও আকারযুক্ত হওয়ায় তাহারা পতঙ্গভূক পাখীর দ্বারা কম আক্রান্ত হয়। মূলার অনুমান করেন যে কোনো প্রজাপতি স্বাদহীন কিনা জানিবার জন্য পাখীদের অভিজ্ঞতার প্রয়োজন হয়। এইভাবে বিভিন্ন প্রজাতির বিভিন্ন বর্ণযুক্ত স্বাদহীন প্রজাতি নির্বাচন করিতে পতঙ্গভূক পাখীরা বহু প্রজাপতি ধ্বংস করিয়া ফেলে। কিন্তু যখন কয়েকটি স্বাদহীন প্রজাতি একই বর্ণ ধারণ করে তখন তাহাদের ধ্বংসের পরিমাণ কম হয়। ইহাকে **মূলেরিয়ান মিমিক্রি** বলে। বিবি এবং কেনেডি (Beebee and Kenedy, 1957) ত্রিনিদাদ হইতে একটি মথ (Moth) আবিষ্কার করেন যাহা বর্ণে ও আকারে বোলতা (Wasp) কে অনুকরণ করে। মথ ও বোলতা উভয়েই স্বাদহীন। সেইজন্য ইহাকে মূলেরিয়ান মিমিক্রি বলা যায়।

অনুকৃতির শর্ত (Conditions for mimicry)ঃ বিজ্ঞানী **ওয়ালেস** (Wallace)-এর মতে অনুকৃতি জীবজগতে একটি বিস্ময়কর অভিযোজনের দৃষ্টান্ত এবং ইহা নিম্নলিখিত শর্তগুলির উপর নির্ভর করে—

(i) অনুকরণকারী বা মিমিক এবং তাহার অনুকরনীয় বস্তু বা মডেলকে একই অঞ্চলে থাকিতে হইবে।

(ii) অনুকরণকারীরা অপেক্ষাকৃত অধিক অসহায়।

(iii) অনুকরণকারীর সংখ্যা মডেল-এর সংখ্যার চেয়ে কম।

(iv) অনুকরণকারীরা তাহার নিকটস্থ প্রজাতি হইতে বর্ণে ও আকারে পৃথক।

(v) অনুকরণ সর্বদাই বহিরাকৃতিতে হয় এবং দৃশ্য (Visible) হয় কিন্তু এই অনুকরণ কখনও অনুকরণকারীর দেহের ভিতরে প্রভাব বিস্তার করে না।

অনুকৃতির উৎপত্তির কারণ কি ইহা লইয়া মতভেদ আছে। ডারউইন এবং তাহার শিষ্যদের মতে অনুকৃতি এক ধরণের অভিযোজন যাহা প্রাকৃতিক নির্বাচনের ফলেই সৃষ্টি হইয়াছে। আধুনিক বিজ্ঞানীরা মনে করেন জিন মিউটেশনের ফলেই অনুকৃতির আবির্ভাব হইয়াছে ; অবশ্য এই মিউটেশনেও প্রাকৃতিক নির্বাচন একটি প্রধান ভূমিকা পালন করে।

লেখক লাল (**R. S. Lull**)-এর মতে প্রকৃতি তাহার সন্তানদের সুরক্ষার জন্য যতগুলি ব্যবস্থা করিয়াছে তাহার মধ্যে অনুকৃতিই সর্বোত্তম।

সারাংশ

প্রাণিজগতে বিচিত্র বর্ণের সমারোহ সত্যই বিস্ময়কর। প্রাণিদেহে বর্ণের উৎপত্তি দুইভাবে হইতে পারে—প্রথমত কোনো বস্তুর উপর আলোক প্রতিফলিত হইয়া তাহার বর্ণ প্রকাশ করে, ইহা একটি রাসায়নিক প্রক্রিয়া যাহা প্রাণিদেহে বর্ণকণিকার উপস্থিতির জন্য সম্ভব হয়। দ্বিতীয়তঃ কোনো প্রাণীর দেহের উপর আলোক প্রতিসরিত হইয়া বর্ণ প্রকাশ করে, ইহাকে ভৌত বর্ণ বলে। কোনো কোনো প্রাণীর দেহে সম্পূর্ণ বর্ণাভাব বা অ্যাল-বিনিজম দেখা যায় আবার কোনো কোনো প্রাণীর দেহে বর্ণাধিক্য বা মেলা-নিজম দেখা যায়। প্রাণিজগতে যে সকল বর্ণ অধিক তাৎপর্যপূর্ণ তাহাদের মধ্যে প্রধানতঃ অপ্রকাশিত বর্ণ, প্রকাশিত বর্ণ, নির্দেশক চিহ্ন, বিশৃঙ্খল বর্ণ, যৌন বর্ণ ও অনুকরণীয় বর্ণ উল্লেখযোগ্য। কোনো কোনো জীবের সহিত অপর জীবের অথবা অপর কোনো নির্জীব পদার্থের যে আকারে, বর্ণে বা আচরণে বিস্ময়কর সাদৃশ্য দেখা যায়, ইহাকেই অনুকৃতি বা মিমিক্রি বলে। ক্রিপ্টোলিথোডিস, জিওমট্রিড মথ, কাঠি পতঙ্গ, পত্রাকৃতি পতঙ্গ, মৃতপত্র প্রজাপতি প্রভৃতি অনুকৃতির অসংখ্য দৃষ্টান্ত প্রাণিজগতে দেখা যায়। কোনো কোনো স্বাদযুক্ত প্রজাপতি তাহার শত্রু হইতে রক্ষা পাইবার জন্য অন্য কোনো স্বাদহীন প্রজাপতির বর্ণকে অনুকরণ করে—ইহাকে বেটেসিয়ান মিমিক্রি বলে। আবার কোনো কোনো স্বাদহীন একাধিক প্রজাপতির মধ্যে বর্ণের সাদৃশ্য দেখা যায়, ইহাকে মূলেরিয়ান মিমিক্রি বলে। ডারউইন-এর

মতে প্রাকৃতিক নির্বাচনের ফলেই প্রাণিজগতে বর্ণবৈচিত্র্য ও অনুকৃতির উদ্ভব হয়।

অনুশীলনী

1. প্রকৃতিতে বর্ণের উৎপত্তি কিভাবে হয়?
2. রাসায়নিক বর্ণ এবং ভৌতবর্ণ বলিতে কি বোঝায়?
3. বর্ণাভাব ও বর্ণাধিক্য কাহাকে বলে? উদাহরণ দাও।
4. গুপ্তবর্ণ ও অপ্রকাশিত বর্ণ কোন কোন প্রাণীতে দেখা যায়?
5. প্রকাশিত বর্ণ ও নির্দেশক চিহ্ন কোন কোন প্রাণীতে দেখা যায়?
6. অনুকৃতি কাহাকে বলে?
7. আত্মরক্ষামূলক অনুকৃতির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও।
8. বেটেসিয়ান মিমিক্রি এবং মুলেরিয়ান মিমিক্রি কাহাকে বলে? উদাহরণসহকারে বুঝাইয়া দাও।
9. অনুকৃতির শর্তগুলি কি কি?
10, সংক্ষিপ্ত টীকা লেখ:
    (ক) উদাসীন বর্ণ (খ) মেলানিজম (গ) বিশৃঙ্খল বর্ণ (ঘ) যৌন বর্ণ বৈচিত্র্য (ঙ) জিওমেট্রিড মথ (চ) মৃতপত্র প্রজাপতি (ছ) মনার্ক ও ভাইসেরয় প্রজাপতি ও (জ) ক্যামেলিয়ন।

গ্রন্থপঞ্জী ও নির্দেশিকা (References)

1. Lull R. S. 1976. Organic Evolution, Macmillon Co. New York.
2. Storer & Usinger. General Zoology, 4th-ed. Mc Graw Hill, Kogakusha.
3. Dodson E. O. 1968. Evolution, Process & Product Reinhold, New York.
4. Mukherjee D. 1972. Text Book of Zoology, New Book Stall, Calcutta.
5. Adhikari & Sihna 1973. Fundamentals of Biology of Animals, New Central Book Agency, Calcutta.

পরিশিষ্ট

প্রাণিজগতের সংক্ষিপ্ত শ্রেণীবিভাগ
[Outline Classification of the Animal Kingdom]

এই পৃথিবীতে সকল প্রাণীকে লইয়া প্রাণিজগত গঠিত হইয়াছে। অধিকাংশ প্রাণিবিজ্ঞানী সমগ্র প্রাণিজগতকে কয়েকটি পর্ব বা ফাইলা (Phyla)-তে বিভক্ত করিয়াছেন। প্রাণিজগতের অনেকগুলি পর্বের মধ্যে প্রধান এগারোটি পর্বের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হইল।

1. **পর্ব প্রোটোজোয়া** (Phylum Protozoa) বা আদ্য প্রাণী : এককোষী ও আনুবীক্ষণিক প্রাণী। একটিমাত্র কোষেই দেহের যাবতীয় কার্য সম্পন্ন হয় বলিয়া ইহাকে অ-কোষী (**Acellular**) বলা হয়।

উদাহরণ : ইউগ্লিনা (*Euglena*), অ্যামিবা (*Amoeba*), এন্টামিবা (*Entamoeba*), প্যারামেশিয়াম (*Paramecium*), ট্রিপানোসোমা (*Trypanosoma*), প্লাজমোডিয়াম (*Plasmodium*) প্রভৃতি।

2. **পর্ব পরিফেরা** (Phylum Porifera) বা ছিদ্রাল প্রাণী : দেহ অসংখ্য ছিদ্রযুক্ত, অচল ও অনুন্নত প্রাণী। ইহাদের সাধারণতঃ স্পঞ্জ (Sponge) বলে। সকল স্পঞ্জই জলজ প্রাণী এবং ইহাদের অধিকাংশই সামুদ্রিক।

উদাহরণ : সাইকন (*Sycon*), স্পঞ্জিলা (*Spongilla*), ইউস্পঞ্জিয়া (*Euspongia*), লিউকোসোলেনিয়া (*Leucosolenia*) প্রভৃতি।

3. **পর্ব নিডেরিয়া** (Phylum Cnidaria) বা একনালী দেহী প্রাণী দ্বিস্তর (Diploblastic) ও দংশক কোষ (Cnidoblast) বিশিষ্ট প্রাণী। দেহে একটি মাত্র নালী অর্থাৎ খাদ্য নালী ও দেহ গহ্বর একত্রিত ; ইহাকে সিলেনটেরন (Coelenteron) বলে।

উদাহরণ : হাইড্রা (*Hydra*), ওবেলিয়া (*Obelia*), জেলিফিশ বা অরেলিয়া (*Auralia*), সাগরকুসুম বা সী-অ্যানিমোন (Sea-anemone) প্রবাল বা কোরাল (Corals) প্রভৃতি।

4. **পর্ব টিনোফোরা (Phylum Ctenophora)** বা চিরুনী ধারী প্রাণী দ্বিস্তরযুক্ত এক নালীদেহী প্রাণী, দেহে দংশককোষ থাকে না কিন্তু চিরুনী প্লেট থাকে।

উদাহরণ : হর্মিফোরা (*Hormiphora*), বেরো (*Beroe*) প্লিউরোব্রাকিয়া (*Pleurobrachia*) প্রভৃতি।

5. **পর্ব প্লাটিহেলমিনথিস (Phylum Platyhelminthes)** বা চ্যাপ্টাকৃমি : ত্রিস্তর বিশিষ্ট, চ্যাপ্টা ধরনের প্রাণী, অধিকাংশই পরজীবী, কিছু স্বাধীনজীবী।

উদাহরণ : প্ল্যানেরিয়া (*Planaria*), যকৃৎকৃমি (Liverfluke), ফিতাকৃমি (Tapeworm) প্রভৃতি।

6. **পর্ব নিমাটহেলমিনথিস (Phylum Nemathelminthes)** বা পর্ব অ্যাস্কেলমিনথিস (Phylum Aschelminthes) বা গোলকৃমি : ত্রিস্তর বিশিষ্ট, সুতার মত বা বেলনাকার প্রাণী, অধিকাংশই অন্তঃপরজীবী এবং একলিঙ্গী।

উদাহরণ : অ্যাসকারিস (*Ascaris*), অ্যাঙ্কাইলোস্টোমা (*Ancylostoma*) উচেরেরিয়া (*Wuchereria*) প্রভৃতি।

7. **পর্ব অ্যানিলিডা (Phylum Annelida)** বা অঙ্গুরীমাল : দেহ বেলনাকার এবং আংটির মত কতকগুলি খণ্ডকে বিভক্ত। দেহ ত্রিস্তরযুক্ত, দেহে প্রকৃত দেহগহ্বর বা সিলোম (Coelom) থাকে।

উদাহরণ : নেরিস (*Nereis*), কেঁচো (Earthworm) ও জোঁক (Leech)।

8. **পর্ব আরথ্রোপোডা (Phylum Arthropoda)** বা সন্ধিপদী : সন্ধিল উপাঙ্গযুক্ত দেহটি মাথা, বক্ষ ও উদরে বিভক্ত; দেহটি কাইটিন যুক্ত আবরণী দ্বারা আবৃত। ইহা প্রাণিজগতের বৃহত্তম পর্ব। দেহগহ্বর বা হিমোসিলে রক্ত সংবহন হয়।

উদাহরণ : চিংড়ি (Prawn), কাঁকড়া (Crab), আরশোলা (Cockroach), কেন্নো (Milliped) মাকড়সা (Spider), কাঁকড়া বিছা (Scor pion,) বিছা (Centiped), লিমুলাস (*Limulus*), ট্রাইলোবাইট (Trilobite), ইউরিপটেরিডস্ (*Eurypterids*) *

[* চিহ্নিত প্রাণীগুলি অধুনালুপ্ত, কেবল ইহাদের জীবাশ্ম পাওয়া গিয়াছে।]

9. **পর্ব মোলাস্কা** (Phylum Mollusca) বা কম্বোজ প্রাণী : অখণ্ডিত নরম দেহ একটি পাতলা আবরণ বা ম্যান্টল (Mantle) দ্বারা আবৃত। ম্যান্টল হইতে নিঃসৃত রস সাধারণত দেহের উপর শক্ত খোলক (Shell) গঠন করে। অঙ্কীয় দেশে সুস্পষ্ট মাংসল পদ থাকে।

উদাহরণ : শামুক (Snail), ঝিনুক (Mussel), কাইটন (*Chiton*) সিপিয়া (Sepia), ললিগো (*Loligo*), অক্টোপাস (Octopus), নটিলাস (*Nautilus*), অ্যামোনাইট (*Ammonite*)* প্রভৃতি।

10. **পর্ব একাইনোডারমাটা** (Phylum Echinodermata) বা কন্টকত্বক : দেহত্বক কন্টকময় ও অরীয়ভাবে প্রতিসম। সাধারণতঃ পাঁচটি বাহু থাকে ; নলপদ (Tubefeet)-এর সাহায্যেই ইহারা চলাচল করে। দেহের ভিতর বিশেষ ধরনের জল সংবহনতন্ত্র থাকে ; সকলেই সামুদ্রিক।

উদাহরণ : তারামাছ (Starfish), সী-আরচিন (Sea-urchin), সমুদ্র শশা (Sea-cucumber), সী-লিলি (Sea-lily) প্রভৃতি।

11. **পর্ব কর্ডাটা** (Phylum Chordata) নোটোকর্ড বিশিষ্ট প্রাণী : দেহে নোটোকর্ড (Notochord) নামক একটি স্থিতিস্থাপক দণ্ড থাকে, মেরুদণ্ডী প্রাণীর ক্ষেত্রে ইহা মেরুদণ্ডে পরিণত হয় ; পৃষ্ঠদেশে ফাঁপা নার্ভকর্ড (Dorsal tubular nervecord) ও জীবনকালের কোনো না কোনো সময় গলবিলীয় ফুলকা ছিদ্র (Pharyngeal gillslits) থাকে।

কর্ডাটা পর্বটি দুটি প্রধান বিভাগে বিভক্ত, যথা—আক্রেনিয়া ও ক্রেনিয়াটা
A. বিভাগ—**আক্রেনিয়া** বা **প্রোটোকর্ডাটা** (Acrania or Protochordata) ইহাদের দেহে কেবল নোটোকর্ড থাকে কিন্তু কখনোই মেরুদণ্ড ও করোটি থাকে না, সেইজন্য ইহাদের অনুন্নত কর্ডেট (Primitive chordate) বলে।

উদাহরণ : ব্যালানোগ্লসাস (*Balanoglossus*), অ্যাসিডিয়া (*Ascidia*), সাল্‌পা (*Salpa*), ডলিওলাম (*Doliolum*), অ্যামফিঅক্সাস (*Amphioxus*) প্রভৃতি।

B. **বিভাগ : ক্রেনিয়াটা** বা **মেরুদণ্ডী** (Craniata or Vertebrata) :

* অ্যামোনাইট-এর কেবল জীবাশ্ম পাওয়া গিয়াছে।

ইহাদের ভ্রূণাবস্থায় নোটোকর্ড থাকে কিন্তু পরিণত অবস্থায় উহা মেরুদণ্ডে পরিণত হয়। মেরুদণ্ডী প্রাণী আবার কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত—

(i) **সাইক্লোস্টোমাটা (Cyclostomata)**: চোয়াল বিহীন মেরুদণ্ডী প্রাণী, দেহ আঁশবিহীন ও অন্তঃকঙ্কাল তরুণাস্থি দ্বারা গঠিত; সাধারণতঃ জোড় পাখনা থাকে না কিন্তু 6-14 জোড়া ফুলকা ছিদ্র থাকে।

উদাহরণ: ল্যামপ্রে (Lamprey) ও হ্যাগফিশ (Hagfish)।

(ii) **কনড্রিক্‌থিস** (Chondrichthyes) বা ইলাস্‌মোব্রাঙ্ক (Elasmobranch): সামুদ্রিক তরুণাস্থি যুক্ত (Cartilagenous) মাছ; মুখ অঙ্কীয় দেশে থাকে, ধারালো দাঁত থাকে, সমগ্র দেহ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্ল্যাকয়েড আঁশ (Placoid scale) দ্বারা আবৃত; 5 জোড়া ফুলকা ছিদ্র থাকে কিন্তু কানকো থাকে না।

উদাহরণ: হাঙর (Shark), স্কেট (Skate), রে (Ray) বা শঙ্কর মাছ। ইলেকট্রিক রে (Electric Ray), করাত মাছ (Saw fish) প্রভৃতি।

(iii) **অসটিকৃথিস** (Osteichthyes) বা টিলিয়স্ট (Teleost): সমুদ্রে অথবা মিঠাজলে বসবাসকারী অস্থিযুক্ত মাছ (Bony fish): মুখছিদ্র সাধারণতঃ প্রান্তদেশে অবস্থিত: দেহটি প্রধানতঃ সাইক্লয়েড (Cycloid) অথবা টিনয়েড (Ctenoid) আঁশ দ্বারা আবৃত। ফুলকা ছিদ্রগুলি কানকো (Operculum) দ্বারা আবৃত।

উদাহরণ: রুই (*Labeo*), কাতলা (*Catla*), মাগুর (*Clarias*), শিঙি (*Heteropneustes*), ভেটকি (*Lates*), ইলিশ (*Hilsa*), কই (*Anabas*), কড (*Cod*), হেরিং (*Herring*) প্রভৃতি।

(iv) **উভচর বা অ্যামফিবিয়া** (*Amphibia*): ইহাদের জীবনকালের কিছু দশা জলে ও বাকী দশা স্থলে অতিবাহিত হয়। দেহের ত্বক সাধারণত আর্দ্র, গ্রন্থিময় ও আঁশহীন। হৃৎপিণ্ডে দুইটি অলিন্দ ও একটি নিলয় থাকে; জীবনচক্রে সুস্পষ্ট লার্ভা দশা থাকে।

উদাহরণ: কুনোব্যাঙ (Toad), সোনাব্যাঙ (Frog), নিউট (Newt), স্যালামাণ্ডার (Salamander) প্রভৃতি।

(v) **সরীসৃপ বা রেপটিলিয়া** (*Reptilia*): ইহাদের দেহত্বক শুষ্ক এপিডারমাল আঁশ দিয়া আবৃত। হৃৎপিণ্ডে দুইটি অলিন্দ এবং একটি

অসম্পূর্ণ বিভক্ত নিলয় থাকে। জীবনচক্রে সুস্পষ্ট লার্ভা দশা থাকে না; ডিমের ভিতরেই ভ্রূণের বৃদ্ধি হয়।

উদাহরণ : গিরগিটি (Lizard), সাপ (Snake), কচ্ছপ (Turtle), কুমীর (Crocodile), স্ফিনোডন (*Sphenodon*), ডাইনোসরস (Dinosaurs)* প্রভৃতি।

(vi) **পক্ষী বা অ্যাভিস (Aves)** : দেহ পালকে আবৃত; অগ্রপদ দুটি ডানায় রূপান্তরিত, দন্তহীন চোয়াল কঠিন চঞ্চুতে পরিণত; দেহে উড়িবার পেশী ও বায়ুথলি থাকে; অস্থি ফাঁপা ও বায়ুপূর্ণ। হৃৎপিণ্ডে দুটি অলিন্দ ও দুইটি নিলয় থাকে; ডিমের ভিতর ভ্রূণের বৃদ্ধি হয়।

উদাহরণ : পায়রা (Pigeon), ময়ূর (Peacock), কাক (Crow), আরকিয়পটেরিক্স (Archaeopteryx), উটপাখী বা অসট্রিচ (Ostrich), কিউই (Kiwi) প্রভৃতি।

(vii) **স্তন্যপায়ী বা ম্যামেলিয়া (Mammalia)** : দেহ রোমে আবৃত। বহিঃকর্ণ বা পিনা থাকে, স্তনগ্রন্থি (Mammary gland) থাকে; হৃৎপিণ্ডে দুইটি অলিন্দ ও দুইটি নিলয় থাকে। পরিণত লোহিত কণিকায় নিউক্লিয়াস থাকে না। বক্ষ ও উদরের মধ্যস্থলে একটি মধ্যচ্ছদা (Diaphragm) থাকে। সাধারণতঃ জরায়ুজ এবং উন্নত মস্তিষ্ক বিশিষ্ট প্রাণী।

উদাহরণ : প্লাটিপাস (Platypus) ও একিডনা (Echidna) অণ্ডজ স্তন্যপায়ী; ক্যাঙারু, (Kangaroo), কোয়ালা (Koala), ওপোসাম (Opossum) প্রভৃতি মারস্যুপিয়াম থলি বিশিষ্ট স্তন্যপায়ী এবং গিনিপিগ (Guineapig), কুকুর, বিড়াল, বানর, শিম্পাজি, গরিলা, মানুষ প্রভৃতি প্রকৃত স্তন্যপায়ী প্রাণী।

সারাংশ

পর্ব **প্রোটোজোয়া** (এককোষী)—ইউগ্লিনা, অ্যামিবা, প্যারামেশিয়াম।
পর্ব **পরিফেরা** (ছিদ্রাল প্রাণী)—সাইকন, স্পঞ্জিলা প্রভৃতি স্পঞ্জ।
পর্ব **নিডেরিয়া** (দংশক কোষযুক্ত)—হাইড্রা, জেলিফিশ, সাগরকুসুম।
পর্ব **টিনোফোরা** (চিরুনী ধারী)—হর্মিফোরা, বেরো।
পর্ব **প্লাটিহেলমিনথিস** (চ্যাপ্টাকৃমি)—প্লানেরিয়া, যকৃৎকৃমি, ফিতাকৃমি।

পর্ব নিমাটহেলমিনথিস (গোলকৃমি)—অ্যাসকারিস, উচেরেরিয়া।

পর্ব অ্যানিলিডা (অঙ্গুরীমাল)—নেরিস, কেঁচো, জোঁক।

পর্ব আরথ্রোপোডা (সন্ধিপদ)—চিংড়ি, আরশোলা, বিছা, মাকড়সা।

পর্ব মোলাস্কা (কম্বোজ)—শামুক, ঝিনুক, অক্টোপাস।

পর্ব একাইনোডারমাটা (কণ্টক ত্বক)—তারামাছ, সী-আর্চিন, সী-লিলি।

পর্ব কর্ডাটা

বিভাগ : প্রোটোকর্ডাটা (অমেরুদণ্ডী কর্ডাটা)—অ্যামফিঅক্সাস।

বিভাগ : মেরুদণ্ডী—

শ্রেণী :—সাইক্লোস্টোমাটা (চোয়ালহীন)—ল্যামপ্রে।

কন্ড্রিকথিস (তরুণাস্থিযুক্ত মাছ)—হাঙর, রে, স্কেট।

অস্টিকথিস (অস্থিযুক্ত মাছ)—রুই, কাতলা, কই।

অ্যামফিবিয়া (উভচর)—কুনোব্যাঙ, স্যালামাণ্ডার।

রেপটিলিয়া (সরীসৃপ)—গিরগিটি, সাপ, কুমীর।

অ্যাভিস (পক্ষী)—পায়রা, ময়ূর, উটপাখী।

ম্যামেলিয়া (স্তন্যপায়ী)—গিনিপিগ, বানর, মানুষ।

---

* উপরোক্ত পর্বগুলি ছাড়াও বহু অপ্রধান পর্ব প্রাণিজগতে আছে যথা মেসোজোয়া, ব্রায়োজোয়া, ব্রাকিওপোডা, এন্টোপ্রক্টা, ফোরোনিডিয়া, ইকিউরয়ডিয়া, কিটোগনাথা প্রভৃতি।

গ্রন্থপঞ্জী (Bibliography)

Bates, Marston. 1963. Man in Nature, Prentice Hall of India (Pvt) Limited.

Biological Sciences Curriculum Study. 1963. Molecules to Man (Blue version) Houghton Mifflin Co. Boston.

Colbert E. H. 1955. Evolution of the Vertebrates, John Wiley and sons, New York.

Darlington P. J. 1957. Zoogeography, the Geographical Distribution of Animals. Wiley and Sons, New York.

Darwin Charles. 1859. The Origin of Species, The Modern Library, New York.

Darwin Charles. 1871. The Descent of Man, The Modern Library, New York.

Dobzhansky Th. 1951. The Genetics and the Origin of Species, 3rd. ed. Columbia University Press, New York.

Dodson E. O. 1968. Evolution, Process and Product Reinhold Publishing Corporation, New York.

Dowdeswell W. H. 1975. The Mechanism of Evolution, 4th. ed. Heinemann Educational Books,

Ford E. B. 1975. Ecological Genetics.

Gardner E. J. 1978. History of Biology, 3rd ed. Wiley Eastern Limited.

Guyer M. F. 1948. Animal Biology, 4th.-ed. Harper and Brothers, New York.

Ganguly, Sinha and Adhikary 1978. Introduction to

Biology of Animals, New Central Book Agency, Calcutta.

Hegner and Stiles 1959. College Zoology, 7th. ed. Macmillan, New York.

Huxley, J. 1963. Evolution, The Modern Synthesis, George Allen and Unwin Ltd.

Johnson. Steere 1962. This is life (Essays in Modern Biology), Holt, Reinhart and Winston.

Lull, R. S. 1976. Organic Evolution (2nd-ed.) Macmillan Co. New York.

Mayr, Ernst. 1963. Animal Species and Evolution, Harvard, Cambridge, Mass.

Moody, P. A 1964. Introduction to Evolution, 2nd-ed. (International Student reprint). Harper and Row, New York.

Mukherjee, D. 1975. Text Book of Zoology, New Book Stall, Calcutta.

Oparin A. J. 1957. The Origin of Life, 3rd-ed. Academic Press, New York.

Parker and Haswell 1972. Text Book of Zoology (I+II) (Edited by Marshall and Williams) Macmillan Press Ltd. London.

Roberts M. B. V. 1976. Biology A Functional Approach Nelson (2nd-ed).

Romer A. S. 1959. The Verhebrate Story, University of Chicago Press.

Romer A. S. 1945. Vertebrate Paleontology, University of Chicago Press.

Simpson G. G. 1967. The Meaning of Evolution (2nd-ed) Yale University Press.

Stebbins, G. L. 1971. Processes of Organic Evolution Prentice–Hall.

Storer and Usinger. General Zoology (4th-ed.) MaGraw-Hill and Kogakusha. (Internatinal Student edition)

তারাপদ চট্টোপাধ্যায় ও সুমন্ত মুখোপাধ্যায়, ১৯৮০, প্রাণিবিদ্যা, নিউ বুক স্টল, কলিকাতা।

মুখোপাধ্যায়, মেদ্দা, মেদ্দা ও মুখোপাধ্যায়, ১৯৮০, জীববিজ্ঞান, নিউ বুক স্টল কলিকাতা।

সিংহ ও অধিকারী ১৯৮২, সমকালীন প্রাণিবিদ্যা, নিউ সেণ্ট্রাল বুক এজেন্সি, কলিকাতা।

চট্টোপাধ্যায় ও চট্টোপাধ্যায় ১৯৮১ : প্রাণিবিদ্যা, নির্মলা লাইব্রেরী, কলিকাতা।

মৃত্যুঞ্জয় প্রসাদ গুহ, ১৯৮০ : জীবের ক্রমবিকাশ, শ্রীভূমি পাবলিশিং কোম্পানি, কলিকাতা।

শব্দসূচী (Index)

চিত্রসূচী

বহু কোটি বছর ধরে অবিরত ধারায় বিবর্তন ঘটে চলেছে যার শুরু সেই আদ্যপ্রাণীর উদ্ভব থেকে কিংবা আরো বিজ্ঞান সম্মত বিচারে অজৈব বস্তু থেকে আকস্মিকভাবে প্রাণের সৃষ্টি থেকে। ক্রমবিকাশের হাত ধরে জীবজগৎ ক্রমশঃ ছড়িয়ে গেছে নানাভাবে নানা দিকে। সম্ভবতঃ বিবর্তনের সবচেয়ে বিস্ময়কর ফসল হচ্ছে মানুষ। মানুষের আবির্ভাব কিংবা নানা প্রজাতির প্রাণীর উৎপত্তি, পৃথিবীর কোলে প্রাণের উন্মেষ, বিবর্তন বিষয়ে বিজ্ঞানীদের নানান অভিমত, বিবর্তন বাদের নায়ক চার্লস ডারউইনের চমকপ্রদ জীবন, অভিজ্ঞতা এবং মতবাদ, নব্য ডারউইনীয়দের চিন্তাভাবনা, প্রাণীদের বিচিত্র অভিযোজন ইত্যাদি ক্রমবিকাশ সংক্রান্ত নানা বিষয় স্থান নিয়েছে এই সুচিত্রিত বইয়ে। একই সাথে জীব-বিবর্তন বিষয়ে অনুসন্ধিৎসু ছাত্র-ছাত্রী এবং কৌতূহলী পাঠক-পাঠিকাদের দীর্ঘদিনের চাহিদা পূরণ করল বাংলা ভাষায় বিবর্তন বিষয়ে প্রথম এবং একমাত্র এই বই।

চব্বিশ টাকা